সম্মতি সূচক ইসতিহার

অভিসন্দর্ভের নাম : "ঢাকার চক বাজার এলাকার স্থাপত্য কীর্তি"

প্রার্থীর নাম : আবুল ফয়েজ

GIFT

অনুমোদিত

পি. আই. এস. মুস্তাফিজুর রহমান

পি. আই. এস. মুস্তাফিজুর রহমান
প্রফেসর, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ ।

Dhaka University Library
382738

382738

অনুমোদনের তারিখ - ৩০-৭-১৯৯২ইং

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকার চক বাজার এলাকার স্থাপত্য কীর্তি

এম.ফিল ডিগ্রীর উদ্দেশ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পেশকৃত অভিসন্দর্ভ ।

382738

আবুল কয়েজ
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৯২ ।

Dhaka University Institutional Repository

382738

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

মুখবন্ধ

"ঢাকার চক বাজার এলাকার স্থাপত্য-কীর্তি" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার মৌলিক রচনা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক আনুকূল্যে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রফেসর ডঃ শি.আই.এস. মুস্তাফিজুর রহমানএর তত্ত্বাবধানে আমি এই মৌলিক অভিসন্দর্ভটি রচনার প্রয়াস পেয়েছি। যে প্রেক্ষাপটে ও উদ্দেশ্যে এই কাজ করেছি তা সংক্ষেপে আলোচিত হলো।

ঢাকার চক বাজার এলাকা ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোন থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। (ক) শহর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই এই স্থানটি ঢাকা নগরীর কেন্দ্রস্থল হিসেবে বিবেচিত হয়, কেননা এই সময়কার ঢাকা পূর্বে নারিন্দা, নারায়নদিয়া বা পশ্চিমা পরিব্রাজকদের চোখে নারিমদিম হতে পশ্চিমে মনেশ্বর পর্যন্ত সম্প্রসারিত ছিল। এই বাজারটি নদীর তীরে অবস্থিত ছিল বলে এর গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি পেয়েছিল। (খ) ঢাকা নগরীর কেন্দ্রস্থল হিসেবে এর রাজনৈতিক গুরুত্বও ছিল উল্লেখযোগ্য। মুঘল পূর্বযুগে তুর্কী-আফগান প্রশাসন আমলে মোবারকাবাদ বা ঢাকাকে দেখা যাচ্ছিল ইকলীম মোবারকাবাদের সীমান্ত একটি ফাঁড়ি রূপে। সম্রাট শের শাহের আমলে সম্ভবতঃ এই এলাকায় একটি সামরিক দূর্গ ছিল। ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে সম্রাট আকবরের নির্দেশে রাজা মানসিংহ কাচওয়া বাংলার সুবাদার হিসেবে এদেশে আসেন। ১৬০২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাণ্ডয়াল হতে তাঁর সদর দফতর ঢাকাতে স্থানান্তরিত করেন। তাঁর সচিবালয় ছিল নগরের পশ্চিমাঞ্চল ঢাকেশ্বরী মন্দির এলাকায়। শায়েস্তা খান যখন এই এলাকায় পদার্পন করেন তখন তিনি এখানে একটি দূর্গ ও প্রাসাদ নির্মান করেছিলেন। অনেকের মতে তিনি প্রাচীন আশেক জমাদার লেন বা অধুনা ৩৮ নং আওলাদ হোসেন লেনে যে ইসলাম খান-কি মসজিদটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার আশ-পাশেই তিনি বাস করতেন। তখনকার দিনে সুবা বাংলার রাজধানী এই স্থানকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল। (গ) এই এলাকাটি তখন বাংলাদেশের ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল হিসেবে পরিগনিত ছিল। এখানে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

382738

Dhaka University Institutional Repository

পারসিক, গ্রীক, কাশ্মীরী, আর্মেনিয়ান এবং কিরিংগি ব্যবসায়ীরা প্রতিষ্ঠা এবং সমৃদ্ধি লাভ করেছিলেন। এর অপর নাম ছিল বাদশাহী বাজার; কেননা এই স্থানটি সুবাদারের সদর দফতরের (বর্তমান জেলখানা) নিকটেই অবস্থিত ছিল। এখানে অভিজাত সম্প্রদায় ও সভাসদ বর্গের প্রধান বিপণী কেন্দ্র ছিল। (ঘ) এই স্থানটি সাংস্কৃতিক পাদপিঠ হিসেবেও প্রসিদ্ধ ছিল। (ঙ) ঢাকা স্থাপত্য শিল্পে এই স্থানটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। নারিন্দার বিনাত বিবির মসজিদ ছাড়াও এখানে গড়ে উঠেছিল ঢাকার প্রাচীনতম মাসা-ওয়ালা গলির মসজিদ এবং এর তোরণ। এখানে নির্মিত হয়েছিল চুঁড়িহাট্টা মসজিদ ও ইসলাম খান-কি মসজিদ যা ঢাকায় মুঘল স্থাপত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন। চকের কেন্দ্রে নির্মিত হয়েছিল শায়েস্তা খানের চক শাহী মসজিদ। চকের সীমার মধ্যেই অবস্থিত প্রখ্যাত হোসাইনী দালান। এখানে শাহ সুজার সময়ে নির্মিত হয়েছিল বড় কাটরা এবং শায়েস্তা খান নির্মান করেছিলেন ছোট কাটরা। চক বাজারের পূর্ব দিকে মীর জুমলার সময়ে মীর মোহাম্মদ মুকীম নির্মান করেছিলেন মুকিম কাটরা। ছোট কাটরার প্রাঙ্গনে নির্মিত হয়েছিল বিবি চাম্পার সমাধিসৌধ। এর এলাকার মধ্যে নির্মিত হয় ঢাকার স্থাপত্য শিল্পের মহৎ নিদর্শন কারতালাব খান মসজিদ। পরবর্তীতে এখানে একটি গ্রীক গীর্জাও স্থাপিত হয়েছিল। এ সব কারণে এ অঞ্চলের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। তাই এ বিষয়ে অধ্যয়ন ও গবেষণার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আজ পর্যন্ত এই কর্মে কেহ আত্মনিয়োগ করেন নি। এই স্থানের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক গুরুত্ব সম্পর্কেও বিশদ আলোচনা হয়নি।

ইংরেজ ঐতিহাসিকগণের লিখিত গ্রন্থাবলী এখানকার স্থাপত্য শিল্প বিবরণের একটি প্রধান উৎস। কিন্তু তাদের লেখায় বিস্তারিত ও পূর্ণাঙ্গ চিত্র ফুটে উঠেনি। বাংলাদেশে মুঘলদের আবির্ভাব একটি পুরাতন যুগের অবসান ঘটিয়েছিল এবং একটি নূতন যুগের উন্মেষ সূচিত করেছিল। এ সম্পর্কে তাঁদের ধারণা ছিল সীমিত। এ জন্যই এদেশের মধ্য-যুগীয় স্থাপত্যের সু-গভীর সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক পটভূমি সমন্ধে লেখকগণ অন্তঃ দৃষ্টির পরিচয় দিতে সক্ষম হননি। দ্বিতীয়তঃ এদেশীয় ঐতিহাসিকদের মধ্যে অনেকেই স্থাপত্য সমন্ধে লিখেছেন কিন্তু একমাত্র ডঃ আহামদ হাসান দানী ব্যতীত সকলেই

Dhaka University Institutional Repository

এর স্থাপত্য মূল্যায়নে সঠিক পরিপ্রেক্ষিতে অবলম্বনে ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁরা স্থাপত্য আলোচনায় বিশ্লেষণধর্মী ও ব্যাখ্যামূলক পর্যালোচনা না করে ইমারতগুলোর একটি বর্ণনামূলক তালিকা দিয়েছেন। তাঁদের লেখায় স্থাপত্যের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, উৎপত্তি ও বিবর্তন মূলক আলোচনা অনুপস্থিত।

উপরোক্ত কারণে চক বাজারের স্থাপত্যকে একটি পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিকোন থেকে বিশ্লেষণ ও আলোচনা করতে আমি যত্নবান হয়েছি। নিছক বিবরণ না দিয়ে এর প্রেক্ষাপট, আদর্শ, নির্মান কৌশল এবং এসবের অলংকরণের সৌকুমার্য এখানে আলোচনা করেছি। সঙ্গে সঙ্গে এই স্থাপত্যের উৎপত্তি, যথার্থ কাল নিরূপন এবং বিভিন্ন স্থাপত্য কর্মের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়ের যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি।

স্থাপত্য শিল্প সমন্ধে গবেষণা অত্যন্ত দুরূহ, কষ্ট সাধ্য ও ব্যয় বহুল। ঢাকার বিশেষতঃ চক বাজার এলাকার স্থাপত্যের সুষ্ঠু মূল্যায়ণ অনেক ক্ষেত্রেই কঠিন মনে হয়েছে। ইমারত সমূহের সম্প্রসারণ, সংযোজন ও পরিবর্তন এবং এদের চার পাশে সঘন সন্নিবেশিত অনেক একতলা ও বহুতলা বিশিষ্ট ইমারত, আলোকচিত্র গ্রহণে অসুবিধা সৃষ্টি করেছে।

ইসলামের আদিপর্বে মসজিদ কেবল প্রার্থনাগারই ছিলনা, এটা ছিল শিক্ষাগার, গবেষণাগার, পাঠাগার, হাসপাতাল ও আরো অনেক কিছু। এই জন্যই এর সার্বজনিক গুরুত্ব ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু বিদেশী শাসনে মসজিদ তার গুরুত্ব হারায়। মসজিদকে রাজনৈতিক চর্চার কেন্দ্র হিসেবে মনে করে বিদেশী রা একমাত্র প্রার্থনাকালীন সময় ছাড়া অন্য সময় মসজিদ বন্ধ রাখার ব্যবস্থা করে। আমরা এই প্রভাবকে এখনও কাটিয়ে উঠতে পারিনি। ফলে গবেষকের পক্ষে সুযোগ মতো ও স্বাধীনভাবে কাজকর্ম করা সম্ভবপর হয়না। উপরন্তু এই নগরীর বিশেষ বিশেষ মসজিদের ইমাম, মোয়াজ্জেন ও দ্বার রক্ষীদের কূপমণ্ডুকতার জন্য আমি আমার গবেষণা কার্যে অনেক সময় অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছি। তারা অনেক ক্ষেত্রেই মসজিদের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আলোকচিত্র গ্রহণে বাধা সৃষ্টি করেছেন। এ সব অসুবিধা সত্ত্বেও আমি আমার গবেষণায় সর্বাত্মকভাবে

Dhaka University Institutional Repository

আত্ম নিয়োগ করেছি এবং মৌলিক অভিসন্দর্ভ রচনায় সচেষ্ট হয়েছি ।

স্থাপত্য শিল্প সম্বন্ধে গবেষণায় সাহায্য নিতে হয় বিভিন্ন ঐতিহাসিকদের, স্থাপত্য ও কারিগরী বিদ্যায় পারদর্শী পন্ডিতদের । শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমার কাজে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন আমার তত্ত্বাবধায়ক প্রফেসর ডঃ পি.আই.এস. মুস্তাফিজুর রহমান । গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে তিনি আমাকে তাঁর পান্ডিত্যের দ্বারা যে সাহায্য এবং সহযোগিতা দান করেছেন তার ফলেই আমার অভিসন্দর্ভ বর্তমান রূপ পেয়েছে । ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রফেসর ডঃ মমতাজুর রহমান তরফদার ও সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদ শামসুল হক আমাকে বিভিন্নভাবে উপদেশ দিয়ে আমার গবেষণা কার্যে প্রভূত সাহায্য করেছেন । তাঁদের নিকট আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ । বিভাগীয় শিক্ষক মণ্ডলী আমাকে উদ্দীপিত না করলে এ কাজ আমার সম্পন্ন করা সম্ভব হতোনা । চরফ্যাসন মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ এবং বর্তমানে সংসদ সদস্য এম.এম.নজরুল ইসলাম ও চরফ্যাসন মহাবিদ্যালয়ের সকল অধ্যাপক মণ্ডলী আমার গবেষণা কাজে বিভিন্ন ভাবে সহযোগিতা করেছেন এই জন্য তাঁদের কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী । আমাকে উৎ-সাহিত করেছেন আমার বন্ধু অধ্যাপক মোঃ ইদ্রিসুর রহমান, অধ্যাপক মোঃ আবু দাউদ অধ্যাপক মোঃ নজরুল ইসলাম, অধ্যাপক মোঃ মহিউদ্দিন, এছাড়াও অন্যান্য যারা আমাকে সহযোগিতা করেছেন তাদের নিকট আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ । ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের বিভিন্ন কর্মচারী বিশেষতঃ জনাব মোঃ আমানউল্লাহ ও বাবু রতন কুমার দাস গ্রন্থাগার হতে যথাসময়ে পুস্তকাদি সরবরাহ করে আমার গবেষণাকর্মকে সহজ করেছেন । সেই জন্য তাঁদের কাছেও আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ।

আমার এই অভিসন্দর্ভ রচনায় দুইটি মৌল উদ্দেশ্য ছিল । প্রথমতঃ স্থাপত্য শিল্পের মত একটি দুরূহ বিষয়কে মাতৃভাষায় প্রকাশ এবং দ্বিতীয়তঃ ঢাকার একটি প্রাচীনতম জনবহুল এলাকার স্থাপত্য ও সংস্কৃতি বিশ্লেষণ । এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আমি আমার অভিসন্দর্ভটি যতদূর সম্ভব নির্ভুল রচনায় ব্রতী হয়েছি । এখানে আমি স্থাপত্যের কলা-কৌশল ও তার প্রয়োগকে বোধগম্য ভাষায় লিপিবদ্ধ করতে যত্নবান হয়েছি । আমার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা সত্বেও যদি আমার এ কাজে কোন ত্রুটি বিচ্যুতি দেখা যায় তার জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী ।

Dhaka University Institutional Repository

" সূচী পত্র "

			পৃষ্ঠা নং
		মুখবন্ধ	ক
		মানচিত্র	চ
		ভূমি নকশা	ছ
		চিত্র	জ
অধ্যায় – ১	:	উৎস	১
অধ্যায় – ২	:	রাজনৈতিক পটভূমি	৮
অধ্যায় – ৩	:	ঢাকার মুঘল স্থাপত্যের উৎপত্তি ও বিকাশ	২৭
অধ্যায় – ৪	:	চক বাজারের উৎপত্তি	৫৪
		ঢাকার চক বাজার এলাকার স্থাপত্য কীর্তি :	৫৮
অধ্যায় – ৫	:	মসজিদ :	৫৯
		ক) ইসলাম খানের মসজিদ	৬০
		খ) চুড়িহাট্টা মসজিদ	৬৯
		গ) নব রায় গলির মসজিদ	৭২
		ঘ) শায়েস্তা খানের মসজিদ	৭৩
		ঙ) চক মসজিদ	৮০
		চ) কারতালাব খান মসজিদ	৮৬
		ছ) আরমানিটোলা ছোট মসজিদ	১০৪
		জ) মীর্জা গোলাম পীরের মসজিদ	১০৬
		ঝ) আমীর উদ্দীনের মসজিদ	১১৯
অধ্যায় – ৬	:	সমাধি সৌধ :	১২৯
		ক) বিবি চাম্পার সমাধি	১৩০
		খ) আমীর উদ্দীনের সমাধি	১৩৭
		গ) দুদু মিঞার সমাধি	১৪১
		ঘ) শাহ মোহাম্মদ জামালের সমাধি	১৪৪
অধ্যায় – ৭	:	কাটরা :	১৪৮
		ক) বড় কাটরা	১৪৯
		খ) ছোট কাটরা	১৬২
অধ্যায় – ৮	:	ইমামবাড়া :	১৭০
		ক) হোসাইনী দালান	১৭১
		খ) উপসংহার	১৮৮
		গ) গ্রন্থপঞ্জী	১৯২

Dhaka University Institutional Repository

MAP SHOWING THE ANCIENT MONUMENTS OF CHOUK BAZAR AREA, DHAKA

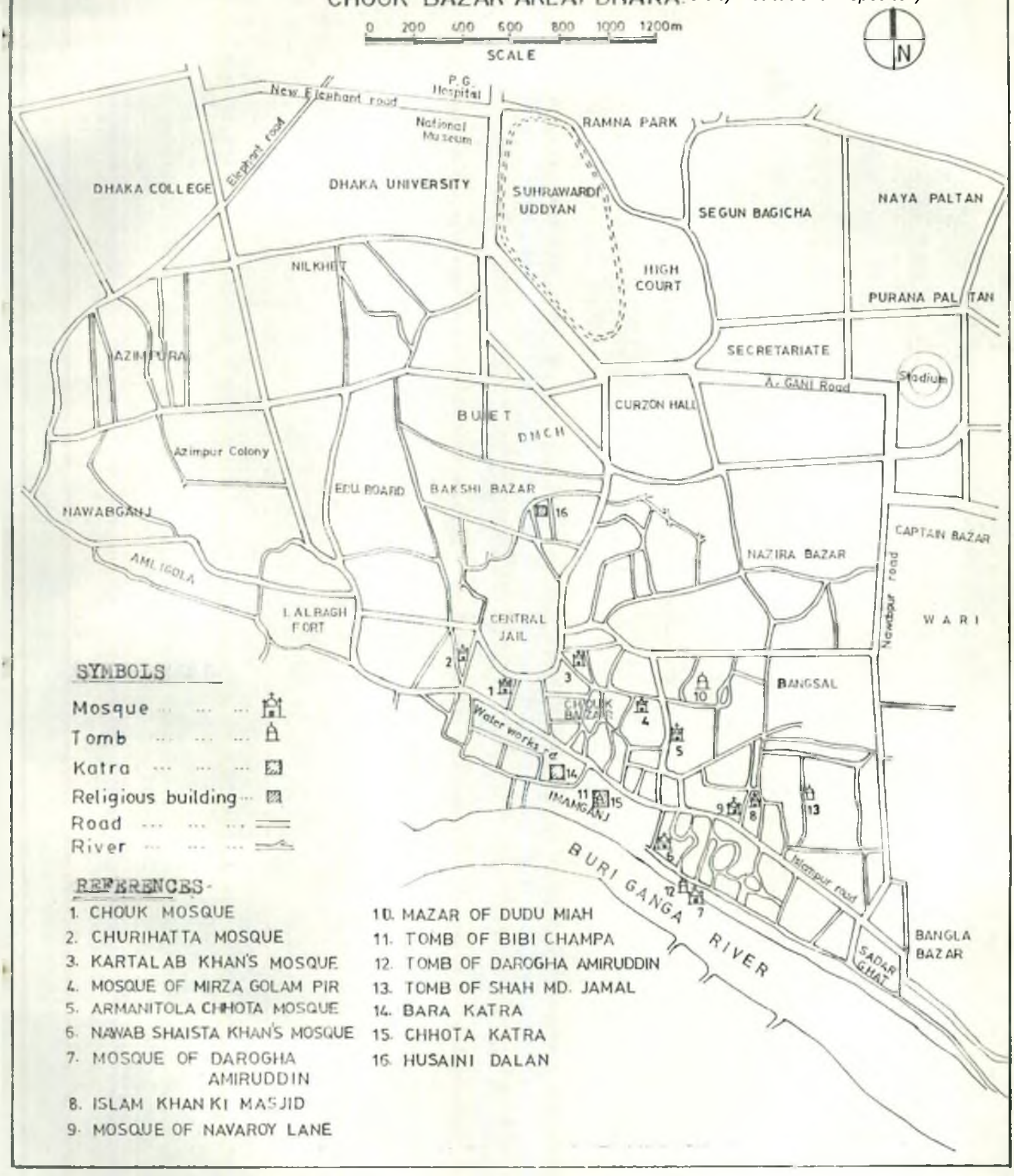

SYMBOLS

Mosque ... ...
Tomb ... ...
Katra ... ...
Religious building ...
Road ... ...
River ... ...

REFERENCES-

1. CHOUK MOSQUE
2. CHURIHATTA MOSQUE
3. KARTALAB KHAN'S MOSQUE
4. MOSQUE OF MIRZA GOLAM PIR
5. ARMANITOLA CHHOTA MOSQUE
6. NAWAB SHAISTA KHAN'S MOSQUE
7. MOSQUE OF DAROGHA AMIRUDDIN
8. ISLAM KHAN KI MASJID
9. MOSQUE OF NAVAROY LANE
10. MAZAR OF DUDU MIAH
11. TOMB OF BIBI CHAMPA
12. TOMB OF DAROGHA AMIRUDDIN
13. TOMB OF SHAH MD. JAMAL
14. BARA KATRA
15. CHHOTA KATRA
16. HUSAINI DALAN

Dhaka University Institutional Repository

ভূমি নকশা

		পৃষ্ঠা নং
ভূমি নকশা -১	ইসলাম খানকি মসজিদ (১৬১০ খ্রীষ্টাব্দ)	৬১
ভূমি নকশা -২	চুড়িহাট্টা মসজিদ (১৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দ)	৭০
ভূমি নকশা -৩	শায়েস্তা খানের মসজিদ (১৬৬৪-৭৭ খ্রীষ্টাব্দ)	৭৫
ভূমি নকশা - ৪	চক মসজিদ (১৬৭৬ খ্রীষ্টাব্দ)	৮১
ভূমি নকশা - ৫	কারতালাব খান মসজিদ (১৭০১-৪ খ্রীষ্টাব্দ)	৮৮
ভূমি নকশা -৬	আরমানিটোলা ছোট মসজিদ (১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দ)	১০৫
ভূমি নকশা- ৭	মীর্জা গোলাম পীরের মসজিদ (উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ)	১০৮
ভূমি নকশা -৮	আমীর উদ্দীনের মসজিদ (উনবিংশ শতাব্দী)	১২১
ভূমি নকশা - ৯	বিবি চাম্পার সমাধি (১৬৮০-৮৮ খ্রীষ্টাব্দ)	১৩২
ভূমি নকশা-১০	আমীর উদ্দীনের সমাধি	১৩৮
ভূমি নকশা-১১	শাহ মোহাম্মদ জামালের সমাধি (উনবিংশ শতাব্দী)	১৪৫
ভূমি নকশা -১২	প্রথম তলা, বড় কাটরা (১৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দ)	১৫২
ভূমি নকশা-১৩	দ্বিতীয় তলা এবং তৃতীয় তলা	১৫৭
ভূমি নকশা-১৪	ছোট কাটরা (১৬৭১ খ্রীষ্টাব্দ)	১৬৩
ভূমি নকশা-১৫	হোসাইনী দালান (১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দ)	১৭৬

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র

	পৃষ্ঠা/চিত্র নং
ইসলাম খানের মসজিদ / তিন গম্বুজ ও মিনার (১৬১০ খ্রীষ্টাব্দ)	৬৭/১
ইসলাম খানের মসজিদ / প্রধান মিহরাব	৬৭/২
ইসলাম খানের মসজিদ / কিবলা দেয়াল, পার্শ্ববর্তী মিহরাবের উপরের জানালা	৬৮/৩
নওয়াব শায়েস্তা খানের মসজিদ / তিন গম্বুজ ও মিনার (১৬৬৪-৭৭ খ্রীষ্টাব্দ)	৭৮/১
নওয়াব শায়েস্তা খানের মসজিদ, প্রধান প্রবেশ পথ	৭৮/২
নওয়াব শায়েস্তা খানের মসজিদ / প্রধান মিহরাব ও মিম্বর	৭৮/৩
চক মসজিদ / তিন গম্বুজ ও গম্বুজের জানালা (১৬৭৬ খ্রীষ্টাব্দ)	৮৪/১
চক মসজিদ প্রধান প্রবেশ পথের উপরাংশ	৮৪/২
চক মসজিদ, প্রধান প্রবেশ পথ ও মিহরাব	৮৫/৩
কারতালাব খান মসজিদ / (১৭০১-৪ খ্রীষ্টাব্দ) পাঁচ গম্বুজ ও মিনার	১০১/১
কারতালাব খান মসজিদ / প্রধান প্রবেশ পথ	১০১/২
কারতালাব খান মসজিদ / প্রধান মিহরাব	১০২/৩
কারতালাব খান মসজিদ / নামাজ গৃহের প্রধান মিহরাবসহ কিবলা দেয়ালের দক্ষিণাংশ ও দক্ষিণ পার্শ্বের প্রবেশ পথ	১০২/৪
কারতালাব খান মসজিদ / পার্শ্ববর্তী মিহরাব	১০৩/৫
কারতালাব খান মসজিদ / প্রধান গম্বুজের স্কুইঞ্চ	১০৩/৬
মীর্জা গোলাম পীরের মসজিদ / পাঁচ গম্বুজ ও মিনার (উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ)	১১৬/১
মীর্জা গোলাম পীরের মসজিদ / তিন গম্বুজ ও মিনার (পুরাতন)	১১৬/২
মীর্জা গোলাম পীরের মসজিদ / প্রধান প্রবেশ পথ (পুরাতন)	১১৭/৩
মীর্জা গোলাম পীরের মসজিদ / পার্শ্ববর্তী (পুরাতন) বর্তমানে মধ্যবর্তী প্রবেশ পথ	১১৭/৪
মীর্জা গোলাম পীরের মসজিদ, প্রধান মিহরাব (পুরাতন)	১১৮/৫

Dhaka University Institutional Repository

আমীর উদ্দীনের মসজিদ, (উনবিংশ শতাব্দী) তিন গম্বুজ ও মিনার	১২৬/১
আমীর উদ্দীনের মসজিদ (পিছনের দৃশ্য)	১২৬/২
আমীর উদ্দীনের মসজিদ, প্রধান প্রবেশ পথ	১২৭/৩
আমীর উদ্দীনের মসজিদ, প্রধান মিহরাব	১২৭/৪
আমীরউদ্দীনের মসজিদ, প্রধান গম্বুজের স্কুইঞ্চ ।	১২৮/৫
আমীর উদ্দীনের মসজিদ, পার্শ্ববর্তী গম্বুজের স্কুইঞ্চ	১২৮/৬
বিবি চাম্পার সমাধি (১৬৮০-৮৮ খ্রীষ্টাব্দ)	১৩৬/১
বিবি চাম্পার কবর ।	১৩৬/২
আমীর উদ্দীনের সমাধি (উনবিংশ শতাব্দী)	১৪০/১
শাহ মোহাম্মদ জামালের কবর	১৪৭/১
বড় কাটরার দক্ষিণ তোরণ পথের দৃশ্য (১৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দ)	১৬১/১
ছোট কাটরা / দক্ষিণ তোরণ পথ (১৬৭১ খ্রীষ্টাব্দ)	১৬৯/১
হোসাইনী দালান, (১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দ) দক্ষিণ দিকের দৃশ্য	১৮৭/১
হোসাইনী দালান, দোচালার নিম্নস্থ মিহরাব ।	১৮৭/২

Dhaka University Institutional Repository

উৎস

নাসিরউদ্দিন আবুল মুজাফফর মুহাম্মদ শাহ (১৪৪২-৫৯ খ্রীষ্টাব্দ) রাজধানী গৌড়ে যখন রাজত্ব করছিলেন, তখন ১৪৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকার নারিন্দায় মুসলিম স্থাপত্যের প্রাচীনতম মসজিদটি নির্মিত হয়। এর নির্মাতা হলেন "খোদাবন্দ বখত বিনাত বিনুত মারহামাত"। এর দুই বৎসর পরে গীর্দি কিল্লার অন্তর্গত বাগাওয়ালা গলিতে দ্বিতীয় মসজিদটি প্রতিষ্ঠিত হয়। মুহাম্মদ শাহের রাজপ্রতিনিধি খাজা জাহান এই মসজিদে একটি তোরণ নির্মাণ করেন। কিন্তু এই মসজিদ ও তোরণের কোন প্রাচীন ইতিহাস নেই। বস্তুত-পক্ষে ঢাকা এবং ঢাকার স্থাপত্যের প্রথম বিবরণ লিপিবদ্ধ হয় ১৫৬ বৎসর পরে। যখন সম্রাট জাহাঙ্গীরের সুবাদার আলাউদ্দীন ইসলাম খান চিশতী একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে ভাঁটি অঞ্চল জয় করার জন্য ঢাকায় আসেন।

তাঁর অধীনস্থ সিপাহসালার মির্জা নাথন সম্ভবতঃ প্রাচীনতম ঐতিহাসিক যিনি সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়কালীন বাংলাদেশের উপর পাণ্ডিত্যপূর্ণ এক খানা গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে ঢাকার স্থাপত্যের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ ফার্সী ভাষায় লিখা। এর উপাধি হলো "বাহারিস্তান-ই-গায়েবী"। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্সী বিভাগের তদানিন্তন বিভাগীয় প্রধান ডঃ এম.আই. বোরাহ দুইটি খণ্ডে ইহা ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। মুনশী রহমান আলী তায়েশ উর্দু ভাষায় 'তাওয়ারিখ-ই-ঢাকা' নামে একখানা গ্রন্থ রচনা করেন। এখানে তিনি স্থাপত্যের একটি চিত্র তুলে ধরেছেন। কিন্তু এসব গ্রন্থকার স্থাপত্য বিশেষজ্ঞ নন বলে এই ধরণের গ্রন্থের মূল্য তত বেশী নয়। শেফা-উল-মুলক হাকিম হাবিব-উর-রহমান রচনা করেছেন 'আসুদ গান-ই-ঢাকা' ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে। এই পুস্তকে তিনি ঢাকার সমাধি ও সমাধিসৌধের ঐতিহাসিক এবং ঐতিহ্যগত পটভূমি অনুসন্ধানে অনেক সময় ও শক্তি নিয়োগ করেছেন। বইটি উপাখ্যান আকারে লেখা হলেও এখানে যে মূল্যবান তথ্য রয়েছে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য।

বস্তুতপক্ষে ঢাকার স্থাপত্যের উপর যুক্তি সম্মত ইতিহাস রচিত হয় ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ কর্তৃক। এ-সম্পর্কে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন James Taylor তাঁর Topography and Statistics of Dacca, 1840 A.D. গ্রন্থটি অতি মূল্যবান ও তথ্যবহুল বলে সুধীমহলে বহুল

Dhaka University Institutional Repository

প্রশংসিত হয়েছে । এর পর স্থাপত্য বিষয়ে Sir Alexander Cunningnum প্রকাশ করলেন Archaeological Report of Tour in Bengal and Bihar, 1879 A.D. ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে Sir Charles 'D' Oyly লিখেন Antiquities of Dacca, বইটি বেশ পুরাতন ও দুষ্প্রাপ্য।Sir Charles 'D' Oyly ১৮২৩-৩০ খ্রীঃ ঢাকার কালেক্টর ছিলেন । তিনি পরবর্তীকালে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতি হিসেবে অনেক খ্যাতি অর্জন করেন। এরপর তাঁকে নাইট উপাধিতে ভূষিত করা হয় । আদর্শ সিভিল সার্ভেন্ট হিসেবে তিনি বিখ্যাত ছিলেন । তিনি শিল্প সমজদার হিসেবেও পরিচিত ছিলেন, কেননা ঢাকার অট্টালিকা সমূহের যে সব ছবি তিনি একেছেন তা নিখুঁত ও বস্তুনিষ্ঠ । এরূপ সুন্দর নকশা ও ছবির দৃষ্টান্ত আর কোথায়ও পাওয়া যায় না । ইংরেজ ঐতিহাসিক F.B.Bradley-Birt রচনা করেন The Romanee of An Eastern Capital, 1906 A.D. বইটি অনেক ক্ষেত্রেই James Taylor এর অনুকরণ হলেও এখানে কিছু লিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে । এতদ্ব্যতীত Sued Hossain এর Echoes From Old Dacca, 1909 তে লেখক ঢাকার স্থাপত্য সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য পরিবেশন করেছেন । ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা হতে প্রকাশিত হয় Hridayanath Majumdar এর The Reminiscences of Dacca। তিনি মুসলিম স্থাপত্যের উপর সামান্য লেখেছেন।এতে তিনি ভুল তথ্য পরিবেশন করেছেন । তবে হিন্দু স্থাপত্যের বর্ণনায় স্বল্প পরিসরে তিনি বহু উপাদান পরিবেশন করেছেন ।

কে,বি, সৈয়দ আওলাদ হাসান (K.B.Syed Aulad Hasan) এর Notes on the Antiquitees of Dacca' 1904, ঢাকার প্রত্ন তত্ত্ব সম্বন্ধে একটি মূল্যবান গ্রন্থ। বইটি সম্ভবত কয়েকটি বক্তৃতার সমষ্টি । কিন্তু এতে প্রাচীন কীর্তির উপর আরবী ও ফার্সী ভাষায় যে অনুলিপি প্রকাশিত হয়েছে তা প্রত্নতাত্ত্বিক ক্ষেত্রে অত্যন্ত মূল্যবান।সম্ভবতঃ ঢাকার উপর আর কোন গ্রন্থে এত বেশী প্রাচীন অনুলিপি সংযোজিত হয়নি । J.T.Rankin এর গ্রন্থ The Study of Antiquities of Dacca 1920, K.B. Aulad Hasan এর Notes On the Antiquities of Dacca - 1904. এর মতই একটি পুস্তক; কিন্তু কে,বি,আওলাদ হাসান তাঁর পুস্তকে যেমন প্রাচীন অনুলিপি সরবরাহ করেছেন এখানে তদ্রূপ নেই ।

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকার প্রখ্যাত গ্রন্থকারী ছিলেন S.M. Taifoor. তিনি লিখেছেন Glimpses of Old Dhaka, 1952. এই গ্রন্থ খানাই পরবর্তীকালে ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে Glimpses of Old Dhaka, A Short Historical Narration of East. Bengal and Assam with Special Treatment of Dacca. " নামে বর্ধিত আকারে পুনঃমুদ্রিত হয়। তিনি বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণে অত্যন্ত সমালোচনা মূলক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় রেখেছেন। Dr. Ahmad Hasan Dani স্থাপত্য শিল্পের উপর দু' খানা নির্ভরযোগ্য বই লেখেন। প্রথম বইটি হলো Muslim Architecture in Bengal, 1961 যা সাধারণতঃ বাংলা ও ঢাকার স্থাপত্যের উপর তথ্য বহুল গ্রন্থ। ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি Dacca A Record of Its Changing Fortunes লেখেন। এ বইটিতে তিনি যে সকল উপাত্ত সরবরাহ করেছেন তা' প্রায় নির্ভুল। A.B.Rajput এর Architecture In Pakistan, 1966 বইটিতে ঢাকার স্থাপত্যের একটি বিবরণ আছে। কিন্তু তা গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয়নি। বাংলা তথা ঢাকার স্থাপত্যের উপর একজন সহজ ও সাবলিল লিখক হলেন ডঃ সৈয়দ মাহমুদুল হাসান। তিনি এ সম্পর্কে বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। যার মধ্যে রয়েছে Mosque Architecture of Pre-Mughal Bengal, 1979, Ancient Monuments of East Pakistan, 1971,

Muslim Monuments of Bangladesh. Dacca The City of Mosques, 1981 A Guide to Ancient Monuments of East Pakistan, 1970. এর মধ্যে 'Dacca The City of Mosques' কে মসজিদ নির্দেশিকা হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। বইটিতে কোন স্থাপত্য বিবরণ নেই। তাঁর Ancient Monuments of East Pakistan এবং Muslim Monuments of Bangladesh প্রায় একই ধাচের বিবরণীমূলক গ্রন্থ। স্থাপত্য বর্ণনায় এ সব গ্রন্থে তিনি কোন মৌলিক প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে পারেন নি। লিখকের Mosque Architecture of Pre-Mughal Bengal একখানা গবেষণামূলক গ্রন্থ। এখানে গৌড় ও পান্ডুয়ার স্থাপত্যের বিবরণ লিখতে গিয়ে মাঝে মাঝে ঢাকা স্থাপত্যের কিছু নমুনা তিনি তুলে ধরেছেন। আজিমুশ্শান হায়দার (Azimusshan Haidar) নামে এক সম্ভ্রান্ত সুশালিন পণ্ডিত লিখেছেন Dacca History and Romance in Place Names, 1967 । ঢাকার ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে

Dhaka University Institutional Repository

এই গ্রন্থের একটি অভিনবত্ব রয়েছে । লিখক অতি যত্ন ও ধৈর্য সহকারে ঢাকা শহরের বিভিন্ন মহল, সড়ক ও গলি পথের একটি তথ্য তুলে ধরেছেন । ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে A City and Its Civic Body শিরোনামায় একখানা গ্রন্থ ঢাকা পৌরসভা কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে । বইটির সম্পাদনা করেছেন আজিমুশ্শান হায়দার । এখানে ঢাকার স্থাপত্য সম্পর্কে অল্প বিস্তর বিবরণ রয়েছে ।

Sir Jadu Nath Sarkar কর্তৃক সম্পাদিত হয়েছে The History of Bengal, Vol No.11, Muslim Period(1202-1757) 1948 এতে ঢাকার স্থাপত্য সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ বিবরণ রয়েছে । Dr. Nazimuddin Ahmed লিখেছেন Islamic Heritage of Bangladesh, 1980, এবং Discover The Monuments of Bangladesh,1984. এই গ্রন্থদ্বয় বাংলাদেশের স্থাপত্যের উপর পরিচিতিমূলক গ্রন্থ । এছাড়াও ইংরেজী ভাষায় রচিত গ্রন্থ হলো Dr. Enamul Haque এর Islamic Art Heritage of Bengaladesh 1983. গ্রন্থ খানায় মসজিদ, সমাধিসৌধ ইত্যাদি সম্পর্কে বিশেষ কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না, তবে এখানে মসজিদগুলির একটি পূর্ণাঙ্গ আলোকচিত্র দেখার চেষ্টা করা হয়েছে ।

ঐসব ইংরেজী গ্রন্থ ছাড়াও বাংলা ভাষায় রচিত কয়েকটি গ্রন্থ রয়েছে । কেদার নাথ মজুমদারের লিখা 'ঢাকার বিবরণ', ১৯১০ খৃঃ , শ্রী যতীন্দ্রমোহন রায় রচিত, 'ঢাকার ইতিহাস, প্রথম খন্ড, ১৩১৯ বঙ্গাব্দ, রাখাল দাস ব্যানার্জির বাংলার ইতিহাস, দ্বিতীয় খন্ড, ১৩২৪ বঙ্গাব্দ, ইত্যাদিতে ঢাকার স্থাপত্য স্থান করে নিয়েছে ।

এছাড়া ডঃ এনামুল হক লিখেছেন 'পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম, ১৯৪৮, আর বিমল গুপ্ত লিখেছেন, 'ঢাকার কথা' ১৩৬৬ বাং সং । এসকল গ্রন্থে স্থাপত্যের বেশি বিবরণ নেই । নাজির হোসেনের 'কিংবদন্তির ঢাকা' ১৯৭৬, বইটি বেশ চিত্তাকর্ষক । এখানে লিখক উপাখ্যান ও ইতিহাসের সমন্বয় ঘটাতে চেষ্টা করেছেন । এই সমন্বয়ের সূত্রে মাঝে মাঝে স্থাপত্য উপকরণও উঁকি মেরেছে । ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দে এ,কে,এম, সামসুল আলম 'লালবাগ দুর্গ ও যাদুঘর' সম্পর্কে একটি বিশেষ বিবরণ লিখেছেন । এখানে লেখক যতদূর সম্ভব সমালোচনা মূলক বর্ণনা -

Dhaka University Institutional Repository

দিয়েছেন। এই প্রতিবেদনে যাদুঘরে রক্ষিত প্রাচীন মাল মশলার একটি বিবরণী আছে। ১৯৮২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ডঃ রফিকুল ইসলামের 'ঢাকার কথা' (১৬১০-১৯১০) বইটিতে কিছু কিছু স্থাপত্যের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু আঃকঃমুঃ যাকারিয়ার 'বাংলাদেশের প্রত্ন সম্পদ', ১৯৮৪ নামক গ্রন্থে লেখক অত্যন্ত অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের সাথে প্রাক-ঐতিহাসিক ও আদি ঐতিহাসিক যুগ হতে শুরু করে মধ্যযুগ পর্যন্ত বাংলাদেশের যাবতীয় প্রত্ন স্থাপত্য অতি বিশ্বস্ততার সাথে লিপিবদ্ধ করেছেন। বইটির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো ঢাকার স্থাপত্যের ইতিহাস। লিখক গতানুগতিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় রাখেন নি বরং বিভিন্ন যায়গায় সমালোচনামূলক দৃষ্টি ভঙ্গী সহকারে স্থাপত্য শৈলির ধারা দেখাতে চেয়েছেন। ১৯৮৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে মুহাম্মদ আবদুর রশিদ এর 'ঢাকা নগরীর মসজিদ নির্দেশিকা। শিরোনাম হতে বুঝা যায় যে এতে ঢাকা নগরীর মসজিদ গুলোর স্থান ও নাম ফলক তুলে ধরা হয়েছে, তবে বইটিতে ভুল ভ্রান্তি রয়েছে প্রচুর।

ঢাকার স্থাপত্য সম্পর্কে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় কিছু লেখা প্রকাশিত হয়েছে। এ সম্পর্কে Asiatic Society পত্রিকার নাম স্মরণযোগ্য। এ পত্রিকায় ঢাকার উপর যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে তাদের মধ্যে H.E. Stapleton এর "Contributions to the History and Ethnology of North- Eastern India , The Antiquity of Dacca," New Series Vol-VI.(1910), Dr. N.K. Bhattasali এর An Enquiry Into The Origin of the City of Dacca ", Vol-V.(1939), Dr. Abu Imam এর Origin of the Name Dacca Vol.III-(1958), A Note by Abu Imam এবং Dr. Mamtazur Rahman Tarafdar এর Reviews'Vol.-VI(1961) উল্লেখযোগ্য। Bengal Past and present এ লেখা Dr. N.K. Bhattasali এর The English Factory at Dacca Vol-XXXIII Serial No 65-66 (January-June 1927) ও এ প্রসঙ্গে বিবেচ্য। বলা বাহুল্য Asiatic Society পত্রিকা ও Bengal Past and Present উভয়ই মৌলিক গবেষণা মূলক প্রবন্ধে সমৃদ্ধ।

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজী ও বাংলায় পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ইংরেজী পত্রিকায় প্রকাশিত Mrs. Ayesha Begum এর The Earliest Extant Mughal Monument in Dhaka, The Dacca University Studies, Vol-XXXVII, Part A December, 1982, এবং জনাব Muhammad Shamsul Huq এর The Mosque and The Tomb of Haji Khwaja Shahbaz The Dhaka University Studies Part. A. Vol.-44, No.1 (June-1987) উল্লেখযোগ্য।

অধিকন্তু জনাব মোহাম্মদ শামসুল হক এর 'কারতালাব খান মসজিদ' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা অষ্টম সংখ্যা ১৯৭৮, স্থাপত্য শিল্পে ঢাকেশ্বরী, ঐ, একাদশ সংখ্যা জুন-১৯৮০, মহানগরীর স্থাপত্যে পরীবিবি ও তাঁর মাযার, একটি সমস্যা ও সমাধান, ঐ ষোড়শ সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৮২, জপমালা রানীর গির্জা, তেজগাঁও, একটি পর্যালোচনা, ঐ ষড়বিংশ সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৮৬, বাংলাদেশে মোঘল স্থাপত্য শিল্প, ঐ অষ্টবিংশ সংখ্যা জুন-১৯৮৭, প্রাক মোঘল যুগের ঢাকা একটি পর্যালোচনা, ঐ ঊনত্রিংশ সংখ্যা অক্টোবর ১৯৮৭ এবং মিসেস আয়শা বেগম এর তারা মসজিদ অতীত ও বর্তমান, ঐ দ্বাত্রিংশ সংখ্যা অক্টোবর ১৯৮৮ অধ্যাপক মুনতাসির মামুনের, ঢাকা শহরের বিকাশ ধারা' ঐ আগষ্ট সংখ্যা ১৩৮৫, গবেষণামূলক হলেও এসব লেখায় স্থাপত্যের বিকাশ ও উৎকর্ষের বিশদ আলোচনা করা হয়নি।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে Dacca Review নামে একটি মূল্যবান পত্রিকা প্রকাশিত হতো। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে Dacca Review এর চতুর্থ খন্ডে সৈয়দ আওলাদ হাসান (Syed Aulad Hasan) এর Old Dacca নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৯১৯-২০ খ্রীষ্টাব্দে Dacca Review এর নবম খন্ডে প্রকাশিত হয় J.T. Rankin এর The Study of Antiquities in Dacca, (1920)। এই দুই খানা মূল্যবান প্রবন্ধই পরে ক্ষুদ্র বই এর আকারে প্রকাশিত হয়েছে যা পূর্বের আলোচনায় ধরা দিয়েছে।

District Gazetteers গুলো ঢাকার স্থাপত্য সম্পর্কে অনেক কথা বলেছে। এর মধ্যে গুরুত্ব পূর্ণ হলো J.T.Rankin এর East Pakistan District Gazetteers, 1869

Dhaka University Institutional Repository

S.U.H. Rizvi এর East Pakistan District Gazetters. B.C. Allens এর Eastern Bengal District Gazetteers 1912.

১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দে এ,কে,এম, শামসুল হুদা বাংলাদেশ Directory সম্পাদিত করেন। এতে রয়েছে ঢাকার স্থাপত্য সম্বন্ধে বর্ণনা। বাংলাদেশ তথ্য মন্ত্রনালয় হতে প্রকাশিত পাক্ষিক "সচিত্র বাংলাদেশ" পত্রিকাতেও ঢাকার স্থাপত্যের উপর লেখালেখি চলছে। বেগম নুৎফুন নেছা হাবিবুল্লাহ লিখেছেন 'পরীবিবির সমাধি, ১৯৮০ এবং মোহাম্মদ আলমগীর লিখেছেন "মধ্য যুগীয় বাংলার মুসলিম স্থাপত্যে অলংকরণ, ১৯৮১। একই লেখকের 'বাংলার সুলতানী ও মোঘল স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য" ১৯৮৮ এখানে প্রকাশিত হয়েছে। আরো প্রকাশিত হয়েছে মওদুদুর রশিদ এর " মুঘল আমলের ঢাকার স্থাপত্য" ১৯৮৯।

বাংলার পত্র পত্রিকা গুলোতেও ঢাকার স্থাপত্য স্থান পেয়েছে। দৈনিক আজাদ ২৬শে জুলাই ১৯৮৯ইং এ লিখেছেন মাজির হোসেন। তাঁর প্রবন্ধের নাম "ঢাকার ইতিহাসের পাতা থেকে"। ঢাকা বাণী ঈদ সংখ্যা ১৯৮৯ইং এতে মওদুদুর রশিদ লিখেছেন, "মোঘল আমলে ঢাকার স্থাপত্য"। একই পত্রিকায় ২৯শে জানুয়ারী, ১৯৮৯ প্রকাশ করেছেন মোহাম্মদ নুরুদ্দিন জতেপুরী "ঢাকা নামের ইতিহাস"। এছাড়াও রয়েছে দৈনিক ইনকিলাব বার্ষিক সংখ্যা ১৯৮৭তে প্রকাশিত সৈয়দ মাহমুদুল হাসানের লালবাগ কেল্লা এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এর সাপ্তাহিক বাংলা ম্যাগাজিন অগ্রপথিক চতুর্থ বর্ষ, ৩৬ সংখ্যা ১৯৮৯ এ প্রকাশিত মোহাম্মদ আবু মুসার " লালবাগ দুর্গ"। সেষোক্ত পত্রিকায় ৩০ সংখ্যা ১৯৮৯তে মুসা সাহেব প্রকাশ করেছেন' পরীবিবির মাযার।' অধুনা 'ফসল' নামে একটি ত্রি মাসিক পত্রিকায় "ঢাকা নগরীর ৫০০ বৎসর" এই শিরোনামায় লিখেছেন অনেকেই।

এ সব লেখায় স্থাপত্যের উপরে বিক্ষিপ্ত কিছু কথা ও আলোচনা আছে যা গবেষণার জন্য যথেষ্ট সহায়ক নয়।

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকার রাজনৈতিক পটভূমি

ত্রয়োদশ শতাব্দীর উন্মেষ বাংলাদেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে একটি নূতন যুগের সূচনা করে। সম্রাট শিহাবুদ্দিন ঘোরীর সেনাপতি মোহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী ১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দে বিহার জয় করেন। ১২০১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারীতে তিনি নদীয়ার উপর অতর্কিত হামলা চালান এবং লক্ষণাবতির হিন্দু রাজা রায় লক্ষণসেন দেব পূর্ব বাংলার বিক্রমপুরে পলায়ন করেন। এই হামলার ফলে বাংলাদেশের উত্তর ও দক্ষিণ অংশ মুসলিম সাম্রাজ্য ভুক্ত হয়। বখতিয়ার খিলজী মহান সেনাপতি ও সুবিজ্ঞ রাজনীতিবিদ ছিলেন। বাংলা-বিহার জয় করার পরে তিনি বহু মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকা[1] এবং দূর্গ নির্মাণ করেন।

১২০০ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী একশত বৎসরের মধ্যে সমস্ত গংগা ব্রক্ষপুত্র এলাকা মুসলমানদের শাসনাধীনে এসে পড়ে। সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন তখন দিল্লীর সুলতান। তুগ্রীল বেগ (Taghrul Beg) তাঁর অধীনস্থ বাংলাদেশের গভর্ণর। সোনার গাঁ এর রায়-দনুজ (Rai Danuj) এবং তুগ্রীল এর দুর্ভেদ্য দূর্গ নার্কিলার ([illegible]) মধ্যকার সম্পর্কের সূত্র ধরে তুগ্রীল বেগ আধুনিক ফরিদপুর ও ঢাকা জেলার উপর মুসলমানদের প্রভুত্ব কায়েম করেন[2]। এভাবে তুগ্রীল পূর্ব-বাংলার হিন্দু রাষ্ট্রের ভিতরে অভিযান চালিয়ে স্থায়ীভাবে নারকিল পর্যন্ত পদ্মা নদীর দুই তীরের নদী অধ্যুষিত এলাকা স্থায়ীভাবে জয় করে নেন। এর পূর্বে পূর্ব বাংলা সাধারণতঃ হিন্দু রাজাদের অধীন ছিল। জিয়াউদ্দিন বারানীর তারিখ-ই-ফিরোজ শাহীর অস্পষ্টতার কারণে কোন বৎসরে হিন্দু রাজত্বের অবসান ঘটিয়ে তুগ্রীল বেগ পূর্ব বাংলা অধিকার করে ছিলেন সেই সম্বন্ধে স্পষ্ট করে কিছু বলা সম্ভব নয়, তবে সম্ভবতঃ ১২৭৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে কোন এক বৎসরে তুগ্রীল বেগ এই অঞ্চলটি বলবনের সাম্রাজ্যভুক্ত করেছিলেন, কেননা এই বৎসরই সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন বিদ্রোহী তুগ্রীলের বিরুদ্ধে অযোধ্যার শাসনকর্তা মালিক তুরমাতিকে (Malik Turmati) প্রেরণ করেছিলেন। ১২৮১ খ্রীষ্টাব্দে তুগ্রীল বেগ নিহত হলে বাংলা মামলুক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। বস্তুতপক্ষে ১২০০ খ্রীষ্টাব্দে মোহাম্মদ বখতিয়ার খিলজির বাংলা

Dhaka University Institutional Repository

বিজয়ের পর হতে দিল্লীর সম্রাটগণ কর্তৃক নিযুক্ত লাখনাউতির গভর্ণরগণ ১২০৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ১৩৫ বৎসর বাংলাদেশ শাসন করেন।

সুলতান মোহাম্মদ বিন তুঘলকের আমলে বাংলা, লাখনাউতি, সাতগাঁও এবং সোনারগাঁও এই তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। এদের শাসনকর্তা ছিলেন যথাক্রমে কদর খান (Qadar Khan) মালিক ইজ্জউদ্দীন ইয়াহ ইয়া (Malik Izzuddin Yahiya) ও বাহারাম খান ওরফে তাতার খান (Bahram Khan)। বাহারাম খান সোনারগাঁয়ে মৃত্যু বরণ করলে ফখরউদ্দিন সোনারগাঁয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং সুলতান ফখরউদ্দিন মোবারক শাহ উপাধি ধারণ করেন। কিন্তু লাখনাউতির শাসনকর্তা কদর খান তাঁকে সোনার গাঁ হতে বিতাড়িত করেন। বর্ষা শুরু হলে ফখরউদ্দিন মেঘনার পরপার হতে সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করে কদর খানকে পরাজিত ও নিহত করেন। এ অপ্রত্যাশিত বিজয়ে উৎফুল্ল হয়ে ফখরউদ্দিন মুখলিস (Mukhlis) নামক এক সেনাপতিকে লাখনাউতি অধিকার করার জন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু কদর খানের বক্শী আলী মোবারক মুখলিস-কে পরাজিত ও নিহত করে তিনি লাখনাউতির কর্তৃত্ব ধারণ করেন[৩]। দিল্লীর সুলতান মোহাম্মদ বিন তুঘলক বাংলায় স্বীয় প্রভুত্ব বজায় রাখার উদ্দেশ্যে মালিক ইউসুফকে বাংলায় পাঠানো পথে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। এর পর সুলতান বাংলায় অন্য কাউকে পাঠাবার চিন্তা করেন নি। বস্তুতপক্ষে ১৩৩৯-৪০ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা মুহাম্মদ বিন তুঘলকের রাজ্য হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

শামস-উদ-দীন ইলিয়াস শাহ ১৩৪২ খ্রীষ্টাব্দে লাখনাউতির সিংহাসনে আরোহণ করলে বাংলার ইতিহাসে নব যুগের সূচনা ঘটে। তিনি রাজধানী গৌড় হতে পান্ডুয়াতে স্থানান্তরিত করেন। ১৩৩৮ খ্রীষ্টাব্দ হতে বাংলার স্বাধীনতার যুগ শুরু হয় এবং ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এ দু'শ বৎসর সময়কাল বাংলাদেশের স্বাধীন সুলতানী আমল।

১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দে শেরশাহ চৌসার যুদ্ধে মুঘল সম্রাট হুমায়ুনের উপর জয়লাভ করলে বাংলা কার্যতঃ আফগান শাসকদের অধীনে চলে যায় এবং ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত শেরশাহ, তাঁর বংশধর এবং তাদের আফগান উত্তরাধিকারীগণের অধীন থেকে যায়।

Dhaka University Institutional Repository

১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জুলাই বাংলার সর্বশেষ স্বাধীন সুলতান দাউদ খান কররাণী রাজমহলের যুদ্ধে পরাজিত[৪] ও নিহত হন এবং বাংলা সম্রাট আকবরের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়ে যায়। ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দ হতে ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বার ভূইঞা নামে পরিচিত বাংলার জমিদারগণ সম্রাট আকবর এবং তাঁর পুত্র সম্রাট জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালান। ভূইঞাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ঢাকা ও ময়মনসিংহের ঈশা খান, বিক্রমপুরের কেদার রায়, যশোরের প্রতাপাদিত্য, বীরভূম, প্যাচেট ও হিজলী পরগণার হাম্বীর, মাসুম খা ও সলিম খাঁ, বোকাই নগরের খাজা ওসমান খাঁ, মাসুম খাঁ ও কতলু খা, নোয়াখালীর অনন্ত মানিক্য, ও বাকরগঞ্জের কন্দর্পনারায়ণ।

মুঘলরা রাজমহলের যুদ্ধে জয়লাভ করলেও বাংলার অনেকাংশ আফগানদের অধীনেই থেকে যায়। সুবাদার খান জাহান, মুজাফফর খান, খান-ই আযম, শাহবাজ খান ও উজির খান বাংলা সম্পূর্ণরূপে জয় করতে পারেন নি। সম্রাট আকবর ১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে কাচওয়া রাজা মানসিংহকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন। ১৫৯৫-৯৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজা মানসিংহ এবং ঈশা খাঁন ও কেদার রায়ের মধ্যকার সংঘর্ষে জয় পরাজয় নির্ধারিত হয় নি। অনেকটা নিরাশ হয়ে রাজা মানসিংহ ১৫৯৭ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশ প্রায় বার ভূইঞাদের হাতে রেখে দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ঈশা খান মসনদ-ই-আলা মৃত্যু বরণ করলে বাংলার সমরনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সূচিত হয়। ১৬০১ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে দ্বিতীয় বার রাজা মানসিংহ বাংলার সুবাদার হয়ে আসেন। ১৬০২ খ্রীষ্টাব্দে রাজা তাঁর সদর দফতর তাণ্ডা হতে ঢাকাতে স্থানান্তরিত করেন[৫]। ১৬০৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিক্রমপুরের কেদার রায়কে পরাজিত করেন।

১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীর সিংহাসনে আরোহণ করে রাজা মানসিংহকে পুনরায় বাংলায় পাঠান; কিন্তু ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি শেষ বারের মত বাংলাদেশ ত্যাগ করেন। বাংলা ও উড়িষ্যার সুবাদার জাহাঙ্গীর কুলী খান লালাবেগ এর মৃত্যুর পর সম্রাট ১৬০৬-০৮ খ্রীষ্টাব্দে শায়েখ আলা উদ-দীন চিশতী ফারুকী ওরফে উমদাদ-উল মুলক ইস্লা

Dhaka University Institutional Repository

উদ-দৌলা নওয়াব ইসলাম খানকে বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদার করে পাঠান। এই যুগ্ম প্রদেশের দায়িত্ব ভার নিয়ে ইসলাম খান রাজমহল থেকে ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তরের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

রাজধানী স্থানান্তরের সার্বিক কারণগুলো কোন ঐতিহাসিকই বিশ্লেষণ করেননি। স্যার যদুনাথ সরকার কর্তৃক লন্ডনে আবিস্কৃত মীর্জা নাথনের "বাহারিস্তান-ই-গায়েবী" সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলের বাংলার একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস। ডঃ এম. আই. বোরাহ কর্তৃক ইংরেজীতে অনুদিত এই গ্রন্থে ... উল্লেখ রয়েছে যে বিদ্রোহীদের কবল হতে পূর্ব বাংলাকে উদ্ধার করার জন্য সম্রাট জাহাঙ্গীর ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ইসলাম খানকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেছিলেন। চার্লস ষ্টুয়ার্ট (Charles Stuwart) পর্তুগীজ জল দস্যুদের লুণ্ঠন তৎপরতা এবং তাদের দমনের জন্য ইসলাম খানের আমুত্রিকতার কথা উল্লেখ করেছেন। ডব্লিউ. ডব্লিউ. হাকীর (W.W. Hunter) মনে করেন যে মগদের লুণ্ঠন তৎপরতা এবং আফগানদের বিদ্রোহ দমন করার জন্য রাজধানী স্থানান্তরের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল। খান বাহাদুর সৈয়দ আওলাদ হাসান বলেন আফগান বিদ্রোহী, মগ ও পর্তুগীজদের[৬] শায়েস্তা করার জন্যই ইসলাম খান রাজমহল হতে ঢাকাতে রাজধানী স্থানান্তরিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। আওলাদ হাসানকে অনুসরণ করে ডঃ রফিকুল ইসলাম মন্তব্য করেন যে বার ভূইঞাদের আধিপত্য খর্ব, মগ ও পর্তুগীজ জল দস্যুদের লুণ্ঠন তৎপরতা বন্ধ করে নিম্ন বঙ্গকে রক্ষা করার জন্য ইসলাম খান ঢাকায় রাজধানী স্থাপন করেন।

উপরে উল্লেখিত ঐতিহাসিকদের বিবরণ অসম্পূর্ণ। ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ইসলাম খান তিনটি সুবাদার নিযুক্ত হওয়ার সময় বাংলার রাজধানী ছিল রাজমহল। সুতরাংই এই অঞ্চলের এই রাজধানীটি সুবার সঠিক সীমার বাইরে অবস্থিত ছিল। এই জন্যই প্রদেশের ভিতরে একটি রাজধানী স্থাপনের দায়িত্ব ইসলাম খানের উপর পড়েছিল। ঢাকা বুড়িগংগা নদীর তীরে অবস্থিত। এর পূর্বে শীতলক্ষ্যা ও পশ্চিমে ধলেশ্বরীর সম্মিলিত

Dhaka University Institutional Repository

প্রবাহ মেঘনা নদীতে পড়েছে। তাই ভৌগোলিক কারণ বশতঃ এই স্থানটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ। বাংলার বার ভূইঞাদের কার্যকলাপ মুঘল আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিরাট হুমকি সৃষ্টি করেছিল। পূর্ব বাংলার বিদ্রোহীদের প্রধান ঘাটিগুলির অবস্থান পর্যবেক্ষণ করলে এ সম্পর্কে আর কোন সন্দেহ থাকে না। (ক) মাসুম খান কাবুলির অধীনস্থ পাবনা জেলার সাজাদপুর ও চাটমহর (খ) রঘুনাথ নামে ব্রাহ্মণ সর্দারের অধীনস্থ সুসাং বা উত্তর পূর্ব ময়মনসিংহ (গ) ওসমান খানের অধীনস্থ ব্রহ্মপুত্র হতে সিলেট সীমান্তের মধ্যবর্তী পূর্ব ময়মনসিংহ। কিশোরগঞ্জের কয়েক মাইল উত্তর পশ্চিম দিকস্থ বোকাই নগর ছিল এর রাজধানী। (ঘ) ওসমানের জমিদারীর দক্ষিণ দিকে ছিল মুসা খানের রাষ্ট্র। এই মুসা খাঁন কেদার রায়ের জমিদারীর উপর প্রাধান্য বিস্তার করে পূর্ব বাংলার দ্বিতীয় বৃহত্তম ভূইঞাতে পরিণত হয়েছিলেন। (ঙ) ঢাকা জেলার ধলেশ্বরী নদীর দুই তীরে সিন্দুরী, খালসী এবং চন্দ্র প্রতাপ পরগণা কতিপয় হিন্দু জমিদারের আওতাভুক্ত ছিল। (চ) মুসা খানের জমিদারীর পশ্চিমাংশে অর্থাৎ বর্তমান ঢাকা জেলার অন্তর্গত সুলতান প্রতাপ, সেলিম প্রতাপ ও কাসিমপুর আওয়ালের গাজীদের শাসনাধীনে ছিল। (ছ) বাকলা ও বাকেরগঞ্জ জেলার অধিকাংশ ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রামচন্দ্র রায়ের অধীন ছিল। (জ) কিন্তু বার ভূইঞাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রতাপশালী ভূইঞা ছিলেন যশোরের প্রতাপাদিত্য।

ইসলাম খান কখন সম্রাট জাহাঙ্গীর কর্তৃক বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং কখন তিনি রাজমহল হতে ঢাকায় এসে পৌঁছেছিলেন এ বিষয়ে ঐতিহাসিকগণ একমত হতে পারেন নি। চার্লস স্টুয়ার্ট এর মতে ইসলাম খান ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ঢাকাতে প্রবেশ করেছিলেন। চার্লস স্টুয়ার্ট কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ মিঃ ওয়াইজ (Mr. Wise) ব্রাডলিবার্ট (Bradley Birt), জে,জে,এ ক্যাম্পোস (J.J.A. Campos) স্বীকার করে নিয়েছিলেন। মিঃ গ্লাড উইন, (Glad Win) এর বর্ণনা মোতাবেক ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে ওসমান আফগানের উপর বিজয়ের পর ইসলাম খান সরকারী দপ্তর ঢাকাতে স্থানান্তরিত করেন। এই মতামত সমর্থন করেছেন যেমন টেইলর (James Taylor) ডাব্লিউ, ডাব্লিউ, হান্টার,

Dhaka University Institutional Repository

নেলসন রাইট (Nelson Wright) ও সৈয়দ আওলাদ হাসান । কিন্তু মির্জা নাথন তাঁর বাহারিস্তান-ই-গায়েবী গ্রন্থে পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে ইসলাম খান ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে ঢাকায় পদার্পণ করেন । ডঃ আবদুল করিম তাঁকে সমর্থন করেছেন । স্পষ্টতই ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে ইসলাম খান রাজ মহলে সরকারী কর্মভার গ্রহণ করার দু বৎসরের কিছু বেশী সময় পরে তিনি ঢাকাতে প্রবেশ করেছিলেন । এর কারণ হলো ইসলাম খান ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে রাজমহল হতে যাত্রা করেন । ১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দের বর্ষা কাল তাঁকে ঘোড়া ঘাটে অস্থায়ী সেনানিবাসে কাটাতে হয় । অতপর তিনি ধীর মন্থর গতিতে ঢাকার দিকে আসতে থাকেন । পথে তাঁকে বিদ্রোহী জমিদারদের সাথে সংগ্রাম করতে হয় । স্পষ্টতই তিনি ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে ঢাকা পৌঁছেন । এখান থেকে তিনি জমিদারদের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণের পরিকল্পনা করেন ।

আলাউদ-দীন ইসলাম খান চিশতী তদানিন্তন বাংলার সময়োপযোগী শাসক ছিলেন। তাঁর অপ্রতিরোধ্য আক্রমনের সম্মুখে ঈশা খানের পুত্র মুসা খান, যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্য ভুলার রাজা অনন্ত মাণিক্য, বাকলার রাজা কন্দর্পনারায়নের পুত্র রামচন্দ্র[7], ফতেহাবাদের ভূইঞা জমিদার মজলিশ কুতুব, ভূষণার রাজা মুকুন্দের পুত্র সৎরক্ষিত, চন্দ্র প্রতাপের ভূইঞা জমিদার বিনোদ রায়, চিলা জুয়ারের[8] ভূইঞা পিতাম্বর, আলাইপুরের ইলাহী বক্স টিকতে পারেন নি । কোচ হাজোর রাজা প্রকাশ সিং নারায়ণ আত্ম সমর্পণ করলে আসামের কামরূপ, কাছার, ধুবরী এবং পার্শ্ববর্তী কোচ দেশ সমূহ মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় । সিলেটের মৌলভী বাজারের নিকট নয়াদারপুর বা দৌলাম্বা পুরের যুদ্ধে ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মার্চ ওসমান খানআফগান আহত হয়ে মৃত্যু বরণ করলে ওসমানের রাষ্ট্র সংঘের অন্যান্য পাঠান রাষ্ট্রগুলি মুঘলদের বশ্যতা স্বীকার করে নিল । সিলেটের জমিদার বায়জীদ কররাণী, বানিয়াচং এর জমিদার আনোয়ার খান, তারাফ এর জমিদার তথা খাজা ওসমানের পুত্র মোমরেজ খান, তাওয়াল ও সরাইলের জমিদার বাহাদুর গাজীর পুত্র সোনা গাজী মুঘলদের নিকট বশ্যতা স্বীকার করলেন । মাতাং এর জমিদার পালোয়ান গাজী মুঘলদের বিরোধীতা করতে গিয়ে মৃত্যু মুখে পতিত হলেন । রাজ্য জয়ের এই উল্লাসময় মুহুর্তে ইসলাম

Dhaka University Institutional Repository

খান ১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে আগষ্ট মৃত্যু বরণ করেন। ইসলাম খানই বাস্তব ক্ষেত্রে বাংলাদেশ জয় করে একটি একক শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতি গঠন এবং দেশে শান্তি শৃংখলা স্থাপন করেন।

ইসলাম খানের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র হুসাং পরবর্তীকালে ইকরাম খান অস্থায়ীভাবে বাংলার শাসনভার গ্রহণ করেন। কিন্তু ১৬১৪ খ্রীষ্টাব্দে ইসলাম খানের ভ্রাতা ও হুসাং এর পিতৃব্য বিহারের সুবাদার কাসেম খান চিশতি ওরফে নওয়াব মুহতাশিম খান বাংলার সুবাদারীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তাঁর সুবাদারীতে আরাকান রাজের অধীনস্থ চট্টগ্রামে এবং রাজা শত্রু দমনের (Raja Satru daman) অধীনস্থ কাছাড়ে অস্থায়ীভাবে মুঘল আধিপত্য কায়েম হয়।

কাসিম খানের পরে নওয়াব ইব্রাহিম খান ফতে জং বাংলার সুবাদার হয়ে আসেন। অনতিকাল পরেই ইব্রাহিম খান, ইস্পাদিয়ার খাঁন ও মুসা খানের নেতৃত্বে পরিচালিত এক অভিযানে ১৬১৮ খ্রীষ্টাব্দে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজা যশোমাণিক্যের নিকট হতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জয় করা হয়।

১৬২৪ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীর এর পুত্র খসরু (পরবর্তীকালে শাহজাহান) এর সাথে আকবর নগরের নিকট এক যুদ্ধে ইব্রাহিম খান ফতে জং পরাজিত হন। খসরু ১৬২৪ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসের প্রথম দিকে ঢাকায় পৌঁছেন[১০]। সাত দিন ঢাকায় অবস্থানের পর খসরু আব্দুর রহিম খান-ই-খানানের পুত্র দারাব খান (Darab Khan) কে ঢাকার দায়িত্ব দিয়ে দাক্ষিণাত্যে চলে যান। সম্রাট জাহাঙ্গীর জামানা বেগ ওরফে নওয়াব মহবত খান (Mahabbat Khan) কে বাংলার সুবাদার করে পাঠান। এ সময় পর্তুগিজদের সহায়তায় আরাকান রাজ জান্দ্রামাজ (Xandramaz) তথা রাজা [illegible] মাকি ঢাকা লুণ্ঠন করলে সম্রাট জাহাঙ্গীর অসন্তুষ্ট হয়ে ১৬২৬ খ্রীষ্টাব্দে বিহারের সুবাদার নওয়াব মোকাররম খান (Nawab Mukarram Khan) চিশতীকে বাংলায় পাঠান। এই নূতন সুবাদার হাজো (Hajo) রাজ্যের নিকট হতে আসামের গোয়ালপাড়া ও অন্যান্য পার্শ্ববর্তী জেলা সমূহ মুঘলদের অধীনে আনেন। ১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে এক

Dhaka University Institutional Repository

দুর্ঘটনায় মোকাররম খান নিহত হলে সম্রাট জাহাঙ্গীর নওয়াব ফিদাই খান (Nawab Fidai Khan) কে বাংলায় সুবাদার নিযুক্ত করেন ।

১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট শাহজাহান সিংহাসনে আরোহণ করে ফিদাই খানের পরিবর্তে মীর মুরাদ দক্ষিণীর পুত্র নওয়াব মীর কাসিম খান (Mir Kasem Khan) কে বাংলার সুবাদার করে পাঠান । ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে কাসিম খান মৃত্যু বরণ করলে মীর মোহাম্মদ বাকীর (Mir Mohammed Baqrir) ওরফে নওয়াব আজিম খান বাংলার সুবাদার হয়ে ঢাকা আসেন । আসাম অভিযানে গৌহাটির নিকট-এ মীর মোহাম্মদ বাকীরের সেনাবাহিনী পর্যুদস্ত হয়ে গেলে ১৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট শাহজাহান মীর আবদুস সালাম (Mir Abdus Salam) ওরফে নওয়াব ইসলাম খান মোশাহেদী (Nawab Islam Khan Mushhedi) কে বাংলার সুবাদার করে পাঠান । তিনি আসামের অহোমদের বিরুদ্ধে প্রথম অভিযানে পরাজয় বরণ করেন বটে কিন্তু ঈশা খানের পুত্র মাসুম খানের নেতৃত্বে মুঘল বাহিনীর চাপের মুখে অহমরা ছত্রভংগ হয়ে যায় । ১৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরে গারু এবং খ্রীঘট বিজিত হল[১০] ।

সম্রাট শাহজাহান ইসলাম খানকে রাজস্ব মন্ত্রী নিয়োগ করেন এবং তাঁর দ্বিতীয় পুত্র শাহ সুজাকে বাংলা ও উড়িষ্যার সুবাদার করে পাঠালেন । ১৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দে শাহ সুজা বাংলা ও বিহারের দায়িত্বভার গ্রহণ করে বাংলার রাজধানী ঢাকা হতে রাজমহল তথা আকবর নগরে স্থানান্তরিত করেন । কিন্তু কিছুকাল পরে সম্রাট শাহজাহান তাঁকে কাবুলের সুবাদার হিসেবে প্রেরণ করলে তাঁর স্থলে নওয়াব ইতেকাদ(Nawab Itegad) খান বাংলার দায়িত্বে নিয়োজিত হন । ১৬৫২ খ্রীষ্টাব্দে সুজা বাংলাদেশে ফিরে আসেন এবং ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে মীর জুমলার আগমণ পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশ শাসন করেন ।

১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট শাহজাহান কঠিন রোগে আক্রান্ত হলে সম্রাটের চার পুত্র দারা, সুজা, আওরঙ্গজেব ও মুরাদের মধ্যে উত্তরাধীকার সংগ্রামে মোহাম্মদ সুজা'ই প্রথম অস্ত্র ধারণ করে দিল্লীর দিকে অগ্রসর হন । কিন্তু বেনারসের নিকট বাহাদুরগড় যুদ্ধে

Dhaka University Institutional Repository

তিনি দারাশিকোহর জ্যেষ্ঠ পুত্র সোলায়মান শিকোহর নিকট শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। সুজা পশ্চাদপসারণ করে শক্তিসঞ্চয়ে সচেষ্ট হন। কিন্তু ১৬৫৬ খ্রীঃ ফতেপুর জেলার খাজুয়ার যুদ্ধে তিনি সম্রাট আওরঙ্গজেবের বাহিনীর নিকট পরাজয় বরণ করেন। তিনি যুদ্ধের ঘটনা হয়ে রাজমহলে পৌঁছলে আওরঙ্গজেব তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র মোহাম্মদ সুলতান ও সেনাপতি মীর জুমলাকে তাঁর পশ্চাৎ অনুসরণ করতে নির্দেশ দেন। শাহ সুজা মীর জুমলার অতুলনীয় শক্তিমত্তার নিকট তান্ডাতে তৃতীয়বার পরাজিত হন। তিনি ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন বটে, কিন্তু তাঁর অধীনস্থ জাহাঙ্গীর নগরের সুবাদার রশিদ খান তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করলে তিনি আরাকানের উদ্দেশ্যে নাফ নদী অতিক্রম করেন। আরাকানে তাঁর উচ্চাকাংখা সম্বন্ধে অহেতুক সন্দেহ করে আরাকান রাজ ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে পরিবারবর্গ সহ তাঁকে হত্যা করেন[১২]। ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই মে মীর জুমলার ঢাকায় প্রবেশের সাথে সাথে বাংলা আওরঙ্গজেবের অধীনে চলে গেল[১৩]। স্থাপত্য শিল্পে শাহসুজা যথেষ্ট অনুরাগী ছিলেন। তাঁর নির্দেশে ঢাকাতে মীর আবুল কাশিম খান হোসাইনী আত-তাব-তাবা খাস শিমনানী বড় কাটরা নির্মাণ করেন। এই সময় বিখ্যাত হোসাইনী দালানও নির্মিত হয়। ঢাকার ঈদগাহও তাঁর অবিস্মরণীয় কীর্তি।

শাহ সুজা বাহাদুরের পরে মীর মোহাম্মদ সাঈদ ওরফে আমীর-উল-উমারা নওয়াব মোয়াজ্জেম খান মীর জুমলা খান-ই-খানান (Muhammed Sayyed alias Amir ul-Umara Nawab Muazzem Khan Mir Jumla Khan-e-Khanan) বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন। ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে মীর জুমলা ঢাকায় পৌঁছেন। তিনি রাজধানী রাজমহল হতে ঢাকায় স্থানান্তরিত করেন[১৪]। ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে মীর মোহাম্মদ মুকিম (Mir Muhammed Muqim) এবং মুসা খানের পৌত্র দিওয়ান মনোয়ার খান (Dewan Manawar Khan) সহযোগে তিনি আসামের বিরুদ্ধে অগ্রসর হলে কোচবিহার মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দে গোয়াল পাড়া দুর্গসহ কোচ হাজোসেন, কামাক্ষা (Kamakshya) গোহাটি মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ মীর জুমলা অহোম রাজধানী গরহগাও-এ প্রবেশ করেন[১৫]। মীর জুমলা সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান ইস্রাকপুর,

Dhaka University Institutional Repository

সোনাকান্দা ও খিজিরপুরে[১৬] দুর্গ নির্মান করেন। টংগীর সেতু তাঁরই কীর্তি। বিবি মরিয়ম ও কালো খান জমজম কামান তাঁকে স্মরণীয় করে রেখেছে।

মীর জুমলার পর ইসলাম খান নওয়াব শায়েস্তা খানের আগমন পর্যন্ত বাংলার শাসনের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। মির্জা আবু তালিব রুকনুস সালতানাত আমীর-উল-উমারা নওয়াব শায়েস্তা খান দু'বার বাংলার সুবাদারীর দায়িত্ব গ্রহন করেন। (ক) ১৬৬৪ হতে ১৬৭৭ খ্রীষ্টাব্দ এবং (খ) ১৬৮০ হতে ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। সর্ব শুদ্ধ তিনি ২১ বৎসর এ দেশের শাসন কার্য পরিচালনা করেন। ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকাতে এসেই নওয়াব শায়েস্তা খান শাহ সুজার হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণকল্পে আরাকানের বিরুদ্ধে সমর প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। বিদ্রোহী মুঘল নৌ-ক্যাপটেন দিলওয়ার খান সন্দ্বীপের রাজা হিসেবে সেখানে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলে মুঘল নৌ-সেনাপতি ইবন হোসাইন ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বরে তাঁকে পরাজিত ও ধৃত করেন[১৭]। ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে বুজুর্গ উমিদ খান(Bujurg Umid Khan) ও ইবনে হোসাইন চট্টগ্রাম অধিকার করেন। পতেঙ্গা ও কক্সবাজার সহ রাম সুন্দর মুঘলদের অধিকারে আসে। ইতিমধ্যে মনোয়ার খান পার্বত্য ত্রিপুরা রাজ্য দখল করে নেন এবং ১৬৭৬ খ্রীষ্টাব্দে মোগ্রাং এর পার্বত্য রাজ্যটি শায়েস্তা খানকে কর দিতে রাজি হয়। তহবিল আত্মসাতের অভিযোগে শায়েস্তাখান-কে রাজধানীতে ডেকে পাঠানো হয়। নওয়াব ফিদাই খান কোকা (Nawab Fidai Khan Koka) ১৬৭৭ খ্রীষ্টাব্দ হতে ১৬৭৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশ শাসন করেন।

ফিদাই খান কোকার মৃত্যুর পর শাহানশাহ আওরঙ্গজেব তাঁর তৃতীয় পুত্র প্রিন্স মোহাম্মদ আজম কে (Muhammed Azam) ১৬৭৭ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার সুবাদার করে পাঠালেন। তিনি শায়েস্তা খানের পুত্র বুজুর্গ উমিদ খান এর নিকট হতে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। শাহজাদা আযম শাহ বাহাদুরের শাসনকাল ১৬৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জুলাই হতে ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই অক্টোবর পর্যন্ত চলে। তাঁর সুবাদারীতে আসামীরা বিদ্রোহ করলে মুঘল সেনাবাহিনী গৌহাটি অধিকার করে এর নাম দেন 'আযমগড়'। ইতিমধ্যে রাজপুতনার মেবার, তথা উদয় পুরের রাজা রাজসিংহ বিদ্রোহ ঘোষণা করলে

Dhaka University Institutional Repository

সম্রাট আওরঙ্গজেব তাঁকে ডেকে পাঠান। তিনি তাঁর পুত্র বেদার বক্ত (Bedar Bukht) সহ ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা ত্যাগ করেন। স্থাপত্য শিল্পে লালবাগ বা আওরঙ্গাবাদ কিল্লাহর প্রতিষ্ঠা মোহাম্মদ আযমের অবিস্মরণীয় কৃতিত্ব, তবে ঢাকাতে অবস্থানকালে তিনি দুর্গটির পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে পারেন নি।

মোহাম্মদ আযম শায়েস্তা খানের জ্যেষ্ঠ পুত্র বুজুর্গ উমিদ খানের উপর দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে রাজপুতনায় চলে গিয়েছিলেন। ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দের পর বৎসরই অর্থাৎ ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে শায়েস্তা খান দ্বিতীয়বার বাংলার সুবাদার হয়ে আসেন এবং ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তাঁর দ্বিতীয় দফা শাসনামলে ইংরেজ বণিকদের সাথে মুঘল সাম্রাজ্যের সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। এই সংঘর্ষের মূল কারণ ছিল বাণিজ্য শুল্ক; যা আর্যের বাধাধরা কোন নিয়ম ছিলনা। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এ-বিষয়ে অবশ্য মুঘল সরকার বিশেষতঃ শায়েস্তা খানের নিকট হতে একটি ফরমানের আশা করেছিলেন। কিন্তু শায়েস্তা খানের গড়িমসি নীতিতে বিরক্ত হয়ে উইলিয়াম হেজেস (William Hedges) কোম্পানীর পরিচালকদের নিকট এই মর্মে অনুরোধ জানালেন যে ইংরেজ বণিকরা স্থানীয় শাসকদের সাথে ক্ষমতা না খাটালে বাংলায় ইংরেজদের বাণিজ্য প্রসার লাভ করবে না।[১৮] পরিণতিতে তারা অবশ্যই এক্ষবর্ধমান বাণিজ্য শুল্ক হতে পরিত্রাণ লাভ করবে এবং এমন স্থানে আত্মরক্ষা মূলক বস্তি গড়ে তুলবে যেখান থেকে তারা অতি শীঘ্রই সমুদ্রে পাড়ি জমাতে পারে। পরিচালক মণ্ডলী পরিষদ জারক দ্বিতীয় জেমস এর নিকট হতে অনুমতি নিয়ে ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে হুগলীর দিকে অগ্রসর হয় এবং হুগলী ছাড়খার করে। কিন্তু শায়েস্তা খান কর্তৃক রণ প্রস্তুতির সংবাদে ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে ডিসেম্বর তারা হুগলী ত্যাগ করে এবং সুতানুটিতে অবস্থান করতে থাকে। ১৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীতে মুঘল সুবাদার আক্রমণাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করলে জব চার্ণক সুতানুটি ত্যাগ করে থানা (Thana) দুর্গ অধিকার করেন এবং হিজলী দ্বীপ তাদের নিয়ন্ত্রণে আসেন। ১৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে শায়েস্তা খানের সেনাপতি আবদুস সামাদ রসুলপুর নদী অতিক্রম করে হিজলী হস্তগত করেন। ১১ই জুন ইংরেজরা হিজলী ত্যাগ করে। ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই নভেম্বর ইংরেজরা কলিকাতা ছেড়ে চলে যায়।

Dhaka University Institutional Repository

শায়েস্তা খানের সুবাদারী আমল স্থাপত্য শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা ও উৎকর্ষে চির স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। তিনি বুড়িগংগা নদীর তীরে ছোট কাটরা, মিটফোর্ড হাসপাতালের দক্ষিণ দিকে বুড়িগংগা নদীর তীরে শায়েস্তা খানের মসজিদ, মিটফোর্ড হাসপাতালের জেনানা ভবনের স্থলে একটি সমাধিসৌধ, মোহাম্মদপুরে সাত গম্বুজ মসজিদ, এবং ছোট কাটরার প্রাঙ্গণে চাম্পা বিবির সমাধি সৌধ নির্মাণ করেন। চক শাহী মসজিদ ও তাঁর কীর্তি বলে ধারণা করা হয়। কিন্তু স্থাপত্য শিল্পে তাঁর অতুলনীয় কৃতিত্ব হল লালবাগ কেল্লার পরী বিবির সমাধি সৌধ।

শায়েস্তা খানের সুবাদারীর অব্যবহিত পরেই খান-ই-জাহান বাহাদুর (Khan-i-Jahan Bahadur) বাংলার সুবাদার হয়ে আসেন। কিন্তু জুলাই ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দ হতে জুন ১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দ এই এক বৎসর সুবাদারী করার পর আওরঙ্গজেব এর নির্দেশে তিনি বরখাস্ত হন। এর পরে খান্নী মর্দান খানের পুত্র নওয়াব ইব্রাহিম খান (Nawab Ibrahim Khan) বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন। তাঁর অনুমতিক্রমে ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে আগস্ট ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিনিধি জব চার্ণক সুতানটিতে পদার্পণ করেন। এভাবে কলিকাতায় ইংরেজ বসতি গড়ে উঠে। কালক্রমে ইহা বৃটিশ ভারতীয় সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল হয়ে দাঁড়ায়[৬৯]। ইব্রাহিম খানের শাসনামলে বুড়িগঙ্গা নদীর পর পাড়ে বড় কাটরার বিপরীত দিকে জানজিরা (জিনজিরা) বা জাজিরা প্রাসাদ নির্মাণ করা হয়[৭০]। ইতিমধ্যে মুঘল সাম্রাজ্যের উপর দুর্গতির ঘনঘটা লক্ষ্য করা যায়। এই সময় মেদিনীপুর জেলার ঘাটালচন্দ্র কোনা মহকুমার ছোট বর্দার জমিদার সোভাসিং, তাঁর ভাই হিম্মত সিং এবং উড়িষ্যার আফগান দলপতি রহিম খান বিদ্রোহ ঘোষণা করে হুগলী, মুর্শিদাবাদ ও মালদহে বিশৃংখলা সৃষ্টি করলে ইব্রাহিম খান তাদের দমন করতে ব্যর্থ হন।

ইব্রাহিম খানের অযোগ্যতায় বিরক্ত হয়ে সম্রাট আলমগীর তাঁকে বরখাস্ত করেন এবং ১৬৯৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর পৌত্র আজিমউদ্দিন (Azimuddin) কে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন। আজিমউদ্দিনের পৌঁছবার অব্যবহিত পূর্বে ইব্রাহিম খানের পুত্র জবরদস্ত খান বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। মুঘল সেনাবাহিনী রাজমহল ও মালদহ পুনরুদ্ধার করে এবং জবরদস্ত খান মুখসুদাবাদ ও বর্ধমান হতে হিম্মত সিং ও রহিম শাহকে বিতাড়িত করেন।

Dhaka University Institutional Repository

সুবাদারের অনুমতিক্রমে ইংরেজদের ফোর্ট উইলিয়াম, ফোর্ট ডি ওয়ারলিংস এবং চিচুঁড়া দুর্গ গড়ে উঠে। ১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে মাত্র ১৬ হাজার টাকার বিনিময়ে ইংরেজরা আজিমুদ্দিন (এবন আজিমুশশান) এর নিকট হতে একটি ফরমান লাভ করে। এই ফরমান বলে তারা কলিকাতা, সুতানটি ও গোবিন্দপুর গ্রামের শুল্ক আদায় করার অনুমতি প্রাপ্ত হয়। এভাবে কলিকাতার নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার হয়ে উঠে।

১৬৯৭ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বরে আজিমুশশান বর্ধমানে পৌঁছে বাংলার শাসনভার গ্রহণ করেন। কিন্তু ১৭০২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত তিনি ঢাকাতে তাঁর সদর দফতর স্থাপন করেন নি। ইত্যবসরে ঢাকা তাঁর প্রতিনিধি রহমত খানের দ্বারা পরিচালিত হয়[২১]।

সম্রাট আওরঙ্গজেব শাসন কার্যের সুবিধার জন্য বাংলার শাসনকে দু'ভাগে ভাগ করেন। নিজামত ও হুজুরী। নাজিম বা রাজ্যপাল নিজামতের কর্তৃত্ব পেয়ে সামরিক ও ফৌজদারী প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ করতেন। আর হুজুরীর নেতৃত্ব দিতেন দিওয়ান। তিনি মূলতঃ ছিলেন রাজস্ব প্রশাসক[২২]। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সম্রাট আওরঙ্গজেব কারতালাব খান ওরফে মুর্শিদকুলী (Kartalab Khan alias Murshid Quli Khan) নামে একজন অভিজ্ঞ রাজস্ব কর্মচারীকে বাংলা, বিহার, ও উড়িষ্যার রাজস্ব প্রশাসনের জন্য হুজুরীর দেউয়ান হিসেবে প্রেরণ করেন। এই সুবিখ্যাত রাজস্ব প্রশাসক ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে মতান্তরে ১৭০১ খ্রীষ্টাব্দ হতে ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ঢাকায় অবস্থান করেন[২৩]। আজিমুশশানের দেহরক্ষী বাহিনীর সংখ্যাতিরিক্ত বিষয় নিয়ে সুবাদার ও দিউয়ানের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, যার ফলে ১৭০২ খ্রীষ্টাব্দে সুবাদারের রক্ষীবাহিনী ও মুর্শিদকুলীর মধ্যে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। এই ঘটনার সূত্র ধরে ১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দে কারতালাব খান রাজস্ব প্রশাসনের সদর দফতর ঢাকা হতে মুখসুদাবাদে স্থানান্তরিত করেন। আওরঙ্গজেব এই পরিবর্তনে সম্মতি দান করেন[২৪]। মুখসুদাবাদের নাম দেয়া হয় মুর্শিদাবাদ। আওরঙ্গজেবের অসন্তোষ পড়ল আজিমুশশানের উপর। তাঁকে ঢাকা ত্যাগ করে বিহারে সদর দফতর স্থানান্তরিত করতে নির্দেশ দেয়া হয়। তাঁর পুত্র ফররুখ শিয়ারকে ঢাকাতে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব দিয়ে তিনি বিহারের উদ্দেশ্যে

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা ত্যাগ করেন । তাঁর প্রস্থানের সাথে সাথে ঢাকার গৌরব রবি অস্তমিত হয়[২৫] । ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে আজিমুশ্শান নিহত হলে মুর্শিদকুলী কার্যতঃ বাংলার সুবাদার হয়ে দাঁড়ান । ১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দে ফররুখ শিয়রের রাজত্বকালে তিনি বাংলা, বিহার এবং পরবর্তীকালে উড়িষ্যার দিওয়ানী ক্ষমতা লাভ করেন । তাঁর সময় মুর্শিদাবাদ বাংলার রাজধানী হয়[২৬] । মির্যা লুৎফুল্লাহ (Mirza Lutfullla) ওরফে লুৎফা খানী খান ১৭১৮ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকার ফৌজদার নাজিম হিসেবে কর্মভার গ্রহণ করেন । মুর্শিদকুলী ১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা জুন মুর্শিদাবাদে প্রাণ ত্যাগ করেন । তিনি একটি স্বাধীন প্রাদেশিক রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা[২৭] । ঢাকার বেগম বাজারে অবস্থিত কারতালাব খান মসজিদ তাঁর অতুলনীয় স্থাপত্য কীর্তি । সম্রাট ফররুখ শিয়রের শাসনামলে সরফরাজ খান বাংলাদেশের সুবাদার নিযুক্ত হন । কিন্তু সরফরাজ খানের পিতা সুজাউদ্দিন সম্রাট মোহাম্মদ শাহের অনুমতিক্রমে সুবাদার নিযুক্ত হলে সরফরাজ খান তাঁর পিতার স্বপক্ষে সুবাদারী ত্যাগ করেন । সুজা উদ্দিনের আমলে তাঁর পুত্র সরফরাজ খান বাংলার দিওয়ান এবং তাঁর জামাতা লুৎফুল্লা ওরফে দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী জাহাঙ্গীর নগরের উপ-নাজিম হিসেবে কাজ করেন ।

১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে সুজাউদ্দিন মৃত্যু বরণ করলে পর্যায় ক্রমে তাঁর পুত্র মির্যা আসাদউল্লাহ (Asadullah) ও নওয়াব সরফরাজ খান বাংলার সুবাদারীর দায়িত্ব প্রাপ্ত হন । এই সময়ই নাদিরশাহ ভারতবর্ষ আক্রমন করেন । ইতিমধ্যে সুবাদার সরফরাজ খান এবং অমাত্য আলীবর্দী খানের মধ্যকার সম্পর্ক অত্যন্ত তিক্ত হয়ে উঠে । পরবর্তীকালে ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দের এক সংগ্রামে সরফরাজ খান নিহত হন এবং আলীবর্দী খান বাংলার সুবাদার হন ।

১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারি নতুন প্রাসাদে আলীবর্দী খান মুর্শিদাবাদের মসনদে আরোহণ করেন[২৮] । তিনি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র নওজিস মোহাম্মদ খান (Nawazish Muhammed Khan) ওরফে শাহামেট জং (Shahamet Jung) কে জাহাঙ্গীর নগরের ফৌজদার নাজিম নিযুক্ত করেন । কিন্তু উড়িষ্যার উপ-রাজ্যপাল মুর্শিদকুলী খান রুস্তম জং আলীবর্দী খানের প্রভুত্ব অস্বীকার করলে আলীবর্দী ফুলওয়ারীর (Phulwari) যুদ্ধে তাঁকে পরাজিত করেন । উড়িষ্যার উপ-রাজ্যপাল শাওলাৎ জং (Sawlet Jung) এর ঔদ্ধত্যে

Dhaka University Institutional Repository

উত্তেজিত হয়ে মুর্শিদকুলী রুস্তম জং এর জামাতা মীর্জা বাকীর (Mirza Baqir) কর্তৃক আক্রমণ করে সাওলাৎ জং ও তাঁর পরিবারকে বন্দী করেন। সাওলাৎ জংকে মুক্ত করার জন্য আলীবর্দী মীর্জা বাকীরের বিরুদ্ধে উড়িষ্যায় আগমন করেন। এই সংবাদে মীর্জা বাকীর তাঁর মারাঠা সৈন্য বাহিনীসহ দাক্ষিণাত্যে পলায়ণ করেন। এর কয়েক মাস পরই বাংলার উপর মারাঠাদের আক্রমণ অনুভূত হতে থাকে। অনেক কষ্টে আলীবর্দী খান মারাঠাদেরকে এদেশ হতে বিতাড়িত করেন। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই এপ্রিল ৮৬ বৎসর বয়সে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। আলীবর্দী ইংরেজ ও ফরাসী দিগকে পর্যায়ক্রমে কলিকাতা ও চন্দ্রনগরে দুর্গ নির্মাণ করতে অনুমতি দেন নি[২৯]।

তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পৌত্র সিরাজ-উদ-দৌলা যখন বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নওয়াব হন, তখন এই দুর্গ নির্মাণকে কেন্দ্র করে নওয়াব ও ইংরেজদের মধ্যে যুদ্ধ বাধে। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ২৩শে জুন পলাশী সংগ্রামে তিনি ইংরেজদের হাতে পরাজয় বরণ করেন। বস্তুতপক্ষে পলাশী সংগ্রামের দুটো তাৎপর্য আছে। (ক) প্রত্যক্ষ বা দেশীয় ও (খ) পরোক্ষ বা আন্তর্জাতিক। প্রত্যক্ষ তাৎপর্যের ব্যাখ্যায় পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজগণের হাতে দুটো জিনিষ চলে যায়: (ক) অর্থনৈতিক শক্তি ও (খ) সামরিক প্রভুত্ব। পরোক্ষ বা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া হল দুটো। (১) বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার উপর ইংরেজ প্রভুত্বকে কেন্দ্র করে পর্যায়ক্রমে ইংরেজরা সমগ্র ভারত উপমহাদেশের উপর সার্বভৌমত্ব বিস্তার করল। (২) ভারতবর্ষ বা নব্য ইংলন্ডকে হাতে রাখতে গিয়ে গ্রেট ব্রিটেন আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ল।

পলাশীর আম্রকাননে ইংরেজদের জয়লাভ এদেশে ইংরেজ প্রভুত্ব পত্তনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়েছিল বটে, কিন্তু কতিপয় কারণে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সেই ভিত্তি ছিল দুর্বল, কেননা পলাশীর যুদ্ধে বিশ্বাস ঘাতকতারই জয় সূচিত হয়েছিল। ডঃ আর. সি. মজুমদার ও অন্যান্য ঐতিহাসিকদের মতে ইংরেজদের সামরিক শক্তিস্বাতন্ত্র্যবুদ্ধীন শ্রেষ্ঠত্বের চেয়ে অধিকতর পর্যায়ে বিশ্বাস ঘাতকতার দ্বারাই পলাশীর যুদ্ধের ফলাফল নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল এবং বাংলাদেশে ইংরেজদের অধিকার কেবলমাত্র ঐ যুদ্ধের উপরই অবস্থান করত। কোন রকম ন্যায় সঙ্গত যুদ্ধ ব্যতিরেকে বাংলাদেশে তাদের বিজয় যুক্তি সঙ্গত ভাবে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের মধ্যেই নিহিত ছিল। কাজেই এর আইনগত ও নৈতিক ভিত্তি ছিল অকিঞ্চিৎকর।

Dhaka University Institutional Repository

পলাশীর যুদ্ধে আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত বিশ্বাস ঘাতকতা সিরাজ-উদ-দৌলাকে পরাভূত করছিল। বাংলার নওয়াব কিন্তু ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বক্সারের যুদ্ধে/মীর কাশিম, দিল্লীর মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ-আলম এবং অযোধ্যার নওয়াব সুজা-উদ-দৌলার পরাজয়কে সেই সূত্রে ব্যাখ্যা করা চলেনা। মীরজাফর ইংরেজদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন নওয়াব সিরাজউদ-দৌলাকে উৎখাত করার উদ্দেশ্যে। আর মীর কাশিম যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন ইংরেজদের প্রভাব হতে মুক্তি পাওয়ার জন্য অর্থাৎ ইংরেজ প্রভুত্ব বন্যাৎ করার জন্য। কাজেই ইংরেজদের সাথে মীর কাশিমের যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সাথে দেশীয় রাজার পূর্ব পরিকল্পিত সরাসরি যুদ্ধ; প্রভুত্ব স্থাপনের উদ্দেশ্যে দুই প্রতিদ্বন্দ্বি শক্তির মধ্যে সংগ্রাম। আর এই দুইটি শক্তি বোধ হয় সম্যকভাবে অবহিত ছিল যে যুদ্ধে জয় ও পরাজয়ের উপর স্বাধীনতার মুক্তি এবং পরাধীনতার গ্লানি এবং সাম্রাজ্য চ্যুতি ও রাষ্ট্র প্রাপ্তির প্রশ্ন ছিল একান্ত ভাবেই জড়িত।

পলাশী ও বক্সারে নওয়াবদের এই চরম পরাজয় ঢাকা তথা জাহাঙ্গীর নগরেরও বিপর্যয় সূচিত করছিল। মুর্শিদাবাদে বাংলার রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ার ফলে ঢাকা নায়েবে নাজিমের কেন্দ্রস্থল হিসেবেই থেকে গিয়েছিল। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই অবস্থা বিদ্যমান থাকে। এই সময় সর্বশেষ নায়েব নাজিম মৃত্যু বরণ করলে এই পরিবারটির শাখা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজরা বাংলায় দেওয়ানী লাভ করে[১০]। এই বৎসরই লেফটেন্যান্ট সুইন্টেনটন ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষ হতে ঢাকায় এসে নওয়াব নাজিম জসোরত খান এর নিকট হতে দেওয়ানীর কর্তৃত্ব ভার গ্রহণ করেন। সুইটন প্রাচীন দুর্গে (বর্তমান জেলখানা) তাঁর সদর দফতর স্থাপন করেন। নায়েব নাজিম বাসস্থান পরিবর্তন করেন ঝড় কাটরাতে। তাঁর জন্য নিমতলী কুঠি নির্মিত হলে তিনি তথায় তাঁর সদর দফতর প্রতিষ্ঠা করেন[১১]। ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দ হতে নায়েব নাজিম ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কাউন্সিলের একজন সদস্যের সাথে নায়েব নিযামতের শাসনতান্ত্রিক কার্যাবলী সম্পাদন করতে থাকেন। এই ব্যবস্থা তাঁর উত্তরাধিকারী হাসমত জং এবং নসরত জং এর সময়ও চলতে থাকে। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে নসরত জং এর মৃত্যুর পর ইংরেজরা শাসনভার এর দায়িত্ব গ্রহণ

Dhaka University Institutional Repository

করে, আর নসরত জং এর উত্তরাধীকারী শামস-উদ-দৌলা, কমরুদ-দৌলা এবং গাজী-উদ্দিন হায়দার নামে মাত্র নায়েব নাজিমের পদ অলংকৃত করতে থাকেন এবং ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর নিকট হতে মাসিক ৬০০০/- টাকা পেনশন পেতে থাকেন ।

বস্তিদেবে ঢাকা শহরের বিকাশ ধারায় মূলতঃ দুটি পর্ব লক্ষ্য করা যায় । (ক) সুলতানী আমল ও (খ) মুঘল আমল । শেষোক্ত আমলটি কতিপয় পর্বে বিভক্ত । আকবরী আমল অর্থাৎ মুঘলদের বাংলা বিজয়ের প্রাথমিক যুগ । বাংলার তথাকথিত বার ভূঁই-ঞারা / সম্রাট আকবর ও সম্রাট জাহাঙ্গীরের সাথে প্রায় ৪০ বৎসর অবিরাম সংগ্রাম পরিচালনা করেছিলেন । বাংলাদেশে মুঘলদের বিরুদ্ধে তাঁদের সংগ্রাম, রাজপুতনায় মুঘলদের বিরুদ্ধে রানা প্রতাপ সিংহ এর সংগ্রাম এবং দাক্ষিণাত্যে মুঘলদের বিরুদ্ধে মারাঠা বীর ছত্রপতি শিবাজীর সংগ্রামকেই স্মরণ করিয়ে দেয় । কিন্তু বাংলার বার ভূঁইঞাদের দুর্ভাগ্য এই যে মুঘলদের বাংলা বিজয়ের দ্বিতীয় পর্বে সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে শায়েখ আলা-উদ্দীন ইসলাম খান সু-পরিকল্পিত যুদ্ধনীতি অনুসরণ করে তাঁদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয় লাভ করেন । এই বিজয়ের স্রোতধারা আমির উল-উমরা নওয়াব শায়েস্তা খানের আমলে মধ্যাহ্ন গগনে পৌঁছে । দেশটি শান্তি শৃংখলায় ষোলকলায় পূর্ণ হয়ে উঠে । স্থাপত্য সংস্কৃতিতে দেশটিতে শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয় । নওয়াব মুর্শিদকুলী খান ও নওয়াব আলীবর্দী খানের শাসনামলে এই উন্নতির ধারা অনেকটা অব্যাহত থাকে । ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে তার সমাপ্তি ঘটে ।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১. The History of Bengal, Volume, 11, Muslim Period (1200-1757) Edited by Sir Jadunath Sarkar, Published by the University of Dacca, 1948) Muslim Conquest of Bengal by Dr. Kalika Ranjan Qanungo, p. 14.

২. The History of Bengal, Volume 11, op.cit., p. 59.

৩. The History of Bengal, Volume 11, op.cit., p. 91.

৪. The History of Bengal, Volume 11, First Mughal Conquest of Bengal by Sir Jadunath Sarkar, p. 194.

৫. Syed Muhammed Taifoor, Glimpses of Old Dhaka, A Short Historical Narration of East Bengal and Assam with Special Treatment of Dhaka, The Pioneer Printing Press Ltd. 1956), p. 76.

৬. The Dacca Review, Vol. 4. Nos. 5 & 6 August & Sept. 1914, Old Dacca By Sayed K.B. Aulad Hasan, p. 147.

৭. Syed Muhammed Taifoor, op.cit., p. 88.

৮. The History of Bengal, Volume 11, State of Bengal under Jahangir by Dr. Sudhindra Nath Bhattacharya,p. 236.

৯. The History of Bengal, Volume II, Twenty years of Stagnation and Reverse (1613-1633) by Dr. Sudhindra Nath Bhattacharya p. 310.

১০. The History of Bengal, Vol. II, Bengal Under Shah Jahan by Sir Jadu Nath Sarkar, p. 330.

১১. Syed Muhammed Taifoor, op.cit., p. 114.

১২. Ibid, p. 122.

১৩. The History of Bengal Volume II, Mir Jumla in Bengal 1659-1663. by Dr. Jagadish Narayan Sarkar, p. 342.

১৪. Charles Stuwart, History of Bengal, Bangabasi Press Caloutta, 1903, p. 223.

১৫. The History of Bengal, Vol-II, Mir Jumla in Bengal 1659-1663 by Sir Jadu Nath Sarkar, p. 347.

Dhaka University Institutional Repository

১৬. The Dacca Review, op.cit,, p. 150.

১৭. The History of Bengal, Volume II, Bengal Under Shaista Khan and Ibrahim Khan by Sir Jadu Nath Sarkar, p. 379.

১৮. Ibid, p. 384.

১৯. Ibid, p. 392.

২০. Dr. Ahmad Hasan Dani, Dacca A Record of Its Changing Fortunes, The Saogat Press, 1956, p. 44.

২১. The Dacca Review, Volume VIII, 1918-1919, p. 1.

২২. Syed Muhammed Taifoor, op.cit., p. 176.

২৩. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ষষ্ঠম সংখ্যা, ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দ 'কারতালাব খান মসজিদ' মোহাম্মদ শামসুল হক, পৃ. ১৪৫।

২৪. Dr. Ahmad Hasan Dani, op.cit., p. 45.

২৫. The Dacca Review, Volume 4, p. 153.

২৬. Munshi Rahman Ali, Tawarikh-i-Dhaka, 1910, p. 28.
James Taylor, Topography & Statistics of Dacca,(Calcutta, 1940), p. 80.

২৭. The History of Bengal, Volume II, Bengal Under Murshid Quli Khan by Sir Jadu Nath Sarkar, p. 396.

২৮. Syed Muhammed Taifoor, op.cit.,p. 201.

২৯. The History of Bengal, Volume II, Alivardi Khan, by Dr.Kali-kinkar Datta, p. 452.

৩০. K.B. Sayed Aulad Hasan, Notes On The Autiquities of Dacca, 1904, p. 3.

৩১. Dr. Ahmad Hasan Dani, op.cit., p. 53.

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকার মুঘল স্থাপত্যের উৎপত্তি ও বিকাশ

কোন দেশের স্থাপত্য শিল্প ও ললিত কলার উৎপত্তি নির্ণয় করতে বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। বস্তুত পক্ষে এ সম্পর্কে চূড়ান্ত কথা বলার সুযোগ কোন সময়ই ঘটেনা। এর অবশ্য কারণ রয়েছে, সংস্কৃতি ও সভ্যতা নদী স্রোতের মত। নদী স্রোত যেমন নিরন্তর গতিতে প্রবাহিত হয়ে থাকে, ঠিক তেমনি সংস্কৃতি ও সভ্যতা নিরবচ্ছিন্ন গতিতে বিকশিত হতে থাকে। দুই স্রোতের মধ্যে পুরাপুরি পার্থক্য নিরূপন করা কোন সময়ই সম্ভব হয় না, কেননা একটি আরেকটির অনুগামীমাত্র। এ সম্পর্কে আরেকটি কথা বিবেচ্য, কোন দেশের স্থাপত্য মূলতঃ সেই দেশের আবহাওয়া, মৃত্তিকা, ভূগোল, পারিপার্শ্বিকতা, সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি ও স্বদেশজাত সৈল্পিক ঐতিহ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এ গুলোর প্রভাবকে কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না। এ সব দিক বিবেচনা না করেই প্রখ্যাতনামা স্থাপত্য বিশারদরা বাংলাদেশ তথা ঢাকার স্থাপত্যকে মুঘল স্থাপত্যের অন্যতম আধারূপে চিহ্নিত করেছেন। এ সব স্থাপত্য বিশারদদের মধ্যে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রেখেছেন ডঃ আহাম্মদ হাসান দানী।

যে সব অবকাঠামো, শিল্পরীতি ও কলা কৌশল মুঘল স্থাপত্য হতে বাংলাদেশী স্থাপত্যে অনুসরণ করা হয়েছিল তিনি তাদের একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা দিয়েছেন। তাঁর তালিকাটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, (১) মুঘল ইমারত অত্যন্তুন্নীন ক্ষেত্রে একটি আয়তাকার কক্ষ। (২) এগুলোর দেয়াল সাধারণতঃ পলেস্তরা করা। দেয়ালের মাঝে মাঝে খিলান বিশিষ্ট প্যানেল রয়েছে। (৩) ইমারতের কার্নিশ ও প্যানেল দ্বারা অলংকৃত। (৪) মুঘল ইমারতের কার্নিশগুলি তিনটি খিলান দ্বারা বিদীর্ণ করা হয়েছে। কেন্দ্রের খিলান পথটি অন্য দু' পার্শ্বস্থ খিলান পথদ্বয় হতে আকারে বৃহত্তর। (৫) খিলান সমূহ সচরাচর অর্ধ গম্বুজের নীচ হতে উন্মোচিত হয়েছে। (৬) কার্নিশটির ত্রি খিলান পথ এবং অত্যন্তুন্নীন তিনটি কক্ষকে অনুসরণ করে মুঘল আমলের মসজিদগুলোর ছাদ তিনটি গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত হয়েছে। ইমারতের কার্নিশের কেন্দ্রীয় খিলান যেমন আকারে বৃহত্তম ঠিক তেমনি এর তিনটি গম্বুজের মধ্যে কেন্দ্রীয় গম্বুজটি আকারে বৃহত্তম। (৭) আড়াঁ আড়িভাবে তৈরী ভল্ট এর

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিটি বৃত্তাংশ ঈষৎ বাঁকানো।(৮) মুঘল স্থাপত্যে গম্বুজ ড্রাম দ্বারা বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত। ফলে গম্বুজগুলি নিম্নস্থ ইমারতের সাথে একাত্ম হয়ে একটি মানানসই উচ্চতা প্রাপ্ত হয়েছে। (৯) মসজিদের প্যারাপেট সোজা ও অনুভূমিক। প্যারাপেটের উপর পলেস্তরা করা অন্ধ মার্লন রয়েছে। (১০) অনেক ক্ষেত্রে এই ইমারত সমূহে চূড়া মিনার সংযোজন করা হয়েছে যা মুঘল স্থাপত্যের ছাদের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। (১১) মুঘল মসজিদের চার কোনায় নির্মিত হয়েছে চারটি মিনার। এদের শীর্ষস্থান পলেস্তরা করা কিয়স্ক দ্বারা বিমণ্ডিত (১২)। মুঘল স্থাপত্য হাইপোস্টাইল নয় বলে এখান হতে স্তম্ভ বা পিলপা পুরাপুরি বাদ পড়েছে। (১৩) চারি কেন্দ্রীক ছুঁচালো খিলান মুঘল স্থাপত্য কর্মের একটি অভিনব বৈশিষ্ট্য।[১]

বস্তুত পক্ষে মুঘল ঢাকাতে প্রধানতঃ দুই প্রকার ইমারত গড়ে উঠেছে। প্রথমটি হল বর্গাকার ইমারত এবং দ্বিতীয় প্রকার হল আয়তাকার ইমারত। বর্গাকার ইমারতের মধ্যে রয়েছে আল্লাহ করিমের মসজিদ,[২] গৌর-ই-শহীদ মসজিদ, আলমগঞ্জ রোড মসজিদ, বড় কাটরা মসজিদ, ও ছোট কাটরা মসজিদ।[৩] তবে এখানে আয়তাকার মসজিদের সংখ্যাই অধিক। দুকাঁনু রূপ ইসলাম-খান-কি মসজিদ, চুড়ি হাট্টা মসজিদ, চক শাহী মসজিদ, বড় ভাট মসজিদ, লালবাগ ফররুখ শিয়ারের মসজিদ, খাজে দেওয়ান শাহী মসজিদ, আতিশ খানা মসজিদ, লালবাগ কিল্লাহ মসজিদ, মরিয়ম সালেহার ও আমীর উদ্দীনের মসজিদ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কাজেই মুঘল মসজিদের প্রায় সবগুলি মসজিদই অভ্যন্তরীন ক্ষেত্রে একটি আয়তাকার কক্ষ, এই মতবাদটি সর্বাংশে সত্য নহে। আর আয়তাকার কক্ষ বিশিষ্ট মসজিদই যে ঢাকায় মুঘল স্থাপত্যের একটি অভিনব বৈশিষ্ট্য এরূপ মনে করার কোন সঙ্গত কারণ নেই। ইসলামের বৃহত্তম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সভাস্থল হল মসজিদ।এটা প্রার্থনার নিমিত্ত একটি ধর্ম সভাস্থল, যেখানে মোমেনরা নির্দিষ্ট সময়ে জমায়েত হয়ে থাকে। এইরূপ মসজিদ হল যথেষ্ট বৃহৎ এবং প্রশস্ত, যাতে করে এতে মোমেনদের গোটা সম্প্রদায়ের স্থান সংকুলান হয়।[৪] এই জন্যই মুসলমান মসজিদ সমূহ হবে একটি সুবৃহৎ আয়তাকার প্রার্থনাগার। মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য দেশের মসজিদের মত বাংলাদেশেও এর ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়নি। অন্যান্য ধর্ম যেমন হিন্দু[৫] ও বৌদ্ধ ধর্মের মন্দিরের অনেক গুলোই আয়তাকার

Dhaka University Institutional Repository

মুঘল মসজিদে পলেস্তরা প্রয়োগের পদ্ধতিটি ঢাকার স্থাপত্য শিল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য । কায়তালাব খান মসজিদ, হাজী খাজা শাহবাজের মসজিদ, আতিশ খানা মসজিদ, লালবাগ কিল্লার মসজিদ, ইত্যাদি সবগুলি মসজিদেই এই উপাদানটি প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছে । বাংলাদেশের প্রাচীন/হিন্দু স্থাপত্য সম্বন্ধে আমাদের ধারণা সীমাবদ্ধ । তাই সেখানে পলেস্তরা প্রয়োগের পদ্ধতিটি চালু ছিল কিনা সে সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণা নেই । তবে প্রাক-মুঘল যুগের বাংলা স্থাপত্যে পলেস্তরা প্রয়োগের পদ্ধতিটি বহু ইমারতেই অনুসৃত হয়েছে । চীনা পরিব্রাজক ফা হিয়েনের বিবরণীতে যে প্রাসাদটির বর্ণনা রয়েছে তা পলেস্তরা দ্বারা মণ্ডিত করা । হুগলী জেলার শ্রী রামপুরে রয়েছে মোল্লা সিমলা মসজিদ, এখানেও পলেস্তরা লক্ষ্য করা যাচ্ছে ।[৬] কিন্তু পলেস্তরা করার পদ্ধতিটি সবচেয়ে উৎকর্ষ লাভ করেছে খুলনা জেলার বাগের হাটে খান-ই-জাহান আলীর সমাধি সৌধে । এখানকার ধ্বংসাবশেষ দেখে বুঝা যায় যে, কারিগরেরা পলেস্তরা প্রয়োগ পদ্ধতিটি সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে ওয়াকেবহাল ছিলেন ।[৭]

মুঘল আমলের মসজিদ সমূহের কার্নিশ তিনটি খিলান দ্বারা নির্মিত হয়েছে । এদের মধ্যে কেন্দ্রীয় 'নেত' এর সামনে নির্মিত খিলানটি পার্শ্ববর্তী 'বে' দুটোর সামনে উপস্থাপিত খিলানের চেয়ে আকারে বৃহত্তর । বস্তুতপক্ষে রোমানরা তাদের রাজপথে এরূপ ত্রয়ী খিলান বিশিষ্ট বিজয় তোরণ নির্মান করত বলে জানা যায় । মেসোপটেমীয় পারসিক প্রাসাদেরও ইহা ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ।[৮] অষ্টম শতাব্দীর শেষার্ধে উখাইদির প্রাসাদের বায়ুত সমূহে এবং নবম শতাব্দীতে সামাররার ঘাউসাক-উল-খাকানীর বাব-উল-আম্মাতে এই বৈশিষ্ট্যটি লক্ষ্য করা যায় । ত্রয়ী খিলান বিশিষ্ট কার্নিশ ভারতীয় স্থাপত্য শিল্পে ও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে । দিল্লীর হযরত নিজামউদ্দিন আওলিয়ার মাজারে নির্মিত জামাত খানা মসজিদ,[৯] গুজরাটের আহমদাবাদের রাজপ্রাসাদের বিজয় তোরণ বা তিন দরওয়াজা,[১০] এবং আহমদাবাদের মুহাফিজ খানের মসজিদ[১১] এবং শহর তলীর সুলতান পুরে বিবি আকুত

Dhaka University Institutional Repository

কুফির রওজা বা মসজিদে[১২] এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় । বাংলা স্থাপত্য ত্রয়ী খিলান বিশিষ্ট ফাসাদ দ্বারা বৈশিষ্ট্য মন্ডিত হয়ে রয়েছে । উল্লেখযোগ্য ধুনিচক মসজিদ, লোটন মসজিদ,[১৩] কদম রসুল শরীফে[১৪] ত্রয়ী খিলান রয়েছে । প্রাক মুঘল বাংলাদেশের স্থাপত্যে এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে ঢাকার বিক্রমপুরের অন্তর্গত বাবা আদমের মসজিদে[১৫] (১৪৮৩ খ্রীঃ) বাখরগঞ্জের কসবা মসজিদে বরিশালের মসজিদ বাড়ী মসজিদে (১৪৬৫ খ্রীঃ) ও সিলেটের শংকর পাশা মসজিদে (পঞ্চদশ শতাব্দী) । ঢাকার স্থাপত্যে এই আদর্শে নির্মিত হয়েছে চক বাজার শাহী মসজিদ, বাখী মুসা খান কি মসজিদ, হাজী খাজা শাহবাজের মসজিদ[১৬] ও খান মোহাম্মদ মৃধার মসজিদ ।

প্রাক-মুঘল আমলের মসজিদের ফাসাদের মধ্যবর্তী কেন্দ্রীয় খিলান পথটি মুঘল আমলের মসজিদের ফাসাদের কেন্দ্রীয় খিলানটির মত এত গুরুত্ব পায়নি বলে যে ধারণা রয়েছে তা সমর্থন যোগ্য নয় । বস্তুতপক্ষে উপমহাদেশের সর্ব প্রথম মসজিদ কুয়াতুল ইসলাম[১৭] ও আজমীরের আড়াই দিনকা ঝোপড়া[১৮] মসজিদের ফাসাদে কেন্দ্রীয় খিলান বিশিষ্ট দ্বার পথটি পার্শ্বস্থিত খিলান পথ সমূহের চেয়ে উচ্চতর মর্যাদা পেয়েছে । এছাড়াও রয়েছে দিল্লীর বড় গুমবদ মসজিদ,[১৯] কালিশান লা গুমবদ,[২০] বাবইআলমকা গুমবদ[২১] মসজিদ। এখানেও কেন্দ্রীয় খিলানটি গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয়েছে ।

মুঘল আমলের মসজিদ সমূহের কিবলা কোঠা তিনটি আইল বা তিনটি বে-তে বিভক্ত । এই তিনটি আইল তিনটি গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত । স্থাপত্য বিশারদদের মতে ইহা মুঘল স্থাপত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য । কিন্তু স্মরণ রাখা যেতে পারে যে মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য স্থাপত্যে এ ধরণের তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ দুষ্প্রাপ্য হলেও ভারত বর্ষে এদের উদাহরণ রয়েছে প্রচুর । দিল্লীর নিজামউদ্দিন আওলিয়ার দরগায় নির্মিত জামাত খানা মসজিদ, লোদী আমলের দিল্লীর মথুকি মসজিদ ও বড় গুমবদ মসজিদ,[২২] আহামদাবাদের মির্জাপুরে রানীর মসজিদ, গুজরাটের রানী রুপবতীর মসজিদ, আহমদাবাদের রানী সিপাহীর মসজিদ,[২৩] গুল বর্গার শাহকামাল মুজাররাদ দরগাহ মসজিদ,[২৪] এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । প্রাক মুঘল

Dhaka University Institutional Repository

আমলের তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ বাংলার স্থাপত্যেও বেশ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রয়েছে। গৌড়ে নির্মিত জানজানিয়া বা জাহানিয়ান মসজিদ[২৫] (১৫৩৫ খ্রীঃ), বগুড়ার শেরপুরের খেরুয়া মসজিদ[২৬] (১৫৮২ খ্রীঃ), মুর্শিদাবাদের খেরাজনে নির্মিত মসজিদ, এবং খুলনার মসজিদকুর মসজিদ, রামপালের বাবা আদম শহীদের মসজিদ[২৭] (১৪৮৪ খ্রীঃ), রাজশাহীর কুসুম্বা মসজিদ[২৮] (১৫৫৮ খ্রীঃ) এ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য। তিনটি চমৎকার আকৃতির গম্বুজ বিশিষ্ট বারান্দা দ্বারা ধনিয়া দীঘি বা বিবিকী মসজিদ, লোটন মসজিদ, দিনাজপুর জেলার সুরায় নির্মিত মসজিদ[২৯] এবং টাঙ্গাইলের আটিয়া জামী মসজিদ[৩০] বৈশিষ্ট্য মন্ডিত হয়ে রয়েছে। এই জন্যই সম্ভবত ঢাকায় মুঘল আমলে নির্মিত ইসলাম খান কি মসজিদ, চক মসজিদ, খান মোহাম্মদ মৃধার মসজিদ,[৩১] লালবাগ দুর্গ মসজিদ,[৩২] হাজী খাজা বাহবাজের মসজিদ[৩৩] (১৬৭৯ খ্রীঃ) খাজা আম্বরের মসজিদ[৩৪], নারায়নগঞ্জ বিবি মরিয়মের মসজিদ[৩৫] (সপ্তদশ শতাব্দী), সিলেটের শাহ পরান দরগার মসজিদ[৩৬] (সপ্তদশ শতাব্দী) কে প্রাক মুঘল আমলের ত্রি গম্বুজ মসজিদের উত্তরসূরী হিসেবে গন্য করা যায়।

মুঘল আমলের সবগুলি আয়তাকার ইমারতেই কেন্দ্রীয় 'নেভ' এর উপর নির্মিত গম্বুজ পার্শ্ববর্তী 'বে' এর উপর উপস্থাপিত গম্বুজদ্বয়ের চেয়ে আকারে ও উচ্চতায় বৃহত্তর। কিন্তু এই বৈশিষ্ট্যটি প্রাক-মুঘল মসজিদেও দৃষ্টিগোচর হয়নি এরূপ বলা যুক্তিসঙ্গত নয়, কেননা দিল্লীর মথ-কি-মসজিদ[৩৭] এবং তথাকার বড় গুমবদ মসজিদের[৩৮] কেন্দ্রীয় গম্বুজ পার্শ্ববর্তী গম্বুজ দুয়ের চেয়ে আকারে ও উচ্চতায় বৃহত্তর।

মুঘল আমলের মসজিদের কার্নিসের মধ্যস্থল উদ্‌গত করে নির্মান করা হয়েছে। এই উদ্‌গত অংশে কেন্দ্রীয় খিলান পথের ব্যবস্থা রয়েছে। অধিকন্তু কার্নিসকে উদগত করে কেন্দ্রীয় তোরণ পথের গুরুত্ব বৃদ্ধি করা হয়েছে। বাংলার মুঘল স্থাপত্যে এদেরকে মৌলিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে গন্যকরা হয়। আসলে ভারতবর্ষ ও প্রাক-মুঘল বাংলায় এ ধরণের স্থাপত্যিক গুনগনার দৃষ্টান্ত রয়েছে যথেষ্ট। দিল্লীর সুলতান-ই-আযম শামস-উদ-দীন ইলতুৎমিস ১২৩১ খ্রীঃ তাঁর পুত্র নাসির উদ-দীন মাহমুদের উদ্দেশ্যে "সুলতান ঘারী" বা গুহার সুলতান[৩৯] নামে একটি সমাধি সৌধ নির্মান করেন। এই সমাধি সৌধটি উদ্‌গত প্রবেশ পথ দ্বারা

Dhaka University Institutional Repository

বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে রয়েছে। দিল্লীর সুলতান-উল-আওলিয়া নিযাম উদ-দীন এর দরগাতে নির্মিত হয়েছে জামায়াত খানা মসজিদ,[৪০] শাহজানাবাদে রয়েছে কালান মসজিদ,[৪১] এ সকল মসজিদের কাসাদের মধ্যবর্তী স্থানে নির্মিত প্রো-পাইলন যুক্ত খিলান এবং বাট্রেস সদৃশ উদ্‌গত অংশ এ সব ইমারতের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। জৌনপুরে নির্মিত আটালা মসজিদ,[৪২] জামী মসজিদ, ও লাল্ভোরী মসজিদে প্রো-পাইলন চূড়ান্ত বিন্দুতে উপনীত হয়েছে।

অধুনা খনন কার্যের ~~স্থল~~ ফলে আবিস্কৃত হয়েছে গৌড়ের দরস বাড়ী মাদ্রাসা। এখানে দেখা যাচ্ছে মাদ্রাসার তিনটি তোরণ পথ যা ইমারতের সীমা রেখার বাইরে উভয় দিকে বর্ধিত হয়েছিল। যশোহরের শৈলকূপা শাহী মসজিদের[৪৩] পূর্ব ও পশ্চিম পার্শ্বটি বাক্সের আকারে[৪৪] বহিঃদিকে উদ্‌গত হয়ে রয়েছে। গৌড়ের প্রাসাদ দুর্গের দাখিল দরওয়াজা[৪৫] ও গোমতি তোরণ পথে উদ্‌গত সম্মুখ ভাগ রয়েছে।[৪৬] ঢাকার স্থাপত্যে এই বৈশিষ্ট্যটি অনুসৃত হয়েছে সাত গম্বুজ, খান মোহাম্মদ মৃধা, করতালাব খান প্রভৃতি মসজিদে।

মুঘল আমলের মসজিদ গুলোতে আড়াআড়িভাবে তৈরী তক্ত এর উপর ছাদ অবস্থান করছে। তক্ত এর প্রতিটি বৃত্তাংশ ঈষৎ বাঁকানো। এই বৈশিষ্ট্যটিও দিল্লী ও অন্যান্য স্থানের স্থাপত্যে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখযোগ্য বেগমপুরী মসজিদ,[৪৭] কালান মসজিদ,[৪৮] এবং খান্দুর খিরোলা মহল,[৪৯]। মুঘল স্থাপত্যের গম্বুজ ড্রাম দ্বারা বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত। কিন্তু এই বৈশিষ্ট্য যথার্থভাবে নুতন নয়। সুদূর জেরুজালেমের কুব্বাতুল সাখরা[৫০] এবং দামাসকাসের মসজিদ-ই-জামীর গম্বুজ উচুঁ পিপার উপর নির্মিত হয়েছে।[৫১] পারসিক স্থাপত্যে এই বৈশিষ্ট্যটি সার্বজনীন আকার প্রাপ্ত হয়েছে। বুখারার ইসমাইল সামানীর সমাধি সৌধ[৫২], ইয়াজদ্‌ এর মসজিদ, ওয়াকও-উ-সায়াত এবং সমরকন্দের গুর-ই-মির[৫৩] উচুঁ পিপার উপর নির্মিত হয়েছে। বাংলার স্থাপত্যেও ইহা লক্ষ্য করা যাচ্ছে লোটন মসজিদে[৫৪], এবং কদম রসুল শরীফে।

মুঘল মসজিদের প্যারাপেট সোঁজা ও অনুভূমিক। এর উপরে পলেস্তরা করা অন্ধ মার্লন রয়েছে। প্যারাপেটের মাঝে মধ্যে চূড়া মিনার সংযোজন করা হয়েছে। বস্তুত

Dhaka University Institutional Repository

পক্ষে এই বৈশিষ্ট্য গুলি তুঘলক, সৈয়দ ও লোদী বংশীয় স্থাপত্যেরই যথার্থ উত্তরাধিকার। কোটলা মোবারকপুরে ছোট খান কি গুমবদ এর প্যারাপেট সমূহ সোজা ও অনুভূমিক[৫৬]। এগুলো অন্ধ মার্লন দ্বারা অলংকৃত হয়েছে। প্যারাপেটের মাঝে রয়েছে চূড়া মিনার। দিল্লীর বড় খানকা গুমবদ[৫৭] এ এরূপ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়েছে। মুঘল মসজিদগুলো চার কোনায় চারটি মিনার দ্বারা বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। মিনারের শীর্ষদেশ গলেসুরা করা কিয়স্ক দ্বারা পরিশোভিত। বস্তুতপক্ষে, বাংলাদেশীয় স্থাপত্য শিল্পে অলংকারিক মিনারেট বা বুরুজ ইসলামিক স্থাপত্য শিল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার, কেননা এদেশের মধ্যযুগীয় স্থাপত্যে ইহা একটি কমনীয় বৈশিষ্ট্য হিসেবে পরিগনিত হয়েছে, তবে প্রাক-মুঘল যুগে ভারতীয় স্থাপত্যে এই বৈশিষ্ট্যটি নুতন নহে। ডঃ আর, নাথের মতে "দিল্লীর মথকি মসজিদ, ও কিলায়ে কোহনা[৫৯] মসজিদে এর সাফল্যজনক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।" অধিকতর কমনীয় পর্যায়ে এর আবির্ভাব ঘটেছে গুজরাটের আহমদাবাদের মসজিদ সমূহে।

মুঘল মসজিদের অভ্যন্তরে স্তম্ভের অনুপস্থিতি এর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। বস্তুত পক্ষে প্রাক-মুঘল আমলে তিন প্রকার ইমারত বাংলাদেশী স্থাপত্যে স্থান করে নেয়। (ক) এক গম্বুজ সম্বলিত বর্গাকার ইমারত। (খ) একটি কেন্দ্রীয় হল ঘর ও পার্শ্বকক্ষ বিশিষ্ট আয়তাকার ইমারত এবং (গ) তিনটি বে সহ প্রায় বর্গাকার ইমারত। এই তিন ধরণের ইমারতেই স্তম্ভের অনুপস্থিতি[৬০] লক্ষ্য করা যায়। এই শ্রেণীর ইমারতের দৃষ্টান্তের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল হযরত পাণ্ডুয়ার একলাখী সমাধি সৌধ, গৌড়ের লোটন মসজিদ, চিকা মসজিদ এবং ছোট পান্ডুয়ার ক্ষুদ্রতম মসজিদ।[৬১] কাজেই বাংলাদেশে মুঘল স্থাপত্যের আবির্ভাবের বহু পূর্বেই এখানকার মসজিদগুলাতে স্তম্ভ শূন্য অভ্যন্তর লক্ষ্য করা গিয়েছিল।

বাংলাদেশে মুঘল স্থাপত্যের দুটো বৈশিষ্ট্য হলো (১) প্লাষ্টার প্রলেপিত ছত্রী দ্বারা শীর্ষাচ্ছাদিত কৌনিক মিনার এবং (২) মার্লন দ্বারা অলংকৃত অনুভূমিক প্যারাপেট। বস্তুত পক্ষে ইমারতের চারটি কোনায় চারটি মিনারের উপরে প্লাষ্টার প্রলেপিত ছত্রী তুঘলক, সৈয়দ ও লোদী স্থাপত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এসব ইমারতের সমগোত্রীয় ইমারত রয়েছে, দিল্লীর লোদী গার্ডেনের শিশ গুমবদে[৬২] এবং বড় খান কি গুমবদে[৬৩] এমনকি বাংলাদেশে

Dhaka University Institutional Repository

এর প্রত্যক্ষ প্রমান রয়েছে গৌড়ের জাহানিয়ান মসজিদে।[৬৪] মার্লন দ্বারা অলংকৃত অনুভূমিক প্যারাপেট লক্ষ্য করা যাচ্ছে দিল্লীর ছোট খান কি গুমবদে [৬৫] এবং লোদী বাগানের বড় গুমবদে[৬৬]। এছাড়াও বাংলাদেশের স্থাপত্যে এর দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যাচ্ছে গৌড়ের দাখিল দরওয়াজায়[৬৭] এবং দরসবাড়ী মাদ্রাসায়।[৬৮]

চেপ্টা খিলান, চাপ্রি/ছুচালো খিলান ও চারি কেন্দ্রিক ~~কেন্দ্রীক~~ কীলটেড খিলান এই সকল উপাদানকে মুঘল বৈশিষ্ট্য রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। মুঘল স্থাপত্যের প্যারাপেটের ফাঁকে ফাঁকে পিনাকলস সংযোজন করা হয়েছে। বলা বাহুল্য তুঘলক, সৈয়দ, লোদী, নুর ও অন্যান্য প্রাদেশিক রাজ বংশের ছত্র ছায়ায় এই সব বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটেছে। প্যারাপেটের ফাঁকে ফাঁকে পিনাকলস এর অবস্থান ছোট খান কি গুমবদ[৬৯] এবং বড় খানকা গুমবদে[৭০] লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আর চারি কেন্দ্রীক ও অন্যান্য খিলানের ব্যবহার অত্যন্ত সু প্রাচীন। সুদূর রাক্কায় বাগদাদ তোরণে[৭১] চারি কেন্দ্রীক খিলানের সার্থক প্রয়োগ রয়েছে ভারতবর্ষের স্থাপত্যে এর দৃষ্টান্ত রয়েছে বিজাপুরের দ্বিতীয় আলী শাহের অসম্পূর্ণ সমাধি সৌধে। এখানে খিলানগুলি অসাধারণভাবে চারি কেন্দ্র হতে তুলে ধরা হয়েছে।[৭২]

মুঘল মসজিদে কিবলা দেয়াল ব্যতীত অন্য দুটো দেয়ালে দরজার ব্যবহার মুঘল স্থাপত্যের একটি বৈশিষ্ট্য বলে ধরে নেয়া হয়েছে। বাংলা স্থাপত্যে পার্শ্বদ্বার বিশিষ্ট অসংখ্য মসজিদের মধ্যে উল্লেখ করা যাচ্ছে হুগলীর ত্রিবেনীর জাফর খান গাজীর মসজিদ, ছোট পান্ডুয়ার কুতুবর মসজিদ, সোনার গাঁয়ের গোয়াল দিহির পুরান মসজিদ, গৌড়ের চামকাটি মসজিদ,[৭৩] ছোট সোনা মসজিদ,[৭৪] রাজশাহীর বাঘা মসজিদ (১৫২৩ খ্রীঃ)[৭৫] বাখরগঞ্জের কসবা মসজিদ, শৈল কুপার শাহী মসজিদ,[৭৬] এবং অষ্টগ্রামের কুতব মসজিদ।[৭৭]

উপরোক্ত আলোচনা হতে বুঝা যায় যে, মুসলিম স্থাপত্যের বিশেষ দুটো রূপ রয়েছে। প্রথমটি ইসলামীও অপরটি স্থানীয়, অথচ ইসলামী স্থাপত্যের এই মূল ধারাকে অস্বীকার করে ডঃ আহম্মদ হাসান দানী মন্তব্য করেছেন "বৃটিশরা যেমন তাদের ব্যক্তিগত পছন্দের কারণে স্থাপত্য শিল্পে তাদের নিজস্ব শিল্পরীতির শ্রেষ্ঠত্বের বিবেচনায় এদেশে প্রাচীনতর

Dhaka University Institutional Repository

স্থাপত্য কাঠামোগুলো বাদ দিয়েছিল, ঠিক তেমনি মুঘলরা তাদের প্রাথমিক সুযোগেই স্থানীয় শিল্পরীতিকে বর্জন করলো এবং রাজকীয় মুঘল শিল্পরীতির অনুসরণে তাদের ইমারত সমূহ গড়ে তুলল।" বস্তুত পক্ষে বাংলাদেশে মুঘল স্থাপত্য, ইসলামী অবয়বে অর্থাৎ বাংলা-দেশের বহিরাগত মুসলিম বিশ্বের প্রায় সকল স্থাপত্য এবং দেশীয় বা স্থানীয় ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্যের মধ্যকার একটি অপরূপ সমন্বয়। এতে তুঘলক, সৈয়দ ও লোদী বংশের স্থাপত্য বিশেষভাবে কাজ করছিল। আর স্থানীয় অবয়বে বাংলাদেশে মুঘল স্থাপত্যের রূপায়ন ও বিকাশে এ দেশীয় স্থাপত্যের অবয়ব, কাঠামো ও কলা কৌশলের পূর্ণ স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল।

বাংলার মুসলমান রাজা বাদশাহদের সক্রিয় তৎপরতা ও পৃষ্টপোষকতায় এবং স্থপতি কারিগর ওস্তাগরদের দক্ষতা ও কর্ম কুশলতায় বাংলার ইসলামী স্থাপত্য স্বকীয় ভাবধারায় গড়ে উঠেছিল। বিষয় বস্তুর বিন্যাস, নির্মান পদ্ধতি ও শিল্প রীতির উৎকর্ষ এই স্থাপত্যের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলেও কয়েকটি কারণে এই স্থাপত্য সমালোচকগণের নিকট যথাযোগ্য মর্যাদা পায়নি। প্রথমতঃ, দিল্লী ও আগ্রার স্থাপত্য শিল্পের উৎকর্ষ ও বিকাশ তখন মধ্যাহ্ন গগনে। স্থাপত্যের মূল উপাদান (১) অবস্থান (২) অবয়ব ও (৩) গাত্রের গঠন কৌশলের অপূর্ব সমন্বয় তখন ভারতের ইসলামী স্থাপত্যকে অনিন্দ সুন্দর স্থাপত্য হিসেবে চিহ্নিত করছিল। এই জন্যই বাংলা স্থাপত্যের স্বকীয়তা ও সৌন্দর্য অনেক স্থপতিবিদের দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছে।

বাংলার ইসলামী স্থাপত্যের নির্মানকার্যে প্রধান উপাদান ছিল ইট। অথচ ডঃ সৈয়দ মাহমুদুল হাসান মন্তব্য করেছেন যে, বাংলার ইট স্থাপত্যের ঐতিহ্য পারস্যের ইট স্থাপত্যের একটি নিছক নিরবচ্ছিন্ন গতিধারা ব্যতীত আর কিছুই নয়। গুজরাট, দাক্ষিণাত্য ও অন্যান্য ইট স্থাপত্যমালার মাধ্যমে এই ধারা বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করেছিল[৭৮] কিন্তু তাঁর এই বর্ণনায় এদেশের প্রকৃতি, ভূগোল ও ভূতত্ত্বের অবমূল্যায়ন করা হয়েছে। বস্তুতপক্ষে বাংলাদেশে ইট স্থাপত্যের উপকরণ হিসাবে আবহমান কাল ধরে ব্যবহৃত হচ্ছিল। বাংলায় সহজলভ্য উপাদান হল অত্যন্ত সূক্ষ্ম আলের কর্দম যুক্ত পলিমাটি যা স্মরণাতীত কাল থেকে গৃহ নির্মান

Dhaka University Institutional Repository

কার্যে ব্যবহৃত হচ্ছিল ।[৭৯] গংগা, পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র ও যমুনা বিধৌত অঞ্চলের অফুরন্ত পলি-মাটির সহজ লভ্যতা এবং এদেশের কাঠ ও প্রস্তরের অপেক্ষাকৃত দুষ্প্রাপ্যতা ইটকে অত্যাবশ্য-কীয় উপাদান করেছে । এই জন্যই ডঃ আহাম্মদ হাসান দানী বাংলার ইসলামী স্থাপত্যকে ইট স্থাপত্য রীতি বলে অভিহিত করেছেন।[৮০] কিন্তু এদেশীয় স্থাপত্যে যে প্রস্তর একেবারেই ব্যবহৃত হয়নি তাও ঠিক নয় । তবে প্রস্তর ছিল অত্যন্ত দুর্লভ । রাজমহল পাহাড় হতে পাওয়া যেত কৃষ্ণ বর্ণ ভারী শিলা । বিহার হতে যে সব বেলে পাথর ও স্ফটিক পাথর পাওয়া যেত তা নিতান্তই ছিল অপ্রতুল ।[৮১] এই জন্য বাংলা স্থাপত্যে প্রস্তর দ্বিতীয় শ্রেণীর নির্মান উপাদান হিসেবে গৃহিত হয়েছিল । বাংলার স্থাপত্যে স্তম্ভ হিসেবে প্রস্তরের ব্যবহার ছিল প্রায় সার্বজনীন । আর এই স্থাপত্যকে বাংলাদেশী জলবায়ু ও আদ্রতা হতে রক্ষা করার জন্য দেয়াল গাত্রে পাথরের পাত ব্যবহার করা হয়েছিল ।[৮২] বাংলাদেশে এ শ্রেণীর উপকরণ স্থান করে নিয়েছিল খিলানের নিম্নস্থ আবরণীতে এবং ভূমির উপরস্থ দেয়াল কাঠামোতে । এ জন্যই সম্ভবতঃ ডঃ আহমদ হাসান দানী বাংলা স্থাপত্যের এই দ্বিতীয় ধারাকে ইট এবং প্রস্তর স্থাপত্যরীতি বলে অভিহিত করেছেন ।[৮৩]

মসজিদ, সমাধিসৌধ, দুর্গ, প্রাসাদ ও কাটরা নির্মানের জন্য মুসলমানরা অনেকগুলো কৌশল নিয়ে এসেছিল । এই জন্যই মুসলমানদের নির্মিত দালান কোঠা ও মসজিদ মাদ্রাসা নির্মানে দেখা যাচ্ছে ছাদ নির্মানে গম্বুজের ব্যবহার, নিম্নগামী ভার ও চাপকে দ্বিধা বিভক্তভাবে বিস্তারের জন্য খিলানের প্রচলন, পাথর ও ইটকে জোড়া দেয়ার জন্য সুড়কীর প্রয়োগ ।[৮৪] এদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল চুন সুড়কীর ব্যবহার, কেননা কংক্রীট, মর্টার, ইত্যাদি সহযোগে প্রস্তুত সিমেন্টের প্রয়োগ ব্যতীত উন্মুক্ত ও প্রশস্ত স্থানকে খিলান, ভল্ট বা গম্বুজের মাধ্যমে জুড়ে দেয়া সম্ভবপর ছিল না । হিন্দুরা আগে চুন সম্বন্ধে সম্ভবত অবগত ছিল । মেঝকে জমাট করার কাজে এই চুন ব্যবহার করা হত । কিন্তু মর্টার হিসেবে লাইম এর ব্যবহার মুসলিম পূর্ব যুগে প্রায় অজ্ঞাত ছিল ।[৮৫] আর হিন্দুরা এই সম্বন্ধে অবগত থাকলেও হিন্দু স্থপতিদের জ্ঞানের ক্ষেত্রে এই বিধি প্রয়োগ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়নি । এর কারণ ছিল হিন্দু যুগে সাধারণতঃ একখানা ইট বা

Dhaka University Institutional Repository

পাথরের উপরে ঠিক সমানুরালভাবে এক খানা ইট বসান হত । কেবল তার সামান্য একটু অংশ সামনের নীচের ইটের চেয়ে একটু বাড়ানো থাকতো । এভাবে দুটি স্তম্ভের উপর দিক হতে ইটের অংশ বাড়তে বাড়তে যখন দু'খানা ইট মধ্যকার ব্যবধান খুব সংকীর্ণ হতো তখন এক খণ্ড বড় ইট এই ব্যবধানের উপর বসিয়ে খিলান তৈরী করা হত [৮৬] । এই পদ্ধতিটি কর্বেল নির্মান পদ্ধতি নামে অভিহিত । ভারতবর্ষে মুসলমানদের সফল অভিযানের পর দিল্লীর কুওয়াত-উল-ইসলাম মসজিদ, শামসউদ্দ-দীন ইলতুৎ মিশের সমাধি ও আজমীরের আড়হাই দিন-কা-ঝোপড়া মসজিদে কর্বেল পদ্ধতিতে নির্মিত খিলান, সর্দল ভিত্তিক নির্মিত দেয়াল এবং এলম পূরণের ভিত্তিতে নির্মিত স্কুইঞ্চ ব্যবহার দেখা যায় । পরে কর্বেল পদ্ধতি পরিত্যক্ত হয় এবং সত্যিকার খিলান গম্বুজ, ভল্ট, নির্মিত হয় । এই জন্য অবশ্য চুন সুড়কীকে মর্টার হিসাবে ব্যবহার করা হয় । [৮৭] মুসলমানরা চুনকে প্লাস্টার হিসেবে ব্যবহার করত বিশেষভাবে । প্যারাপেট, ছাদ ও গম্বুজকে এমন-ভাবে এর দ্বারা সেটে দেয়া হত যে এর মধ্যে পানি প্রবেশ করতে পারত না । সুলতানী আমলে পলেস্তরা মাঝে মধ্যে ব্যবহার হত বটে কিন্তু মুঘল আমলে এর ব্যবহার সার্বজনীন হয় । পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ হতে বাংলা স্থাপত্যে রঙীন উজ্জ্বল টালী ব্যবহার হতে থাকে । মুসলমানরা এদেশের স্থাপত্যে আরো সংযোজন করেন মিনার, স্কুইঞ্চ, পান্দানতিভ, স্ট্যালাক্টাইট হানিকোম্বিং ও শিলালিপি ইত্যাদি । [৮৮]

বাংলার মুসলিম স্থাপত্যের দুটোরূপ রয়েছে একটি ইসলামিক ও অপরটি স্থানীয় । ইসলাম এদেশে এনেছিল প্রকৃত খিলান, গম্বুজ, মিনার ইত্যাদি । কিন্তু সঙ্গত কারণেই এদেশের আবহাওয়া, ভূগোল, ভূতত্ত্ব এবং সুদেশজাত শৈল্পিক ঐতিহ্য দ্বারা বাংলার স্থাপত্য নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল । পশ্চিম এশীয়, প্রাক-মুঘল মুঘল এবং মুঘল পূর্ব বাংলাদেশী স্থাপত্যরীতি ও কারিগরী কৌশল অবলম্বন দেশীয় আবহাওয়া ও জলবায়ুর সাথে সামঞ্জস্য রেখে গড়ে উঠেছিল বাংলার স্থাপত্য । বস্তুতপক্ষে যে সব উপাদান বাংলাদেশের স্থাপত্যের উৎপত্তি ও বিকাশকে নিয়ন্ত্রন করছিল

Dhaka University Institutional Repository

তা বুঝাবার জন্য ডঃ আহমদ হাসান দানী এদেরকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন। (ক) স্থাপত্য অবয়ব (খ) স্থাপত্য পরিকল্পনা এবং (গ) গঠন মূলক বা নির্মানগত উপাদান[৮৯]।

বাংলার কারিগররা জংগলের বাঁশের স্থিতিস্থাপকতার সুযোগ নিয়ে সার্বজনীনভাবে তাদের গ্রাম্য কুঁড়ে ঘরে বঙ্গ ছাদ বা বাঁকানো কার্ণিশ ব্যবহার করত।[৯০] তাই এ দেশের ইসলামী স্থপতিরা কৃষকদের কুঁড়ে ঘরের অনুকরণে এই বঙ্গ রেখা বিশিষ্ট ছাদ ও বাঁকানো কার্ণিশকে তাদের ইট নির্মিত ইমারত ও অট্টালিকা সমূহে অত্যন্ত সাফল্যের সাথে কাজে লাগিয়েছিল। ডঃ আহমদ হাসান দানীর মতে বঙ্গ কার্ণিশ ও বঙ্গ প্যারাপেট জালালউদ্দিন মুহাম্মদ (১৪১৫-১৪৩২) এর সময় হতে বাংলা স্থাপত্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে পরিগনিত হয়।[৯১] David J.McCutchion প্রায় ডঃ আহমদ হাসান দানীর সুরে বলেছেন যে বাংলাদেশে রাজকীয় মুঘল স্থাপত্য রীতিতে বঙ্গ কার্ণিশ ব্যবহার করা হয়নি।[৯২] কিন্তু এই মনুব্য সত্য নয়। গৌড়ে আওরঙ্গজেবের সময়ে নির্মিত সমাধী ঢাকার বেগম বাজারের কারতালাব খান মসজিদ[৯৩] এবং ময়মনসিংহ এর এগার সিন্ধুর মুহম্মদ শাহের মসজিদের দ্বার কটকে[৯৪] ধনুকাকৃতির বঙ্গ ছাইচ এবং ঢাকার শাস্তী খাজা শাহবাজের সমাধি সৌধে[৯৫] অর্ধ চন্দ্রাকৃতির বঙ্গ কার্ণিশ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই বঙ্গছাদ বা বাঙ্গাল দ্বার ছাদ[৯৬] ছাড়াও চার খণ্ড বিশিষ্ট অর্থাৎ চৌচালা কুড়ে ছাদ এবং দু'খণ্ড বিশিষ্ট বা দোচালা কুঁড়ে ছাদ বাংলা স্থাপত্য-রীতির গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

গ্রাম্য বাংলার কুঁড়ে ঘরের আরেকটি উল্লেখযোগ্য উপাদান রয়েছে। আসু বা কেটে টুকরা করা বড়, ঘাস বা বাশের কালী ঘনিষ্টভাবে ভাঁজ করে বা নিবিড়ভাবে বুনে দেয়াল

বা বেড়ার কাঠামো তৈরী করা হয় । এর উপর উল্লম্ব ও অনুভূমিক পর্যায়ে বাঁশের কাঠি বা কাষ্ঠ খন্ড রেখে পিটিয়ে নগুন ও আট সাট করে বেঁধে প্যানেল বা খোব নির্মান করা হয় । কুড়ে ঘরের বেড়া থেকে গৃহীত এই বৈশিষ্ট্যটি বাংলা মসজিদ ও সমাধি স্থাপত্যে প্যানেল অলংকরণে রুপান্তরিত হয়েছিল ।

ছুঁচালো খিলান বাংলা স্থাপত্যের একটি তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য । যেমন ফার্গুসন ছুঁচালো খিলান বিশিষ্ট ইট স্থাপত্য বাঙালীদের নিজস্ব বলে বর্ণনা করেছেন[৯৭] ও ই,বি, হ্যাভেল[৯৮] এই বৈশিষ্ট্যটিকে বাংলা স্থাপত্যে সীমিত রাখতে চান।কিন্তু ছুঁচালো খিলান উৎপত্তিগত ভাবে সাসানীয় পারসিক ।[৯৯] এতদসত্ত্বেও বাংলাদেশের স্থাপত্যে এর স্বকীয় মূল্যবোধ রয়েছে । ডঃ আহমদ হাসান দানীর মতে দুটো পার্শ্ববর্তী বৃত্ত হতে লম্বমান দু' কেন্দ্রীক ছুঁচালো খিলান উৎপত্তিগতভাবে বাঁশের মধ্যে তার প্রাকৃতিক সহযোগীকে খুঁজে পাবে যেখানে দুধার থেকে দুটো বাঁশ দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করলে এইরূপ একটি কাঠামোর সৃষ্টি হয়[১০০] । ভারত বর্ষের মুসলিম স্থাপত্যে ছুঁচালো খিলান প্রথম আত্মপ্রকাশ করে দিল্লীর কুওয়াত-উল-ইসলাম মসজিদে[১০১] এবং আজমীরের আড়হাই দিনকা ঝোপড়া মসজিদে[১০২] কিন্তু এগুলো সরাসরি দু' কেন্দ্রিক নয়[১০৩] । গুনমন্ত মসজিদ ও প্রাচীন মালদহের জামী মসজিদে ব্যারেল ভলটেড ছাদ ব্যবহার করা হয়েছে । ইহা বাংলাদেশের নৌকায় ব্যবহৃত সু পরিচিত ছই এর সাক্ষাৎ অনুকরণ[১০৪] । ইনগ্রেইল্ড খিলানী মোটিফ বাংলাদেশীয় স্থাপত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান । আদীনা মসজিদের মিহরাবে ব্যবহৃত ইনগ্রেলিং হলো এই উপমহাদেশের মুসলিম স্থাপত্যে ব্যবহৃত প্রাচীনতম উদাহরণ[১০৫] । হযরত পাণ্ডুয়ার একলাখী সমাধি সৌধের মানারা সমূহের সার্বিক উচ্চতায় দুটো অনুভূমিক স্ফীত অলংকরণের মধ্যবর্তী স্থান ইনগ্রেইল্ড খিলান বিশিষ্ট কুলঙ্গি দ্বারা অলংকৃত হয়েছে[১০৬] । ঢাকা মহানগরীর অন্তর্গত হাজী খাজা শাহবাজের মসজিদে ইহাকে অত্যন্ত সাফল্যজনকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে[১০৭]

ইসলাম কখনও মসজিদ স্থাপত্যে মানুষ বা প্রাণীর ছবির প্রশ্রয় দেয়নি । এর পরিবর্তে বাংলাদেশীয় স্থপতিরা দেশীয় অভিজ্ঞতাকে পুরাপুরিভাবে কাজে লাগিয়েছে । জড়ানো লতা পাতা, পল্লব গুচ্ছ, কুঁড়ি, পুষ্প, ফুল ফল, এবং এ শ্রেণীর অন্যান্য অলংকরণ এবং পদ্মের মত

Dhaka University Institutional Repository

প্রতীক ধর্মী নক্শা টেরাকোটার মাধ্যমে প্রচুর পরিমানে ব্যবহৃত হয়েছিল। বাংলার মুঘল স্থাপত্যে টেরাকোটা পরিত্যক্ত হয়।

ময়নামতি, পাহাড়পুর ও মহাস্থান হতে খনন কার্যে উদ্ধারকৃত স্থাপত্য এমন একটি নক্শার কথা বলে যাতে বাংলাদেশী স্থাপত্যের কোনগুলো পল, খাজ, কুলঙ্গি, উদ্গত অংশ, শক্তিশালী কোন এবং গভীর স্ফীত অলংকরণ একটি নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই চূড়ান্ত সতর্কতা ও সাবধানতা সহকারে নিরেট ভিত্তি ও বিশালাকার বুরুজের মাধ্যমে অত্যন্ত ভারী স্থাপত্য শিল্প সৃষ্টি করার প্রবনতা লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। এই বৈশিষ্ট্য গুলো সম্ভবতঃ ভৌগলিক অবস্থান ও ভূপ্রকৃতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছিল। এসব উপাদানের মধ্যে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে অত্যন্ত ভারী এবং খাটো মনোলিথিক পিলার। আদীনা মসজিদে খাতকাটা ও পল তোলা এ দু' ধরণের স্তম্ভই রয়েছে।[১১৮]

মুঘল যুগে নির্মিত হাজী খাজা শাহবাজের সমাধি সৌধ, এগার সিন্ধুর শাহ মোহাম্মদের মসজিদ এবং পোড়াই মসজিদের বাহ্যিক দেয়ালে, কোনার মিনার সমূহের আঝাটির নক্শায় অন্ধ কুলঙ্গি এবং ভারী ওজন বিশিষ্ট গম্বুজ এবং বেগম বাজারের কয়তালাব খান মসজিদের মত অন্যান্য ইমারতের পোলক বং গম্বুজ সন্দেহাতীতভাবে স্থানীয় শিল্পরীতির ইংগিত বহন করছে।

ইসলাম পূর্ব যুগের বাংলার ইমারত সমূহে প্লাষ্টার ব্যবহার করা হয়নি। সুলতানী আমলে প্লাষ্টার ব্যবহার কদাচিৎ হয়েছে। কিন্তু মুঘল যুগে প্লাষ্টার প্রচুর পরিমানে ব্যবহৃত হয়েছে। মুঘল যুগের লালবাগ মসজিদ, আল্লা করিম মসজিদ, হাজী খাজা শাহবাজের সমাধি সৌধ, অন্যান্য ইমারতে ব্যবহৃত গুরো অষ্টকোনাকার বুরুজ আমাদেরকে বাংলার কুড়ে ঘরে ব্যবহৃত কোনার গুরো ও শক্তিশালী খুটির কথাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

পরিশেষে, বাংলাদেশের স্থাপত্যে এ গুলো হলো ধনাত্মক উপাদান। এখানকার ঋনাত্মক অতিব্যাপ্তিও এদেশীয় স্থাপত্যকে অন্যান্য দেশীয় স্থাপত্য হতে পৃথক করে তুলেছে। এদেশীয় মসজিদ স্থাপত্যে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত উন্মুক্ত চত্বর, লিওয়ান বা রিওয়াক, উন্মুক্ত অংগনে অজুখানা

Dhaka University Institutional Repository

এবং মসজিদ সংযুক্ত মিনারা সাধারণতঃ পরিলক্ষিত হয়নি। ক্ষেত্র বিশেষে অবশ্য ছাদযুক্ত সাহন লক্ষ্য করা যায়[১০৯]। বাংলাদেশী মসজিদ তাই আঁট সাঁট অট্টালিকা এতে রয়েছে শুধু মাত্র প্রার্থনা কক্ষ, সামনে ঘাসযুক্ত উন্মুক্ত চত্বর এবং এক দিকে একটি সুবৃহৎ পুকুর;[১১০] তবে হযরত পান্ডুয়ার আদীনা মসজিদ এর উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। ঢাকার মুঘল মসজিদ সমূহের পার্শ্বে অবশ্য পুকুর ছিলনা, কিন্তু সামনে কূপের ব্যবস্থা ছিল বলে প্রমান পাওয়া যাচ্ছে। সুলতানী মসজিদ এক এবং বহু গম্বুজ বিশিষ্ট ছিল।[১১১]
ঢাকাতে অবশ্য এক গম্বুজ ও বহু গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদই লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তবে বহু গম্বুজের মধ্যে পাঁচ গম্বুজই সর্বোচ্চ সংখ্যা। ঢাকার বেগম বাজারের[১১২] করতালাব খান মসজিদ ও আরমানিটোলার তারা বা মির্জা গোলাম পীরের মসজিদ পাঁচ গম্বুজ বিশিষ্ট হওয়াতে এরা উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম ধর্মী ইমারত হিসেবে গন্য হয়ে রয়েছে। অন্যান্য মসজিদগুলি সাধারণতঃ এক গম্বুজ এবং বিশেষত তিন গম্বুজ বিশিষ্ট।

সুলতানি স্থাপত্য শিল্পের গৌরব হলো টেরাকোটা অলংকরণ[১১৩]। এই বৈশিষ্ট্যটি ঢাকার মুঘল স্থাপত্যে অনুপস্থিত । । এর স্থান দখল করেছিল প্লাস্টার অলংকরণ। প্লাস্টার অলংকরণ।

ঢাকাতে ইমাম বাড়া নামে এক ধরণের জাকজমকময় ইমারত গড়ে উঠেছিল। এর জনপ্রিয় নাম হল হোসাইনী দালান। স্যার যদু নাথ সরকার,[১১৪] ও হৃদয় নাথ মজুমদার[১১৫] ভুলবশত একে জাঁকালো মসজিদ বলে বর্ণনা করেছেন। আসলে ইমামবাড়া হল শিয়া সম্প্রদায়ের মহরম উৎসব পালনের উদ্দেশ্যে নির্মিত একটি পবিত্র পীঠ স্থান। পরবর্তীকালে মুর্শিদাবাদ ও হুগলীতে ইমাম বাড়া নির্মিত হয়েছিল।

মুঘল আমলে ঢাকাতে বেশ কিছু সংখ্যক সমাধি সৌধ নির্মিত হয়েছিল। এ সকল সমাধি সৌধের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পরী বিবির সমাধি, হাজী খাজা শাহবাজের সমাধি,ও

Dhaka University Institutional Repository

বিবি চাম্পার সমাধি,ওদায়োগা আমীর উদ্দিনের সমাধি । প্রায় সবগুলো সমাধিই একগম্বুজ বিশিষ্ট্য বর্গাকার ইমারত । আভ্যন্তরীন নির্মান পরিকল্পনায় পরি বিবির মাযারটি একটি তাৎপর্যপূর্ণ ব্যতীক্রম[১১৬] । ইমারতটি বিশ্ব বিখ্যাত তাজমহলের নক্শাকে অনুসরণ করে গড়ে উঠেছিল । পরবর্তীকালে সুজাতপুরে (বর্তমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে) শিখ গুরু দুয়ারা নানকশাহীর উপর এর প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে।[১১৭]

বাংলাদেশের স্থাপত্য দুর্গ নির্মান ও নগর পরিকল্পনা বাস্তবায়নে একটি বলিষ্ঠ ভূমিকা নিয়েছে । **গৌড় ও পাণ্ডুয়ায় মুসলিম সুলতানগণ দুর্গ নির্মান করেন । মুঘল আমলে বাংলা-**

দেশে প্রাসাদ দুর্গ ও পানি দুর্গ নির্মানে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয় । এসময় তিনটি নুতন শ্রেণীর দুর্গ নির্মিত হয় । (১) জলমহল: ঢাকার কেন্দ্রের নিকটে বুড়িগংগার যে নালাটি ছিল তাতে একটি ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন ইমারত নির্মান করা হয়েছিল নদীর বন্যার উচ্চতা পরিমাপ করার উদ্দেশ্যে । স্যার যদুনাথ সরকার একে বলেছেন পানি প্রাসাদ[১১৮] । বিশেষ বিশেষ ঋতুতে রাজ্যপাল ও তাঁর পরিবার বর্গের বিশ্রাম ও আনন্দ উপভোগের সুযোগ সৃষ্টি করা ছিল এই পানি প্রাসাদ নির্মানের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য । (২) নদীর সঙ্গম স্থলে নির্মিত হয়েছিল পানি দুর্গ । এ দুর্গগুলি ছিল যথাক্রমে সোনাকান্দা, নারায়নগঞ্জ ও মুন্সীগঞ্জে । নদী পথে শত্রুর অগ্রগতি রোধ করার জন্যই এইসকল পানি দুর্গ নির্মান করা হয়েছিল । (৩) প্রাসাদ দুর্গের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত হল ঢাকার লালবাগের কেল্লাটি । এতে এমন কিছু স্থাপত্য উপাদান রয়েছে যা এ দেশের জল বায়ুতে একান্তই অভিনব আবিষ্কার। বিশেষতঃ এর হাম্মাম খানাকে রোমানদের নির্মিত আবুদা ও তুহায়বার হাম্মাম খানা এবং উমাইয়াদের নির্মিত কুসায়র আমরা হাম্মাম আস-সারাক্সের ধারণা থেকে এসেছে । নির্মাতাদের অসহযোগিতা ও ভাবী বংশধরদের অবহেলা ও অমনোযোগিতায় এর সুষ্ঠু নির্মান কৌশল ও সংরক্ষণ কার্য ব্যহত না হলে হয়ত এর মধ্যে হাম্মাম খানার অত্যাবশ্যকীয় উপাদান শীতল জলের কক্ষ (**Apadyterium**), ঈষদোষ্ণ জলের কক্ষ (**Tepidarium**) এবং উষ্ণ জলের কক্ষ (**Colidarium**) এর সাক্ষাত মিলত ।

Dhaka University Institutional Repository

মুঘল যুগের ঢাকার স্থাপত্যের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কাটরা নামে এক নুতন ধরণের ইমারত । মুঘল আমলে বিশেষতঃ সম্রাট আকবরের শাসনামলে কাটরা নির্মাণের সাক্ষ্য প্রমান রয়েছে । তবে স্থাপত্যে তার ইমারত বিশেষ কোন গুরুত্ব পায়নি । বাংলাদেশী বা ঢাকার স্থাপত্যের একটি তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এই যে এখানে বড় কাটরা ও ছোট কাটরা নামে দুটো বিশালাকায় ইমারত গড়ে উঠেছিল । এগুলো অবশ্য জীর্ণ অবস্থায় টিকে রয়েছে । শাহ সুজার মীর জুমলার আমলে দুশাররাকী ছিলেন মীর মোহাম্মদ মুকীম । নওয়াব শায়েস্তা খানের আমলে ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চক সার্কুলার রোডের দক্ষিণ-পূর্বে একটি বিশাল কাটরা নির্মান করেছিলেন যা মুকীম কাটরা নামে পরিচিত ছিল । কিন্তু বাংলাদেশের বিরূপ আবহাওয়ায় অধুনা এর অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গিয়েছে । পরবর্তীকালে এ ধরণের ইমারত মুর্শিদাবাদে ও তথাকার স্থাপত্যের উপর সীমিত প্রভাব রেখে গিয়েছিল, কেননা [১১২] মুঘল সুবাদার করতালাব খান রাজধানী মুর্শিদাবাদে একটি কাটরা নির্মান করেছিলেন।

ঢাকার মুঘল সুবাদাররা গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সেতু নির্মান করেছিলেন । তাঁতি বাজারের নিকটস্থ সেতু, রাজা মানুষের সেতু, হায়াত বেপারীর সেতু বা নারিন্দা সেতু,[১২৩] কারওয়ান বাজারের নিকটস্থ সেতু, টংগীর সেতু, ও কদমতলী নদীর উপর নির্মিত বিখ্যাত পাগলা সেতু এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১. Dr. Ahmad Hasan Dani, Muslim Architecture in Bengal. (Dacca Paramount Press 1961) pp. 30-33.

২. Dr. Ahmad Hasan Dani, Dacca A Record of Its Changing Fortunes, (Dacca Museum, 1962), pp. 88-89.

৩. কিন্তু মুঘল আমলে বেগম বাজার মসজিদের মত এক আধটা ইমারতের কথা বাদ দিলে প্রায় সবগুলিই তিন গম্বুজ বিশিষ্ট (সচিত্র বাংলাদেশ ১৬-৯-১৯৮৪ইং) পৃ ৪৪) মোঃ আলমগীরের এই বক্তব্য সত্য নহে ।

৪. R.Nath, History of Sultanate Architecture, (Abhinav Publications New Delhi, 1977) pp. 5.6.

৫. Indian Architecture Vol-ii, Styles of Architecture, Edited by M.A. Ananthalwar and Alexander Reo,(Indian Book Gallery, Second Edition, 1980), p. 393.

৬. Monmohan Chakravarti, Pre-Mughal Mosques of Bengal, J.A.S.B. N.S.Vol. Vi(1910), p.33.

৭. Babu Gourdass Bysack, On the Antiquities of Bagerhat, J,A.S.B. Vol. XXXVI, Part I No. 2,(1867),p. 130.

৮. দ্রষ্টব্যঃ K.A.C. Creswell, Early Muslim Architecture, Part Two, (Oxford University Press) p. 233, Fig 181, pl. 51 (a.b.)

৯. Percy Brown, Indian Architecture (Islamic Period) (Bombay B.D. Taraporevala Sons & Co. Pvt. Ltd. 1975),p.19.

১০. K.A.C. Creswell, A short Account of Early Muslim Architecture. (Penguin Books Ltd. 1958), pl. 65.A; Satish Grover, The Architecture of India Islamic , 727-170 AD. Vikas Publishing House Pvt.Ltd,1981, Fig. 4.10.

১১. A.B.M. Husain, The Manara in Indo-Muslim Architecture, (Asiatic Society of Pakistan, Dacca, 1970), Pl. 28.

Dhaka University Institutional Repository

১২. Rustom J Mehta, Masterpieces of Indo-Islamic Architecture, D.B.Tarapore-Vala Sons and Co. Pvt.Ltd. 1976), pl.34.

১৩. Monmohan Chakravarti, op.cit. p.27.

১৪. John Henry Ravenshaw, Gour, Its Ruins and Inscription. (London, Kegan Paul, 1878), pl. 12.
Dr. Ahmad Hasan Dani, Muslim, op cit. plate. XXXI,
Satish Grover, op. cit. Fig. 3.33
সতীশ গ্রোবার (পৃ ৮৩) ও অন্যান্য কতিপয় ঐতিহাসিক কদমরসুল শরীফকে মসজিদ বলে অভিহিত করেছেন। আসলে ইহা মসজিদ নহে ; পবিত্র স্মৃতি চিহ্ন বহনকারী ইমারত।

১৫. আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, বাংলাদেশের প্রত্ন সম্পদ (বাংলাদেশ শিল্প কলা একাডেমী, ১৯৮৪) পৃ. ৪০৬।

Dr. Ahmad Hasan Dani, Muslim, op.cit., Plate. XLII (65)
Enamul Haque, Islamic Art Heritage of Bangladesh.(Bangladesh National Museum-1983),pl.17.

১৬. Muhammad Shamsul Haq, The Mosques and Tomb of Haji Khuja Shahbaz, The Dhaka University Studies Part A Vol. 44 No.1,June 1987 .
pl 1. p.148, আঃ কাঃমোঃ যাকারিয়া, প্রাগুক্ত।
প্লেট নম্বর ৬৫।

১৭. R.Nath, op.cit. Plate. IV.
Percy Brown op.cit. Pl.iii,Fg.1 Satish Grover, op.cit, Fig. 107.

১৮. R.Nath, op cit. plate XIX. Satesh Grover, op.cit.,Fig. 1,11,
Percy Brown, op.cit; Fig. 1,Plate VI

১৯. R. Nath. op.cit. Plate. CXXXVI .

২০. Ibid. pl. LXXVIII (Below) .

২১. Ibid. Pl. LXXXII .

Dhaka University Institutional Repository

২২. R.Nath, op.cit. Pl C XXXVII, Satish Grover op.cit. Fig 6.10, p. 147.

২৩. R.A. Jairazbhoy, An Outline of Islamic Architecture (New Delhi, Asia Publishing House, 1972) pl-154.

২৪. Islamic Heritage of the Deccan, Guest Editor, George Michell Marg publications, 1986, Gulbarga Elizabeth Merklinger, Fig No 16, p.31.

২৫. Dr. Ahmad Hasan Dani, Muslim, op. cit. plate XXX/49.

২৬. Syed Mahmudul Hasan, Ancient Monuments of East Pakistan (The Pakistan Academy Publications 1971), Pl.5 . Enamul Haque, Islamic Art Heritage of Bangladesh, (Bangladesh National Museum, 1983), pl. 28

২৭. Dr. Ahmad Hasan Dani, Dacca A Record, op.cit., Plate XI.

২৮. Dr. Ahmad Hasan Dani, Muslim, op.cit. Plate LI.

২৯. Dr. Mumtazur Rahman Tarafdar, Husain Shahi Bengal, (1494-1538 A.D.) A Socio-Political Study (Dacca, Asiatic Society of Pakistan, 1965), p. 303.304.

৩০. Dr. Nazimuddin Ahmed, Islamic Heritage of Bangladesh (Department of Films and Publications, 1980), p. 49.

৩১. Dr. Ahmad Hasan Dani, Muslim, op.cit. Pl LXXIII.

৩২. Enamul Haque, op. cit., Pl. 33./ Dr. Syed Mahmudul Hasan, op.cit., Plate-14.

৩৩. Dr. Ahmad Hasan Dani, Muslim, op.cit. plate LXIV/91.

৩৪. K.B. Sayed Aulad Hasan, Notes on the Antiquities of Dacca (1904) p. 41

৩৫. Dr. Ahmad Hasan, Muslim, op.cit. Plate LXXVI/ 105.

Dhaka University Institutional Repository

৩৬. Ibid - Plate LXXXIII/114.

৩৭. Satish Grover - op.cit., Fig.-6.08, p.146/Percy Brown, op.cit., Pl. XVII, Fig. 1.

৩৮. Satish Grover, op.cit., Fig-6.09, p. 147.

৩৯. Dr. Mumtazur Rahman Tarafdar, "Some Aspects of the Mamluk Buildings and their Influence on the Architecture of the Succeeding periods " J.A.S.B. Vol. No. 1 (1966),p. 52.

৪০. Satish Grover, op.cit., Fig. 2.05.

৪১. Percy Brown, op.cit., Pl.XV, Fig. 1.

৪২. Ibid, Pl. XXX, Fig. 1,2.

৪৩. Dr. Ahmad Hasan Dani, Muslim, op.cit., Plate XLI/62, Dr. Syed Mahmudul Hasan, op.cit., Plate-36.

৪৪. Muvlavi Abdul Wali, ' On the Antiquity and Tradition of the Jami Masjid and the Rauja of Hazrat Maulana Muhammad Arab at the Sailkupa Sub-Division Jhenidah, Dist. Jessore" J.A.S.B. Vol. LX, Part 1, (1901), p. 17.

৪৫. Percy Brown, op.cit., XXVI.

৪৬. Dr. Sayed Mahmudul Hasan, "The Splendour That was Gaud Part 1, The Citadel of Gaud "Shilpakala" Vol. 1 (Bangladesh Shiopakala Academy, Dhaka-2), Pl. No. XIII, p. 39.

৪৭. Ibid - Plate -LXIX.

৪৮. Ibid - Plate-LXIX.

৪৯. Sir Wolseley Haig, The Cambridge History of India, Volume III Turks and Afghans, Sir John Marshall, The Momuments of Muslim India, (S.Chand & Co., Delhi 1965), Plate XXXII, Fig. 63.

৫০. Philip K.Hitti, History of the Arabs, Macmillan London, (St. Martins Press, New York, 1968), p. 263.

Dhaka University Institutional Repository

৫১. K.A.C. Creswell - op.cit., Fig. 12.

৫২. A Survey of Persian Art, Editor, A.U. Pope, Vol-IV (Oxford University Press, London-1938) Pl. 264(A).

৫৩. Ibid- Pl. 419.

৫৪. The History and Culture of the Indian People, The Delhi Sultanate, General Editor, R.C. Mayumdar, Chapter XIX ; Art by Sarasi Kumar Saraswati, (Bombay Bhartiya Vidya Bhavan, 1980), p.p. 690.691.

৫৫. Dr. Ahmad Hasan Dani, Muslim, Plate XXXIII/52.

৫৬. Percy Brown, op.cit. Pl. CV, R. Nath, op.cit. Plate-LXXIX.

৫৭. Satish Grover, op.cit., Plate 6.07, p. 145, Percy Brown, op.cit., Plate-CIV, Fig. 2.

৫৮. Dr. R. Nath, op.cit., P. 17.

৫৯. Ibid.

৬০. Sarasi Kumar Saraswati, op.cit., p. 689.

৬১. Ibid, p. 691.

৬২. Dr. R. Nath, op.cit., Plate. LXXX.

৬৩. Satish Grover, op.cit. Fig.-6.07,p. 145.

৬৪. Dr. Ahmad Hasan Dani, Muslim, Pl.-XXX/49.

৬৫. Dr. R. Nath, op.cit., Plate-LXXIX.

৬৬. Ibid, Plate-CXXVI.

৬৭. Percy Brown, op.cit. Plate-XXIX, Fig. 1.

Dhaka University Institutional Repository

৬৮. Muhammad Abdul Qadir, The Newly Discovered Madrasha Ruins at Gaur and Its Inscriptions, J.A.S.B. Vols. XXIV-VI, (Dacca the A.S.B, 1979-1981), p. 52.

৬৯. . R. Nath, op,cit. Pl. XXIX.

৭০. Ibid- Pl. LXXXVI.

৭১. K .A.C. Creswell, A Short Account of Early Muslim Architecture, op.cit. p. 321.

৭২. Islamic Heritage of the D ccan, GuestEditor, George Mic Hell, (Marg Publications -1986),John Burton - Page,76.

৭৩. খান সাহেব আবিদ আলী খান, গৌড় ও পাণ্ডুয়ার স্মৃতি', অনুবাদ চৌধুরী শামসুর রহমান, পৃ ৬৫।

৭৪. Syed Mahudul Hasan. Mosque Architecture of Pre-Mughal Bengal, (University Press Ltd. 1979), p. 162

৭৫. Dr. Ahmad Hasan Dani, Muslim, op.cit. P. , XLVI

৭৬. Ibid, p. 152.

৭৭. Ibid, Pl. L/75.

Dhaka University Institutional Repository

৭৮. Dr. Syed Mahmudul Hasan, Mosque Architecture In Pre-Mughal Bengal (University Press Ltd. Bangladesh, 1979).p.169.

৭৯. Dr. Ahmad Hasan Dani, Muslim Architecture in Bengal (Dacca Museum-1961), p. 10.

৮০. Ibid.

৮১. Ibid.

৮২. Ibid

৮৩. Ibid.

৮৪. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, আনিসুজ্জামান সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী ঢাকা - ১৯৮৭, ডঃ মমতাজুর রহমান তরফদার, (বাংলার শিল্পকলা), পৃ. ১৮১ ।

৮৫. Dr. Ahmad Hasan Dani, Muslim, op.cit., p. 11.

৮৬. ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার ও অন্যান্য বাংলাদেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ, ১৩৮০ বাং. সন, শিল্প, রমেশ চন্দ্র মজুমদার, পৃ. ৪৩২ ।

৮৭. Dr. Ahmad Hasan Dani, Muslim, op.cit., p. 11.

৮৮. The Cambridge History of India, Volume III, Turks and Afghans, Edited by Sir Wolseley Haig, S. Chand & Co., Delhi, 1965, The Monuments of Muslim India, by Sir John Marshall, p. 577.

৮৯. Dr. Ahmad Hasan Dani, Muslim, op.cit., p. 12.

৯০. James Fergusson, History of Indian and Eastern Architecture, Vol.-II. (Munshiram Manoharlal, New Delhi, 1972), p p.253.254.

Dhaka University Institutional Repository

১১. Dr. Ahmad Hasan Dani, Muslim, op.cit., p. 14., Plate. XVII/34

১২. David J. Mccutchion, Late Mediaeval Temples of Bengal, (Calcutta, The Asiatic Society, 1971), p. 1

১৩. Dr. Ahmad Hasan Dani, Muslim, op.cit., Plate-LXXII/101

১৪. Ibid. op.cit., Plate. LXXVII/106

১৫. Ibid, op.cit., Plate-LXI/88.

১৬. Sir Wolseley Haig, The Cambridge History of India, Vol.III op. cit., p.600.

১৭. James Fergusson, op.cit., p. 253.

১৮. E.B. Havell, Indian Architecture, (S. Chand and Co.(Pvt.)Ltd. Ram Nagar, New Delhi, 1913), p p. 4.5.

১৯. K.A.C. Creswell, A Short Account of Early Muslim Architecture (Penguin Books, 1958), p. 184.

১০০. Dr. Ahmad Hasan Dani, Muslim, op.cit., p. 15.

১০১. Dr. R. Nath, History of Sultanate Architecture, (Abhinav Publication, New Delhi, 1978), Plate-IV.

১০২. Ibid. Plate. XX

১০৩. Ibid. Plate XXIII

১০৪. Dr. A.B.M. Husain, Book Review, J.A.S.P. Vol 8(1963), No. 2, p. 210.

১০৫. Dr. Ahmad Hasan Dani, Muslim, op.cit., Plate. XI, p. 15.

১০৬. Dr. A.B.M.Husain. op . cit., p. 179.

১০৭. Dr. Ahmad Hasan Dani, Muslim, op.cit., Plate. LXV/92.

Dhaka University Institutional Repository

১০৮. Ibid, Plate VIII/ 16.

১০৯. K.V. Soundara Rajan, Islam Builds In India, Cultural Study of Islamic Architecture, (Delhi, Agam Kala Parkashan, 1983), p. 183.

১১০. Dr. Ahmad Hasan Dani, Muslim, op.cit., p. 22.

১১১. গৌড়ের হযরত পান্ডুয়ার আদিনা মসজিদ, এতে গম্বুজের সংখ্যা সমন্ধে মতভেদ আছে, ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার, ডঃ রায় চৌধুরী ও ডঃ কালিকিংকর দত্ত এতে চারশত গম্বুজ ছিল বলে মনে করেন। জেমস ফারগুসনের মতে এতে ৩৭৪টি গম্বুজ ছিল। পারসি ব্রাউন ও ডঃ আহম্মদ হাসান দানীর মতে এখানে ৩০৬টি গম্বুজ ছিল।

১১২. Dr. Ahmad Hasan Dani, Muslim, op.cit., Plate. LXXII
মোঃ আবদুর রশিদ, ঢাকা নগরীর মসজিদ নির্দেশিকা (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭), বেগম বাজার শাহী মসজিদ, পৃ. ৩৫৭, 'তারা মসজিদ', পৃ. ৪৫।

১১৩. The History and Culture of the Indian People, Vol-VI, The Delhi Sultanate General Editor, R.C. Majumdar, Bombay Bharatiya Vidya Bhavan, 1967, Art by S.K. Saraswati, p. 698.

১১৪. Sir Jadu Nath Sarkar, The History of Bengal, Vol-II. Muslim Period (1200-1757) (The University of Dacca, 1948), p. 390.

১১৫. Hridaya Nath Majumdar Reminiscenees of Dacca, 1926) p. 37.

১১৬. Dr. Ahmad Hasan Dani, Dacca A Record of Its Changing Fortunes (The Saogat Press, 1956), p. 98.

১১৭. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ষোড়শ সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৮২, 'মহানগরীর স্থাপত্যে পরীবিবি ও তাঁর মাযার, একটি সমস্যা ও সমাধান, মোহাম্মদ শামসুল হক, পৃ. ২১১।

Dhaka University Institutional Repository

১১৮. Sir Jadu Nath Sarkar, op.cit., p. 391.

১১৯. Dr. Ahmad Hasan Dani, Muslim, op.cit., p. 275.

১২০. Syed Muhammed Taifoor, Glimpses of Old Dhaka, A Short Historical Narration of East Bengal and Assam with Special treatment of Dhaka" (The Pioneer Printing Press Ltd., 1956), p. 62.

Dhaka University Institutional Repository

চক বাজারের উৎপত্তি

ঢাকা নগরীর স্থাপত্য শিল্পের উপর প্রখ্যাত প্রত্ন তত্ত্ববিদদের লেখা বিবরণীতে এলাকা ভিত্তিক স্থাপত্য বিভাজনের যে প্রয়াস লক্ষ্য করা যাচ্ছে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কৃত্রিম। ডঃ আহমদ হাসান দানী তাঁর "Dacca A Record of Its Changing Fortunes"[১] নামক গ্রন্থে ঢাকার ইমারত সমূহকে Bungalow Type of Monuments, Lalbagh Group of Monuments, Chauk Group of Monuments, Old Town Monuments, Ramna Group of Monuments, On Way To Satmssjid, On Way To Tejgaon ইত্যাদি ভাগে বিভক্ত করেছেন। আঃ কঃ মুঃ যাকারিয়া তাঁর "বাংলাদেশের প্রত্ন সম্পদ"[২] গ্রন্থে লালবাগ এলাকার কীর্তি, চক বাজার এলাকার কীর্তি, ধানমন্ডি এলাকার কীর্তি, রমনা এলাকার কীর্তি, ঢাকার অন্যান্য এলাকার কীর্তি এবং ডঃ সৈয়দ মাহমুদুল হাসানের "Ancient Monuments of East Pakistan"[৩] গ্রন্থে Lalbagh Group, Chauk Group, New Dacca Group, Old Dacca Group এবং Tejgaon Group শিরোনামা অনুসরণ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এসব বিভাজন স্থানীয় ভূগোল ও মানচিত্র অনুসরণ করে গড়ে উঠেনি। কিন্তু গবেষণার সুবিধার্থে এই ধরণের বিভাজন কাজে আসতে পারে বলেই গবেষণার বিষয়বস্তু হিসেবে " MONUMENTS OF CHAUK BAZAR AREA OF DHAKA" নির্বাচিত হয়েছে।

ঢাকার চক বাজারের উৎপত্তি সম্পর্কে প্রত্ন তত্ত্ববিদরা একমত হতে পারেন নি। মুন্সী রহমান আলী তায়েশ তাঁর "তাওয়ারিখ-ই-ঢাকা" গ্রন্থে বলে ফেলেছেন যে, আগে এই এলাকাটি দুর্গের অংশ বিশেষ ছিল। ওয়ালটার সাহেব এই চক বাজার গড়ে তোলেন।[৪] ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময় মিঃ ওয়ালটার ঢাকা নগরীর রাজস্ব সংগ্রাহক ছিলেন। শিক্ষা-উন মূলক হাকিম হাবিবুর রহমান তাঁর "আসুদ-গান-ই-ঢাকা" গ্রন্থে বলেছেন যে চক বাজার দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী কর্তৃক নির্মিত হয়।[৫] Charles ' D' Oyly তাঁর Antiquities of Dacca" গ্রন্থে এই অভিমত দিয়েছেন যে, চক বাজার মুর্শিদ আলী খান কর্তৃক নির্মিত হয়েছে।[৬] কিন্তু মুর্শিদ আলী খান নামে কোন সুবাদার বা উচ্চ পদস্থ কর্মচারী ছিল বলে আমাদের জানা নেই। সম্ভবত তিনি ছিলেন নুৎফুল্লা ওরফে মুর্শিদ কুলী

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় । এই ব্যক্তি চক বাজারকে ১৭৩০ খ্রীষ্টাব্দে পুনঃ নির্মান এবং পুনঃ সংগঠিত করেন । A Cluad Campbell এঁর Glimpses of Bengal গ্রন্থের বর্ণনা মোতাবেক মুর্শিদ কুলী খান চক বাজারের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ।[৭]

ডঃ আহাম্মদ হাসান দানী তাঁর " Dacca A Record of Its Changing Fortunes " গ্রন্থে অভিমত দিয়েছেন যে, একটি অনুলিপি অনুযায়ী মুর্শিদ কুলী খান ই ১১১৪ হিঃ বা ১৭০২ খ্রীষ্টাব্দে চক বাজার প্রতিষ্ঠা করেন ।[৮] কিন্তু সৈয়দ মোহাম্মদ তাইফুর স্পষ্ট করে বলেছেন যে চক বাজারের উৎপত্তি ঘটে রাজা মানসিংহের আমলে ।[৯] ১৬০২ খ্রীষ্টাব্দে রাজা মানসিংহ তাণ্ডান গড় হতে ঢাকাতে তাঁর সদর দফতর স্থানান্তরিত করেন ।[১০] তাঁর সচিবালয় ছিল ঢাকা নগরের পশ্চিমাঞ্চলে ঢাকেশ্বরী মন্দির এলাকায় ।[১১] আর সেনানিবাস ছিল মোবারকাবাদে অর্থাৎ আধুনিক জেল খানায় অবস্থিত সেনা ছাউনিতে । বর্তমান ঢাকার উর্দু রোড ও এতদ সংলগ্ন এলাকা সেনা বাহিনীর কর্মকোলাহলে ছিল অত্যন্ত সরগরম । আজিমুশ্শান হায়দার, সৈয়দ মোহাম্মদ তাইফুরের বক্তব্য অনুসরণ করেছেন । তিনিও চক বাজারকে রাজা মানসিংহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পাদশাহী বাজার বলে উল্লেখ করেছেন ।[১২]

আমাদের মতে সৈয়দ মোহাম্মদ তাইফুর ও আজিমুশ্শান হায়দারের তথ্যটি অধিকতর যুক্তি যুক্ত, কেননা এই স্থানটির অবস্থানিক গুরুত্ব পাঠান আমল হতে সর্বাধিক অর্থপূর্ণ বলে বিবেচিত হচ্ছিল । এখানে ইকলিম মোবারকাবাদ ও কসবা-ই-ঢাকা খাস এর সদর দফতর ছিল । মোবারক আজিয়ালের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে পশ্চিম দিকে নিয়োজিত ছিল মোবারকাবাদ দুর্গটি । আর পূর্বদিকে কসবা-ই-ঢাকা খাস কে সুরক্ষিত করার মানসে কর্মরত ছিল বেগ মুরাদ খানের দুর্গ নামে দুটো পাঠান দুর্গ ।[১৩] শীতলক্ষ্যা ও সুরমুর মেঘনাতে পৌঁছতে ধোলাই খাল বা ধোলাই নদী বা বুড়িগংগার দুটি শাখা মুখ ছিল । প্রথমটি তেমরা খাল ও দ্বিতীয়টি খিজিরপুর খাল । আর শীতলক্ষ্যার বাম তীরে এই খিজিরপুর ছিল গঙ্গা, পদ্মা, শীতলক্ষ্যা ও ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গমস্থল । যে বিন্দুতে ধোলাই নদী

Dhaka University Institutional Repository

বুড়িগঙ্গার মোহনায় দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে গেল-এক শাখা ডেমরাতে ও অন্য শাখা খিজিরপুরে শীতলক্ষ্যার সাথে মিলিত হলো সে বিন্দুর পার্শ্বে একটি ফরাশগঞ্জের দিকে ও দ্বিতীয়টি ফরিদাবাদের দিকে বেগ মুরাদ খানের দুর্গ দুটি অবস্থিত ছিল।
ডঃ নলিনী কান্ত ভট্টশালী জোর দিয়ে বলেছেন যে ইসলাম খান তাঁর দখলদার বাহিনী নিয়ে আসার পূর্বে এ স্থানে অবশ্য এই দুর্গ দুটির অস্তিত্ব ছিল।[১৪] কাজেই এ দুটো দুর্গের নিকটে বিশেষ প্রয়োজনে চক বাজার প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। অনুলিপি অনুযায়ী ১৭০২ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদকুলী খান কর্তৃক চক বাজার প্রতিষ্ঠায় যে কথা রয়েছে তা' সম্ভবত খুব দুর্বল। তিনি এটাকে বাদশাহী বাজার নামে অভিহিত করেন। এই বাদশাহী বাজার ১৭৩৩-৩৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জামাতা লুৎফুল্লা ওরফে দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী খান পুনঃ নির্মান ও সংস্কার করেন।[১৫] ঢাকা নগরীর কালেক্টর মিঃ ওয়ালটার আবার দ্বিতীয় দফায় এই একে পুনঃ নির্মান এবং পুনঃ জীবিত করেন।[১৬]

তথ্য নির্দেশ

১. Dr. Ahmad Hasan Dani, Dacca A Record of Its Changing Fortunes, (The Saogat Press, 1956) p.p. 90-152.

২. আঃ কঃ মুঃ যাকারিয়া, 'বাংলাদেশের প্রত্ন সম্পদ' (বাংলাদেশ শিল্প কলা একাডেমী-১৯৮৪) পৃ- ৪৪১-৪৬৯।

৩. Dr. Syed Mahmudul Hasan, Ancient Monuments of East Pakistan, 1971, p. 128-128/

৪. মুন্সী রহমান আলী তায়েশ, 'তাওয়ারিখ-ই-ঢাকা' অনূদিত ডঃ আঃ মঃ মঃ শরফুদ্দীন (ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ১৯৮৫), পৃ. ২২৭।

৫. Hakim Habibur Rahman, Asudgan-i-Dhaka, p. 61

Dhaka University Institutional Repository

৬. Sir Charles 'D' Oyly, Antiquities of Dacca (John Landseer, London), p. 13.

৭. A.C. Campbell, Glimpses of Bengal, Vol-1 (Campbell and Medland 1907), p. 205.

৮. Dr. Ahmad Hasan Dani, op.cit.,pp. 100.101.

৯. Syed Muhammed Taifoor, Glimpses of Old Dacca, (The Saogat Press, Dacca, 1952), p. 129, একই লেখকের Glimpses of Old Dhaka, A Short Historical Narration of East Bengal and Assam with Special Treatment of Dhaka. Revised and Enlarged Second Edition. (The Pioneer Printing Press Ltd. 1956),p.76.

১০. Azimusshan Haidar, Dacca History and Romance in Place Names (Dacca Municipal Publication-1967), p. 24.

১১. ডঃ রফিকুল ইসলাম, ঢাকার কথা (১৬১০-১৯১০) (আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা-১৯৮২, পৃ. ১।

১২. Azimusshan Haidar, op.cit. p. 24.

১৩. মোহাম্মদ শামসুল হক, প্রাক-মুঘল যুগের ঢাকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা (উনত্রিংশ সংখ্যা, ১৩৯৪ বাংলা), পৃ. ২০৫।

১৪. N.K. Bhattasali, An Inquiry into the Origin of the City of Dacca,The Journal of the Royal Asiatic Society of Bengal Letters, Volume-V, 1939, Article No. 18, p.451.

১৫. Azimusshan Haidar, op.cit. p. 24.

১৬. Ibid, p. 25.

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকার চক বাজার এলাকার স্থাপত্য কীর্তি

Dhaka University Institutional Repository

ম স জি দ

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম খানের মসজিদ

১৬১০[১] খ্রীষ্টাব্দে সুবাদার ইসলাম খান ইসলামপুরে একটি মসজিদ নির্মান করেন। ঢাকা নগরী গঠনের পরে এটি প্রথম মসজিদ[২]। আসলে মসজিদটি এখন ইসলামপুরের নিকটস্থ পুরানা আলেক জমাদার লেন, অধুনা ৩৮ নং সৈয়দ আওলাদ হোসেন লেনে অবস্থিত। এই ইমারতটি আভ্যন্তরীন ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্যে ৩৩'-৪" প্রস্থে ১৩'-১" । ইহা তিনটি 'আইলে' বিভক্ত, কেন্দ্রীয় আইলটি ১৬'- ৪$\frac{১}{২}$" লম্বা আর এর পার্শ্ববর্তী দুইটি ৮'-০" লম্বা। এই মসজিদের কার্নাসের দেয়াল ৩'-০" এবং উত্তর ও দক্ষিণ -এর দেয়ালগুলি ২'-৭" পুরু। এর কার্নাসে তিনটি প্রবেশ পথ রয়েছে। প্রবেশ পথগুলো ৪'-০" প্রশস্ত। এই মসজিদের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে দুইটি বর্গাকার জানালা রয়েছে। তিনটি দরজার সাথে সামঞ্জস্য রেখে এবং তিনটি আইলের উপর লক্ষ্য রেখে এই মসজিদের কিবলা দেয়ালে তিনটি মিহরাব নির্মিত হয়েছে। এই অট্টালিকার একটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য এই যে কেন্দ্রীয় মিহরাব এর পার্শ্ববর্তী মিহরাব দুটির উপরে ২'-১০" বর্গাকার জানালা নির্মান করা হয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ৩'-১$\frac{১}{২}$" পার্শ্ব বিশিষ্ট দুইটি গবাক্ষ পথ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। (ভূমি নকশা ১)

ঢাকার স্থাপত্য ইমারত মোটামুটি দুই শ্রেণীর, বর্গাকার ও আয়তাকার ইমারত। মসজিদ স্থাপত্যের জন্য বর্গাকার ও আয়তাকার পরিকল্পনাই অধিকতর উপযোগী। আবার এই দুই শ্রেণীর মধ্যে আয়তাকার ইমারতের প্রাধান্য বিশেষভাবে স্বীকৃত, কেননা ইসলাম হলো বিশ্বের সবচেয়ে গণতান্ত্রিক ধর্ম[৩] এখানে মোয়াখাত বা ভ্রাতৃত্বের বন্ধন অত্যন্ত জোড়ালো। এই জন্যই প্রার্থনাগারে জনসমাগম অত্যন্ত বেশী। তাই ইসলামে বর্গাকার মসজিদের চেয়ে আয়তাকার মসজিদ অধিকতর গুরুত্ব পেয়েছে, কেননা এখানে মুসল্লী ধরে বেশী। এ কারণে সম্ভবতঃ মসজিদের উপর গম্বুজ উত্তোলনে বিশেষ বিশেষ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। বর্গাকার মসজিদকে যেমন সহজেই গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত করা যায়, আয়তাকার মসজিদকে সেভাবে অনায়াসে গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত করা যায় না। বর্গাকার মসজিদের উপর গম্বুজ উত্তোলনে একটি বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

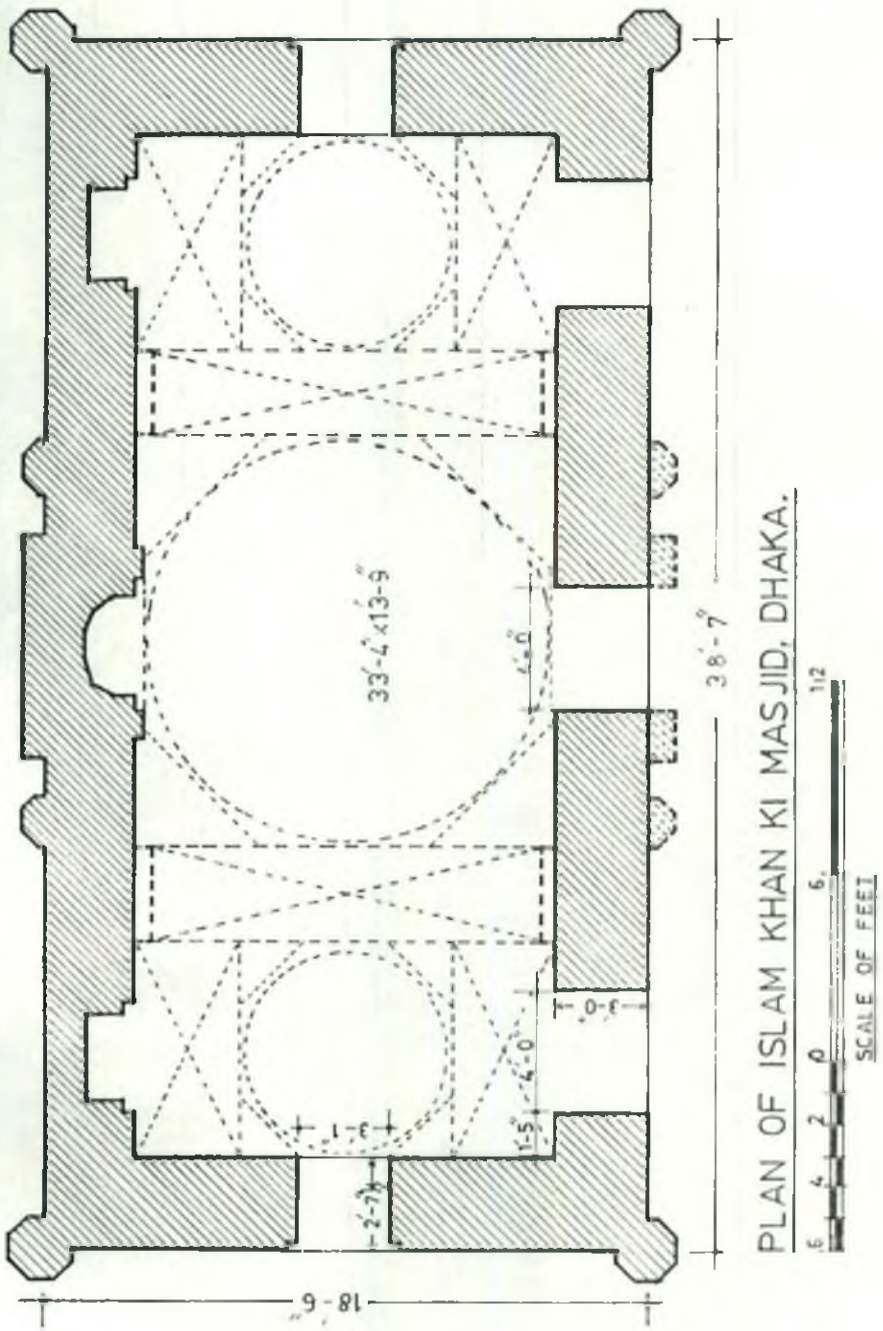

ভূমি নকশা ১

Dhaka University Institutional Repository

জ্যামিতিক সূত্র অনুযায়ী বর্গক্ষেত্রের চারটি বাহু পরস্পর সমান এবং এর প্রতিটি কোন সমকোন । এরূপ বর্গক্ষেত্রের উপর বৃত্তাকার গম্বুজ উত্তোলন করতে হলে বর্গক্ষেত্রের চারটি কোন ফাঁকা থেকে যাবে । এই ফাঁকা স্থানটি হবে অনেকটা ত্রিভুজের আকৃতি বিশিষ্ট । বর্গক্ষেত্রের যে বিন্দু হতে আরম্ভ করে ফাঁকা স্থানটিকে ক্রম পূরণ পদ্ধতির মাধ্যমে উপরস্থ গম্বুজ পর্যন্ত পৌঁছা যাবে সেই স্থানটি হবে উত্তরণ স্থল । উত্তরণ স্থলে বিশিষ্ট উপাদান বা অবস্থানতর সদস্য সংযোজন করে ক্রম পূরণের মাধ্যমে এই ফাঁকা স্থান গুলোকে ভরে দিতে হয় । এখানকার সমস্যা হলো এমন একটি উত্তরণের স্থল বা অবস্থানন্তর পদ্ধতির উদ্ভাবন যা বর্গের আকৃতিকে বৃত্তাকার আকৃতি বিশিষ্ট অবয়বে পরিণত করবে । আর এই বৃত্তের উপর তুলতে হবে গম্বুজ, কেননা বর্গ ক্ষেত্র বা আয়তক্ষেত্রকে বৃত্তাকারে পরিণত করা না গেলে এখানে গম্বুজ উত্তোলন করা যাবে না । ঢাকার স্থপতিরা যে সমস্ত কর্মকান্ডের মাধ্যমে এই ক্রম পূরণ প্রক্রিয়ার কাজ সেরে ফেলার চেষ্টা করেছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো ত্রিভুজাকার পেন্ডেনটিভ ও খিলান ভিত্তিক স্কুইঞ্চ ।

এখন আলোচ্য ইসলাম খানের মসজিদটি একটি আয়তাকার প্রকল্প। ইহা সাধারণত: একটি 'আইল' ও দুটো 'বে' তে বিভক্ত । বস্তুতপক্ষে এ আইল ও বে এর উভয় ক্ষেত্রেই উত্তো-লনের স্থল ক্রমপূরণ পদ্ধতির ক্ষেত্রে পেন্ডেনটিভ ব্যবহার করা হয়েছে । কেন্দ্রীয় আইলটি বর্গাকার বিধায় এখানে গম্বুজ উত্তোলন করতে বিশেষ কোন অসুবিধার সৃষ্টি হয় নি, কেননা বর্গক্ষেত্রের কোনায় পেন্ডেনটিভ নির্মান করে সহজেই সমস্যাটির সমাধান দেয়া হয়েছে ।

কিন্তু পার্শ্ববর্তী 'বে' দুটোর উপর গম্বুজ সংস্থাপন করতে একটি বিশেষ সমস্যার সম্মু-খীন হতে হয়েছে, কেননা এ দুটো 'বে' হলো আয়তাকার। তাই আয়তাকার বে দুটোকে বর্গ ক্ষেত্রে রূপান্তরিত করে তার উপর গম্বুজ স্থাপন করা হয়েছে । এ অবস্থায় আয়তাকার প্রক-ল্পটির পূর্ব ও পশ্চিম দেয়ালের উপরস্থ কাঠামোটিকে অর্ধ গম্বুজের আকৃতি দিয়ে ক্রমশঃ এদেরকে সম্মুখের দিকে এগিয়ে দিয়ে এর দৈর্ঘ্যকে কমিয়ে উত্তর ও দক্ষিণ দিকে দেয়াল ভিত্তিক কাঠা-মোর দৈর্ঘ্য বা প্রস্থের সমান করে সার্বিক কাঠামোটিকে বর্গক্ষেত্রে রূপান্তরিত করে কোনায়

Dhaka University Institutional Repository

তরাট কার্যে পেনডেনটিভ নির্মান করে তার উপর গম্বুজ উত্তোলন করা হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে এই উভয় ক্ষেত্রেই গম্বুজ উত্তোলন করতে অষ্টকোনাকার পিপা ব্যবহার করা হয়েছে, কেননা বর্গক্ষেত্রের উপর গম্বুজ উত্তোলন করার চেয়ে অষ্টভুজের উপর গম্বুজ নির্মান করা সহজতর বলে প্রমানিত হয়েছে। এইরূপে কেন্দ্রের বৃহত্তম গম্বুজটি একটি অষ্টকোনাকার পিপার উপর নির্মিত, এই পিপাটি ২'-৭" উচুঁ। অষ্টভুজের প্রতিটি বাহুর পরিমান হলো ৭'-০" আর গম্বুজটির পরিধি হলো ৫১'-৮"। পিপাসহ গম্বুজটির উচ্চতা হলো ১৫'-০"। এতে কিনিয়ালের উচ্চতা ধরা হয়নি।

পার্শ্ববর্তী গম্বুজ দুটোও একটি অষ্টকোন বিশিষ্ট পিপার উপর নির্মিত, পিপার উচ্চতা হলো ২'-০"। অষ্টভুজের প্রতিটি বাহুর পরিমান হলো ৪-০" এবং গম্বুজের পরিধি ৩০'-০"। কিবলা দেয়ালের উপরে চারটি মিনার নির্মিত হয়েছে। মিনারের উপরে পরিশোভিত হচ্ছে কলস কিনিয়াল। উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব দিকেও এরূপ মিনার ছিল বলে অনুমিত হয় কিন্তু আধুনিককালে এই মসজিদটির বহুল সম্প্রসারণ ঘটেছে বলে এসকল মিনারের অস্তিত্ব আজ বিলুপ্ত।

মসজিদটি অত্যন্ত সাদা সিদা, বিস্ময়করভাবে ইহা অলংকার বিবর্জিত, তবে অধুনা এর মেঝ এবং তিন ফুট উচ্চতা পর্যন্ত দেয়াল অত্যন্ত সুন্দর মোজাইক দ্বারা আবৃত করা হয়েছে। এই মসজিদ বর্তমানে দুইটি আধুনিক বারান্দা দ্বারা সম্প্রসারিত হয়েছে।

ইসলাম খান আরও অনেক স্থাপত্য কর্মে আত্মনিয়োগ করেছিলেন বলে আমাদের বিশ্বাস। কিন্তু ইসলাম খান-কি-মসজিদ ব্যতীত তাঁর অন্য কোন স্থাপত্য কর্ম কালের করাল গ্রাস হতে রক্ষা পায়নি। তবে বর্তমান কেন্দ্রীয় কারাগার এলাকায় তিনি একটি নুতন দুর্গ ও নতুন প্রাসাদ নির্মান করেছিলেন বলে ডঃ আহামদ হাসান দানী[৪] ও ডঃ সৈয়দ মাহমুদুল হাসান[৫] উল্লেখ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

মির্যা নাথান বাহারিস্তান গায়েবীতে তাঁর ভাষায় বলেছেন যে সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে কায়জার আলা-উদ-দীন ইসলাম খান চিশতি আধুনিক পাবনা জেলার শাহজাদপুরে অবস্থানকালে তিনজন গুরুত্বপূর্ণ সরকারী কর্মচারীকে মোবারকাবাদে অবস্থিত দুর্গটি নির্মাণ বা মেরামত করার জন্য স্থল বাহিনী ও নৌবহর সহ প্রেরণ করেছিলেন। দ্বিতীয়ত, এই মসজিদের বর্ণনা প্রসঙ্গে মুন্সী রহমান আলী তায়েশ[৬] মোহাম্মদ আবদুর রশিদ[৭] ও মিঃ আশরাফ হোসেন বলেছেন যে ঢাকা নগরীর পত্তনের পর এইটি প্রথম মসজিদ[৮] বা এটি শহর পত্তন কালের প্রাচীন ইমারত। ডঃ সৈয়দ আওলাদুল হাসান ইহাকে নগরীর প্রাচীনতম জীবন্ত মোঘল ইমারত বলে অভিহিত করেছেন[৯]। মোঘল সুবা বাংলার রাজধানী ঢাকার প্রতিষ্ঠাতা আলা-উদ-দীন ইসলাম খান চিশতি এই মসজিদ নির্মাণ করেন।[১০]

ডঃ আহাম্মদ হাসান দানী উল্লেখ করেছেন যে এই মসজিদের সারল্য একে শায়েস্তা খান পূর্ব শিল্প রীতির মসজিদ বলে প্রতিপন্ন করেছে।[১১] আঃ কঃ মুঃ যাকারিয়ার মতে "মসজিদের গঠন প্রণালী ও এর স্থাপত্য কৌশল প্রমাণ করে যে ইহা শায়েস্তা খান পূর্ব যুগীয়"[১২]। ডঃ সৈয়দ মাহমুদুল হাসান,[১৩] ও মুন্সী রহমান আলী তায়েশ কম বেশী একই মত পোষণ করেন।[১৪] কিন্তু ঐ সব ঐতিহাসিক বলতে পারেন নি যে শায়েস্তা খানী স্থাপত্য রীতির পূর্বে বাংলাদেশে অথবা ঢাকাতে কি ধরণের শিল্পরীতির মুঘল স্থাপত্য বিদ্যমান ছিল। দ্বিতীয়তঃ, শায়েস্তা খানী স্থাপত্যরীতি বলতে কি বুঝায় তা' এ সকল পণ্ডিতগণ নির্দিষ্ট করে কিছু বলতে পারেন নি। শায়েস্তাখানী স্থাপত্য রীতির মূল প্রবক্তা ডঃ আহাম্মদ হাসান দানী নিজেই স্বীকার করেছেন যে শায়েস্তা খানী স্থাপত্য রীতি দ্বারা এরূপ একটি শিল্প রীতির নির্দেশ করে না যা শায়েস্তা খান আবিষ্কার করেছেন।[১৫] তাহলে প্রশ্ন থাকে এই শিল্পরীতিটি কি? ডঃ আহামদ হাসান দানী অবশ্য এর কতগুলো বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করেছেন। প্যানেল পরিশোভিত প্রাসাদ, তিনটি খিলান পথ দ্বারা বিদীর্ণ দালান, কেন্দ্রীয় খিলান পথটি পার্শ্ববর্তী খিলান পথ হতে ঈষৎ বৃহত্তর। কেন্দ্রীয় খিলান পথটির উদগত সম্মুখ ভাগ রয়েছে। এই স্থাপত্যের প্যারাপেট সোজা ও অনুভূমিক এবং এরা অন্ধ মার্লন পরিশোভিত। মসজিদের ছাদের উপর তিনটি গম্বুজ নির্মিত হয়েছে। গম্বুজের রয়েছে শিখা বা তিত যার ফলে উচ্চতায় এরা

Dhaka University Institutional Repository

শূন্যে ওঠে গেছে । বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় গম্বুজটি পার্শ্ববর্তী গম্বুজ দুয়ের চেয়ে আকার, প্রকার ও উচ্চতায় বৃহত্তর । ডঃ আহমদ হাসান দানীর মাধ্যমে পেশকৃত এ সব উপাদান যদি শায়েস্তা খানী স্থাপত্য রীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে থাকে, তাহলে দেখা যাবে আলোচ্য মসজিদে এ সকল বৈশিষ্ট্যের অনেকগুলোই বিদ্যমান । দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে যে প্যানেল দ্বারা অলংকৃত ফাসাদ, তিনটি খিলান পথ দ্বারা বিদীর্ণ ফাসাদ, তিন আইল গভীর কিবলা কোঠা, তিনটি দরজা পথের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কিবলা দেয়ালে তিনটি মিহরাব, তিনটি আইলের উপর তিনটি গম্বুজ, গম্বুজ উত্তোলিত হয়েছে ড্রাম (পিপা) এর উপরে । ফলে ইহা মানানসই উচ্চতা পেয়েছে । মধ্যবর্তী গম্বুজটি অন্য দুটো গম্বুজ হতে উচ্চতর ।

তাহলে বলা যেতে পারে যে ইসলাম খানের মসজিদটি শায়েস্তা খানী স্থাপত্যের সাক্ষাৎ পূর্বসূরী এবং শায়েস্তা খানী শিল্প রীতির বিকাশে ইহা বিলক্ষণ প্রভাব রেখে গেছে ।

তথ্য নির্দেশ

১. মিঃ আশরাফ হোসেন, সাপ্তাহিক ফসল, (২৯-৩০ সংখ্যা, ১৯৮৯ইং), পৃ. ৩৯ ।

২. ডঃ আহমদ হাসান দানী, ডঃ সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, মুন্সী রহমান আলী তায়েশ, প্রমুখ স্থাপত্য বিশারদগণ এই মসজিদের নির্মাণ তারিখ উল্লেখ করেন নি । প্রবন্ধকার আশরাফ হোসেনই একমাত্র লেখক যিনি এর নির্মাণ তারিখ উল্লেখ করেছেন; তবে এই মর্মে কোন শিলালিপি নেই ।

৩. Gordon Hearn, Seven Cities of Delhi,(1906) Footnote, p.736.

৪. Dr. Ahmad Hasan Dani, Muslim Architecture in Bengal, (Dacca Paramount Press 1961), p. 192.

৫. Dr. Syed Mahmudul Hasan, Dacca The City of Mosques (Islamic Foundation, Bangladesh - 1981), p. 33.

৬. মুন্সী রহমান আলী তায়েশ, "তাওয়ারিখ-ই-ঢাকা", অনূদিত ডঃ ম.ম. শরফুদ্দীন, (ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ১৯৮৫), পৃ. ১৮৫ ।

Dhaka University Institutional Repository

৭. মোঃ আবদুর রশিদ, ঢাকা নগরীর মসজিদ নির্দেশিকা (ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ১৯৮৭) পৃ- ৩৫ ।

৮. আশরাফ হোসেন, সাপ্তাহিক কমল, ২৯,৩০ সংখ্যা (১৯৮৯) পৃ. ৩৯ ।

৯. Dr. Syed Mahmudul Hasan, op.cit.,p. 33

১০. Dr. Ahmad Hasan Dani, Dacca A Record of Its Changing Fortunes, (The Saogat press, 1956) 125.

১১. Ahmad Hasan Dani, Dacca A Record, Op. cit.,P. 109.

১২. আঃ কঃ মুঃ যাকারিয়া, বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ, (বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী) পৃ. ৪৫৪ ।

১৩. Dr. Syed Mahmudul Hasan, op.cit.,p.33.

১৪. মুন্সী রহমান আলী তায়েশ, প্রাগুক্ত - পৃ. ১৮৫ ।

১৫. Dr. Ahmad Hasan Dani, Dacca A Record, op. cit.pP. 89

Dhaka University Institutional Repository

১। ইসলাম খানের মসজিদ / তিন গম্বুজ ও মিনার (১৬১০ খ্রীঃ)

২.

ইসলাম খানের মসজিদ / প্রধান মিহরাব

Dhaka University Institutional Repository

৩. ইসলাম খানের মসজিদ / কিবলা দেয়াল, পার্শ্ববর্তী মিহরাবের উপরের জানালা ।

Dhaka University Institutional Repository

চুড়িহাট্টা মসজিদ

চুড়িহাট্টা অর্থ হল চুড়ির হাট বা চুড়ি বেচাকেনার হাট। চক বাজারের পশ্চিমে যে গলিতে চুড়ি শিল্পীরা বাস করত, এবং চুড়ি নির্মান করে তা' বিক্রি করতো সেই গলিটিকে চুড়িহাট্টা নামে অভিহিত করা হয়।

এখানে নির্মিত হয়েছিল

মুঘল আমলের দ্বিতীয় মসজিদ। এই মসজিদটি ১০৬০ হিঃ/১৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশের তদানীন্তন সুবাদার শাহ্ সুজার আমলে তাঁর জনৈক কর্মচারী মোহাম্মদী বেগ কর্তৃক নির্মিত হয়।[১] মুঘল আমলের অধিকাংশ মসজিদের মত ইহা পরিকল্পনায় ছিল আয়তাকার। এর চার কোনায় চারটি বুরুজ ছিল, এর সামনে ছিল তিনটি দরজা। দরজাগুলি দুটো পর পর খিলানের মাধ্যমে ছিল উন্মুক্ত। এর সামনাটি অসংখ্য আয়তাকার ও বর্গাকার প্যানেল দ্বারা অলংকৃত ছিল। এর কার্ণিশটি ছিল সোজা সুজিভাবে নির্মিত এবং অন্ধ মার্লন দ্বারা বৈশিষ্ট্য মন্ডিত। বাংলাদেশের মোঘল স্থাপত্যের ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য, কেননা সুলতানী আমলে কার্ণিশগুলি ছিল বাঁকানো ধনুকাকৃতিক। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ইহা দৈর্ঘ্য প্রস্থে ছিল ৩০'-০" x ১৪'-০" এবং এর দেয়ালগুলি ছিল ৫'-০" পুরু।[২] এর খিলানগুলি ছিল চৌ-কেন্দ্রিক চুঁচালো। (ভূমি নকশা ২)

এর অভ্যন্তর তিনটি 'বে'-তে বিভক্ত ছিল। এর প্রতিটি 'বে'এর কিবলা দেয়ালে তিনটি মিহরাব ছিল। মিহরাবের উপরাংশ আয়তাকার প্যানেল দ্বারা বৈশিষ্ট্য মন্ডিত ছিল। মসজিদটির উত্তর ও দক্ষিণ দিকে ২টি দরজা ছিল। এদের মাধ্যমে মসজিদের অভ্যন্তরে আলো প্রবেশ করতো। এই মসজিদের একটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য এই যে এতে কোন গম্বুজ ছিল না। বিভিন্ন স্থাপত্য বিশারদরা এর ছাদ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। কেহ কেহ এই ছাদকে দোচালা ছাদের[৩] অভিন্ন রূপ বলে মনে করেন। আবার অনেকে এর ছাদকে চৌ-চালা ছাদের[৪] অন্তর্ভুক্ত করে দেখাতে চেষ্টা করেছেন। আবার কো ন কোন স্থাপত্য বিশারদ এই মসজিদটি ঢেকী ছাদ[৫] দ্বারা আচ্ছাদিত বলে মন্তব্য করেছেন। কিন্তু আসল কথা হলো এই যে এই মসজিদটি উত্তর ভারতীয় পিরামিড আকৃতির[৬] ছাদ দ্বারা আবৃত ছিল। এই রূপ পিরামিড আকৃতির ছাদের অবিকল দৃষ্টান্ত রয়েছে দিল্লীর ইতিমাদ উদ্দৌলার সমাধি সৌধের ছাদের অনুরূপ।[৭] আরমানী টোলার পূর্ব দিকে এই রূপ ছাদ বিশিষ্ট ছোট একটি মসজিদ লক্ষ্য করা যায়। বর্তমানে চুড়িহাট্টার পুরাতন সমজিদের উপর সম্পূর্ণ নুতন আঙ্গিকে একটি মসজিদ নির্মিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

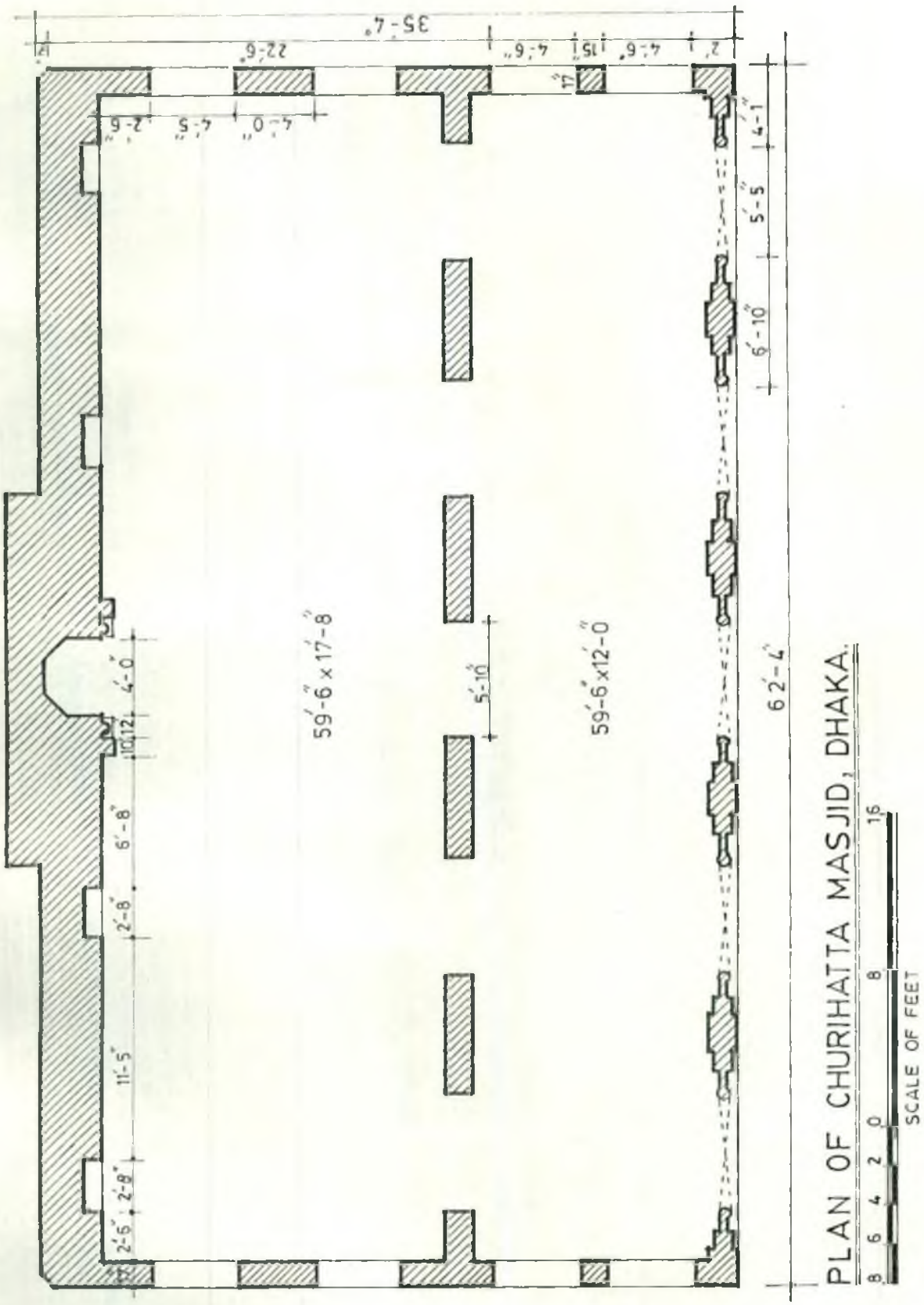

ভূমি নকশা ২

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১. Munshi Rahman Ali, Tawarikh-i-Dhaka, (1910), pp.256.58. আঃকঃমুঃ যাকারিয়া, 'বাংলাদেশের প্রত্ন সম্পদ', (বাংলাদেশ বিজ্ঞানকলা একাডেমী, ১৯৮৪, পৃ. ৪৪৭।
Dr. Ahmad Hasan Dani, Muslim Architecture in Bengal, (Dacca Museum, 1961), p. 194 /আরো দেখুন Syed Muhammed Taifoor,Glimpses of Old Dhaka. (The Pioneer Printing Press, 1956), p. 127.

২. K.B. Sayed Aulad Hasan, Notes on The Antiquities of Dacca, p. 30.

৩. Syed Mahmudul Hasan, Ancient Monuments of East Pakistan, (Pakistan Academy 1970), p. 121./ আরো দেখুন, মোঃ আবদুর রশীদ, ঢাকা নগরীর মসজিদ নির্দেশিকা(ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, বাংলাদেশ, ১৯৮৭), পৃ. ৩৪৪।

৪. Dr. Syed Mahmudul Hasan, op.cit.,p. 121 /আঃকঃমুঃ যাকারিয়া, পূর্বোক্ত- পৃ. ৪৪৭।

৫. Syed Muhammed Taifoor, op. cit. p. 127.

৬. Dr. Ahmad Hasan Dani, Muslim, op.cit.,p. 194.

৭. History and Culture of The Indian People, Volume-VII, The Mughal Empire. General Editor, R.C. Majumdar, Bombay Bharatiya Vidya Bhaban, 1974, Mughal Architecture by S.K. Saraswati, Plate. 30

Dhaka University Institutional Repository

নবরায় গলির মসজিদ

মহানগরীর ইসলামপুর সড়কের উত্তর দিকে পূর্বে একটি পতিতালয় ছিল। এটা এখন নবরায় গলিতে রূপান্তরিত হয়েছে। ইসলামপুর সড়ক বা তাঁতী বাজার সড়ক এ দু'দিক থেকে নবরায় গলিতে প্রবেশ করা যায়। এখানে নবরায় গলি মসজিদ নামে একটি প্রার্থনাগার বিদ্যমান ছিল। কিন্তু বর্তমানে এই মসজিদের কোন অস্তিত্ব নেই। অধুনা এখানে বহুতলা বিশিষ্ট ইমারত নির্মিত হয়েছে। এই জন্যই এর চাক্ষুষ বিবরণ দেয়া সম্ভব নয়। তবে ডঃ আহমদ হাসান দানিকে অনুসরণ করে এর কিছু বর্ণনা তুলে দেয়া যায়[১]। মসজিদটি একটি উত্তোলিত মঞ্চের উপর নির্মিত হয়েছিল। এর একটি কোনাতে একটি কূপ ছিল বলে জানা যায়। মসজিদের কার্নিশটি প্যানেল দ্বারা সজ্জিত ছিল এবং প্রতিটি প্যানেলে Ogee খিলান নির্মিত হয়েছিল। মসজিদটিতে পর-বর্তীকালে একটি নূতন বারান্দা সংযোজিত হয়েছিল।

মসজিদে প্রবেশ করার নিমিত্ত তিনটি দরজা ছিল। কেন্দ্রীয় দরজাটি বহু সূক্ষ্মাগ্র কলা বিশিষ্ট খিলান সহযোগে গঠিত ছিল। আর পার্শ্ববর্তী দরজা দুটো ত্রিকলা খিলান সমন্বয়ে গঠিত ছিল। পূর্ব দিকের এই তিনটি দরজাকে অনুসরণ করে কিবলা দেয়ালে তিনটি মিহরাব নির্মিত হয়েছিল। এই মিহরাবগুলো প্যানেল দ্বারা অলংকৃত ছিল। এখানে কোন শিলালিপি না থাকাতে নির্মাতার নাম ও নির্মান তারিখ সম্পর্কে কিছুই বলা যায় না। তবে শিল্প রীতির দিক থেকে ডঃ আহমদ হাসান দানী এটাকে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে নির্মিত হয়েছিল বলে মনে করেন[২]।

তথ্য নির্দেশ

১. Dr. Ahmad Hasan Dani, Dacca A Record of Its Changing Fortunes, (The [illegible] Press, 1956), p. 91.

২. Ibid. p. 92.

Dhaka University Institutional Repository

শায়েস্তা খানের মসজিদ

বুড়ী গঙ্গা নদীর উত্তর তীরে মিটফোর্ড হাসপাতালের পিছনে আমীর-উল-উমারা নওয়াব শায়েস্তা খান একটি মসজিদ নির্মান করেন । এই এলাকাটি পূর্বে কাটরা পাকুরটুলী নামে প্রসিদ্ধ ছিল । ঢুকাইলাদের গোমান বাবুরা এখানে একটি বাজার প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন ।[১] এই জন্যই অধুনা এলাকাটি বাবু বাজার নামে পরিচিত । বর্তমানে এটার অবস্থান স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও মিটফোর্ড হাসপাতালের পার্শ্ববর্তী স্থানে । মুন্সী রহমান আলী তায়েশের মতে, "আমীর-উল-ওমারা নওয়াব শায়েস্তা খান কর্তৃক নির্মিত ইমারত রাজির মধ্যে এটাই প্রথম "।[২] এই মসজিদটি তাঁর বাসভবন তৈরীর সময় নির্মান করা হয়েছিল, বলে অনেকের ধারণা । তবে তাঁর বাসভবনের কোন নিদর্শন এখন আর অবশিষ্ট নেই । শুধু মাত্র বাবু বাজারের ঘাট থেকে পূর্ব দিকে খাল পর্যন্ত একটি ভীত রয়েছে । Charles D Only এ সম্পর্কে একটি নুতন তথ্য পরিবেশন করেছেন । কথিত আছে যে সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে রাজা মানসিংহ শায়েস্তা খানের মসজিদটিকে একটি হিন্দু মন্দির হিসেবে আরম্ভ করেন,[৩] কিন্তু পরবর্তীকালে সইফ খান এটাকে মসজিদ রূপে পূর্ণতা দান করেন । কিন্তু তাঁর বর্ণনা অন্য কোন প্রত্নতত্ত্ব বিদদের দ্বারা সমর্থিত হয়নি । মসজিদের কেন্দ্রীয় দ্বার পথের উপরে যে শিলালিপি ছিল তা থেকে জানা যায় যে এটা নওয়াব শায়েস্তা খান কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল । কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ এর নির্মানকাল শিলালিপি থেকে উধাও হয়ে গিয়েছে । এর কারণ হলো এই যে, অনুলিপি ধারণকারী শিলালিপি খানা আগুন লেগে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং তারিখ ও বৎসরসহ এর অনেকগুলো অক্ষর নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় । এ জন্যই সম্ভবত সৈয়দ আওলাদ[৪] হাসান ও ডঃ আহামদ হাসান দানী[৫] এর নির্মানকাল সম্বন্ধে কোন নির্দিষ্ট তারিখ উল্লেখ করেন নি । তাঁরা অনুমান করেন যে, নওয়াব শায়েস্তা খান রাজ প্রতিনিধি হিসেবে বাংলাতে অবস্থানের প্রথম যুগে অর্থাৎ ১৬৬৪-১৬৭৭ খ্রীষ্টাব্দ এর মধ্যে এটা নির্মান করেন । কিন্তু মুন্সী রহমান আলী তায়েশ অত্যন্ত সাহস করে এর নির্মান তারিখ উল্লেখ করেছেন । তিনি বলেন, " নওয়াব শায়েস্তা খানের প্রথম বারের সুবাদারীর আমলে অর্থাৎ ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে শায়েস্তা খানের বাড়ী ও মসজিদ নির্মান করা হয় "।[৬]

Dhaka University Institutional Repository

সৈয়দ আওলাদ হাসানের মতে, গোটা ইমারতটি আগুনে পুড়ে যায়,[৭] তাই বৃটিশ আমলে পূর্ত বিভাগ এটির সংস্কার করেন। স্থাপত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে এদের ন্যুনতম ধারণা ছিলনা[৮], তাই সংস্কারের ফলে এই মসজিদের সৌন্দর্য অনেকটা ক্ষুন্ন হয়েছে। এ জন্যই ডঃ আহা্‌মদ হাসান দানী বলেছেন যে অধুনা ইমারতটি শায়েস্তা খানী বৈশিষ্ট্য হতে সম্পূর্ণ সম্পূর্ণ আলাদা[৯]। কিন্তু নিম্নলিখিত বর্ণনা হতে স্পষ্টই বুঝা যাবে যে তাঁর এ মন্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। শায়েস্তা খানের এই মসজিদটি আভ্যন্তরীন ক্ষেত্রে ৩৭'-৯" দৈর্ঘ্য এবং ১৬'-১" চওড়া। এর উচ্চতা হলো ১৮'-০"। স্বভাবতই এই উচ্চতা মসজিদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য; কেননা মুঘল আমলে নির্মিত এত উচ্চতা বিশিষ্ট মসজিদ খুব কমই দেখা যায়। এর কাসাদের দেয়াল ৪'-৯" পুরু। এই ঘনত্বও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ; কেননা এত পুরু দেয়াল খুব কমই পরিদৃষ্ট হয়। (ভূমি নকশা ৩)

মসজিদের কাসাদে তিনটি দরজা রয়েছে। দরজাগুলি চারিকেন্দ্রিক চুঁচালো খিলান বিশিষ্ট। অর্ধ গম্বুজের নীচ দিয়ে এই দরজাগুলি ভিতরের দিকে উন্মুক্ত। এ জন্যই দরজার পূর্ব ও পশ্চিম অংশ একই পরিমান প্রস্থ বিশিষ্ট নয়। কেন্দ্রীয় দরজাটি বাইরের দিকে ৯'-৫" প্রস্থ, ঢাকার আর কোন মসজিদে এত বড় অর্ধ গম্বুজের নীচ দিয়ে মসজিদের অভ্যন্তরে প্রবেশ পথ পরিদৃষ্ট হয় না। এদিক দিয়ে একে একটি তোরণ দ্বার হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। কিন্তু ভিতরের দিকে এটা ৫'-৪" প্রশস্ত। এর উচ্চতা ৭'-৫"। পার্শ্ববর্তী দরজা দুটোও অর্ধ গম্বুজাকৃতিক কাঠামোর মধ্য দিয়ে উন্মুক্ত। এরা ৮'-৬" প্রশস্ত। মসজিদের উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালের মধ্যভাগে একটি করে আয়তাকার গবাক্ষ পথ রয়েছে। এরা " ভি " এর আকৃতি বিশিষ্ট খিলানের মধ্যে নির্মিত।এটা শায়েস্তা খান মসজিদের একটি অভিনব বৈশিষ্ট্য। জানালা দুটো ৪'-৯" x ৩'-৮"।

। বাইরের দিকে এরা অর্ধ গম্বুজাকৃতি বলে এখানকার প্রশস্ততা ৯'-০"। গবাক্ষ পথের দু'পার্শ্বে দুটো করে খিলান বিশিষ্ট কুলঙ্গি আছে।

এই মসজিদের চারি কোনায় চারটি অষ্টকোনাকার বুরুজ রয়েছে। এ ছাড়াও কেন্দ্রীয় গম্বুজের সামনে রয়েছে দুটো অষ্টকোনাকার বুরুজ। বুরুজের সংখ্যা মোট ছয়।

Dhaka University Institutional Repository

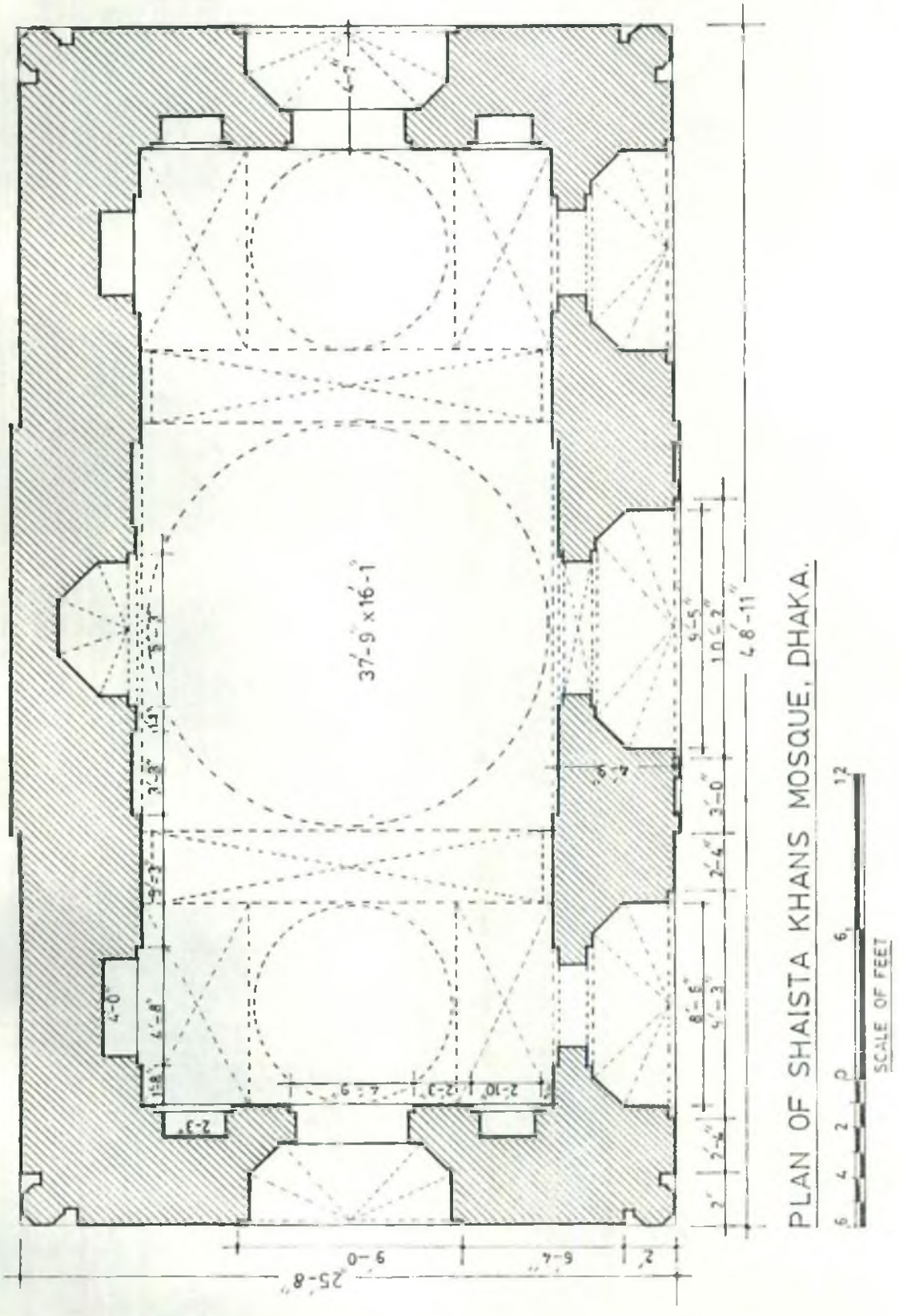

ভূমি নকশা ৩

Dhaka University Institutional Repository

মসজিদের অভ্যন্তর দুটো আড়াঁআঁড়ি খিলানের মাধ্যমে তিনটি আয়তাকার 'বে"(Bay) তে বিভক্ত। কেন্দ্রীয় 'নেভটি' ১৯'-০" প্রশস্ত। এই তিনটি অভ্যন্তরীন 'বে' তিনটি গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত। বর্গক্ষেত্রের কোনাতে পেন্ডেনটিভ নির্মান করে উপরে বৃত্ত গঠন করা হয়েছে। এই বৃত্তের উপর ২'-৮" উঁচু অষ্টকোনাকার ড্রাম নির্মিত হয়েছে। ড্রামের প্রতিটি বাহু ৮'-০" লম্বা। এই অষ্টভুজের উপর ৫৯'-২" পরিধি বিশিষ্ট গম্বুজটি উত্তোলিত। গম্বুজের উচ্চতা প্রায় ১০'-১১"। পার্শ্ববর্তী গম্বুজ দুটো নির্মান করতে একটু ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে। মসজিদের পূর্ব ও পশ্চিম দেয়াল ত্রিভুজাকৃতির খিলানী কাঠামোর উপরে বর্ধিত করে বর্গক্ষেত্র গঠন করা হয়েছে। বর্গ ক্ষেত্রের কোনাতে পেনডেনটিভ নির্মান করে উত্তরণ স্থল পুরে দেয়া হয়েছে। এভাবে একটি বৃত্তাকার কাঠামো তৈরী করা হয়েছে। এই কাঠামোর উপর ২'-৮" উঁচুতে একটি অষ্টকোনাকার পিপা নির্মিত হয়েছে। পিপার প্রতিটি বাহু প্রায় ৪'-০" লম্বা। এভাবে গম্বুজের ভিত্তিমূলের পরিধি দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩০'-০"। এই গম্বুজ দুটোর প্রতিটি প্রায় ৬'-৭" উঁচু।

এই মসজিদের একটা অভিনব বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে তিনটি দরজা এবং তিনটি কুঠরী থাকা সত্বেও এখানে দরজা বা কুঠরীর সাথে সঙ্গতি রেখে মিহরাব নির্মিত হয়নি বরং কেন্দ্রীয় নেভ নির্দেশ করে পশ্চাৎ দেয়ালে একটি মিহরাব নির্মান করা হয়েছে। এটা ৫'-৩" প্রশস্ত এবং ৭'-৫" উঁচু। মিহরাবটি আয়তাকার কাঠামোর মধ্যে নির্মিত হলেও ইহা একটি অর্ধ অষ্টভুজ। এই অষ্টভুজে তিনটি ভোয়া লক্ষ্য করা যায়। মধ্যবর্তী ভোয়াটি পুষ্প শোভিত। এই মিহরাবের ডান ও বাম পার্শ্বে খিলান বিশিষ্ট কুলঙ্গি রয়েছে। ঢাকা নগরীর প্রাচীন মসজিদ গুলিতে মিম্বরের অস্তিত্ব খুব কমই অনুভূত হয়। শায়েস্তা খানের মসজিদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে তিন ধাপ বিশিষ্ট একটি মিম্বর নির্মান করা হয়েছে।

উপরোক্ত আলোচনা হতে বুঝা যায় যে, যে সব বৈশিষ্ট্যকে শায়েস্তা খানী স্থাপত্যের শিল্পরীতি বলে মনে করা হয় তাদের অধিকাংশ বৈশিষ্ট্যই এই মসজিদে লক্ষ্য করা যায়। যেমন- মসজিদের চার কোনায় চারটি অষ্ট কোনাকার বুরুজ, সামনে তিনটি প্রবেশ পথ, মধ্যবর্তী প্রবেশ পথটি পার্শ্ববর্তী দরজা দুটো হতে অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর, অর্ধ গম্বুজের নীচ দিয়ে উন্মুক্ত তিনটি প্রবেশ পথ, তিন আইল গভীর কিবলা কোঠা, তিনটি আইলের উপর নির্মিত তিনটি গম্বুজ, মধ্যবর্তী গম্বুজটি পার্শ্ববর্তী গম্বুজ দুয়ের চেয়ে আকারে বৃহত্তর ইত্যাদি। এসব কারণে হাসান দানীর মত গ্রহণযোগ্য নয়।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১. K.B. Sayed Aulad Hasan, Notes on the Antiquities of Dacca. (1904), p.22.

২. মুন্সী রহমান আলী তায়েশ, 'তাওয়ারিখ-ই-ঢাকা" অনূদিত ডঃ আঃ মঃ মঃ শরফুদ্দীন, (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ - ১৯৮৫), পৃ-১৯১।

৩. Sir Charles 'D' Oyly, Antiquities of Dacca, (Published by John Landseer, London N.D.), p. 10.

৪. K.B. Sayed Aulad Hasan, op.cit., p. 22.

৫. Dr. Ahmed Hasan Dani, Dacca A Record of Its Changing Fortunes. (Asiatic Press, Dacca, 1962), p. 202.

৬. মুন্সী রহমান আলী তায়েশ, প্রাগুক্ত পৃ. ১৯২।

৭. K.B. Sayed Aulad Hasan, op.cit., p. 22.

৮. Dr. Ahmed Hasan Dani, Dacca A Record, op.cit., p. 202.

৯. Ibid.

Dhaka University Institutional Repository

১. নওয়াব শায়েস্তা খানের মসজিদ / তিন গম্বুজ ও মিনার (১৬৬৪-৭৭ খ্রীঃ)

২. নওয়াব শায়েস্তা খানের মসজিদ / প্রধান প্রবেশ পথ

Dhaka University Institutional Repository

৩. নওয়াব শায়েস্তা খানের মসজিদ / প্রধান মিহরাব ও মিম্বর ।

Dhaka University Institutional Repository

চক মসজিদ

চক মসজিদের আদী রূপ এখন আর প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নয়। মসজিদটি নওয়াব আমীর-উম-উমারা শায়েস্তা খান কর্তৃক ১৬৭৬ খ্রীষ্টাব্দ / ১০৮৩ হিজরীতে নির্মিত হয়েছিল। ডঃ আহম্মদ হাসান দানী,[১] ডঃ সৈয়দ মাহমুদুল হাসান[২] ও আ.ক.ম. যাকারিয়া র মতে আদী সত্তায় এই মসজিদটি ছিল দৈর্ঘ্যে ৫৩'-০" এবং প্রস্থে ২৬'-০"। অথচ কে. বি. সৈয়দ আওলাদ হাসান[৪] ও মুন্সী রহমান আলী তায়েশ[৫] বলেছেন যে আদীতে এর বাইরের পরিমাপ ছিল ৫০'X২৫"। এবং অভ্যন্তরীন পরিমাপ ছিল ৪২'-৬" X ১৯'-৩"। (ভূমি নকশা- ৪) আমাদের মতে শেষোক্ত পরিমাপটি যুক্তিযুক্ত, কেননা তাঁরা হয়ত মসজিদটি সুচোখে দেখেছিলেন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংস্করণ ও পরিবর্ধনের ফলে এর বর্তমানে ১৪'-৮" আয়তনে দাঁড়িয়েছে বলে অনেকে বলেছেন। এই পরিমাপ সঠিক নয়, কেননা বারান্দার প্রশস্ততা বাদ দিলে বর্তমানে মসজিদটির আয়তন হবে দৈর্ঘ্যে ১২'-৭" এবং প্রস্থে ২৪'-০"।

এই মসজিদটি ১০' ফুট উচ্চ একটি মঞ্চের উপর নির্মিত হয়েছে। মঞ্চের নীচে রয়েছে কক্ষ যা দোকানীদের উদ্দেশ্যে ভাড়া দেয়া হয়েছে, এই ভাড়া হতে অর্জিত টাকায় মসজিদটি সংস্কারের ও সংরক্ষণের ব্যয় বরাদ্দ করা হয়। উপরন্তু এই ভাড়া হতে লব্ধ অর্থ মসজিদের মোতায়াল্লী ও তত্ত্বাবধায়কদের কে মসজিদের পূর্ব ও উত্তর দিকে এর সম্প্রসারণ ঘটাতে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে।[৬] ফল এ দাঁড়াচ্ছে যে পূর্ব ও উত্তর দিকে দৈর্ঘ্যে অতিরিক্ত ৪৪' এবং প্রস্থে অতিরিক্ত ৫৫' মূল মসজিদের সাথে যোগ হয়েছে।

চক শাহী মসজিদ মূলতঃ তিনটি আইলে বিভক্ত ছিল/ দক্ষিণ দিকের আইলটি ৩৪'-৪" দৈর্ঘ্য ও ২৪'-০" প্রস্থ। উত্তর দিকের আইলটি ৩০'-৩$\frac{১}{২}$" দৈর্ঘ্যে এবং ২৪'-০" প্রস্থ, কেন্দ্রীয় নেভটি ২৭'-১০" দৈর্ঘ্য এবং ২৪'-০" প্রস্থ। স্পষ্টতই কেন্দ্রীয় আইলের পার্শ্ববর্তী দুইটি আইলের মধ্যে অনুপাত সংরক্ষিত হয়নি : দক্ষিণ দিকের আইলটি উত্তর দিকের আইলের চেয়ে ৪'-০" বেশী প্রশস্ততর।

Dhaka University Institutional Repository

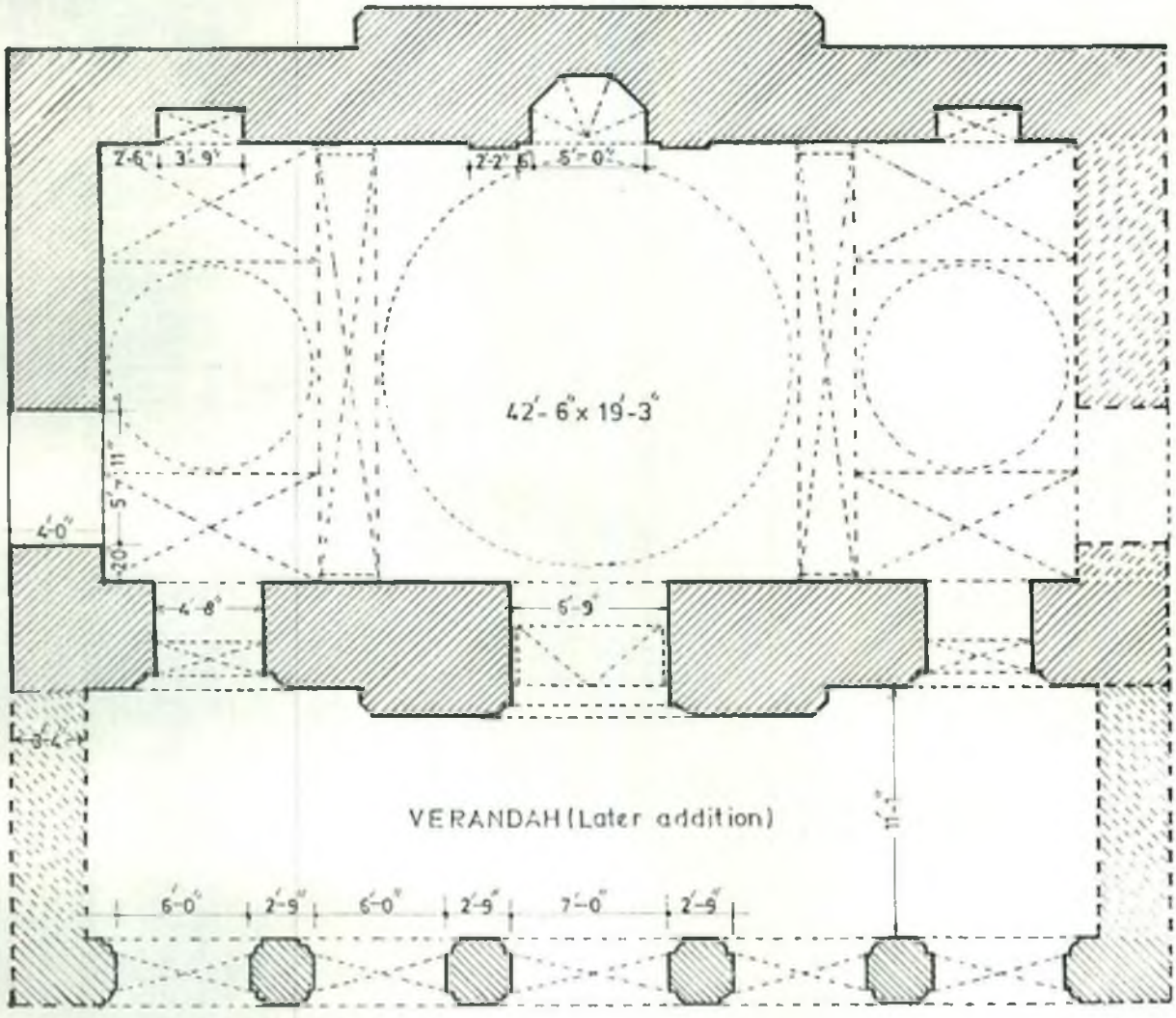

FIRST FLOOR PLAN (Original), CHAUK MASJID, DHAKA.

ভূমি নকশা ৪

Dhaka University Institutional Repository

চক শাহী মসজিদের তিনটি আইল তিনটি গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। গম্বুজগুলি গোলকবৎ। উত্তর ও দক্ষিণ দিকের গম্বুজ দুটো ৩'-৩" উচু অষ্ট ভূজাকার পিপার উপর নির্মিত আর কেন্দ্রীয় গম্বুজটি নির্মিত হয়েছে ৪'-০" উচু পিপার উপর। কেন্দ্রীয় গম্বুজের পরিধি হলো ৮০'-০", আর পার্শ্ববর্তী গম্বুজদ্বয়ের পরিধি কম বেশী ৭৪'-০"। মসজিদের অভ্যন্তরে আলো প্রবেশ করার নিমিত্ত তিনটি গম্বুজে তিনটি জানালা নির্মান করা হয়েছে। চক শাহী মসজিদের ইহা একটি অসাধারণ বৈশিষ্ট্য, কেননা অন্য কোন মসজিদের গম্বুজের ক্ষেত্রে এরূপটি আর দেখা যায় না।

মূল মসজিদে তিনটি দরজা ছিল। বস্তুতঃ পক্ষে প্রতিটি আইলের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে এই দরজাগুলো নির্মান করা হয়েছিল। বর্তমানে কাসাদে ৭টি দরজা লক্ষ্য করা যায়। কেন্দ্রীয় দরজাটি ৭'- ১০$\frac{১}{২}$" আর পার্শ্ববর্তী দরজাগুলো ৫'-১১"। এ ছাড়াও মসজিদের উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে দুটো করে মোট ৪টি দরজা রয়েছে। এ সমস্ত দরজা পথের উপর Tracery লক্ষ্য করা যায়। কিবলা দেয়ালে দুটো দরজা নির্মিত হয়েছে। অধুনা এগুলো বন্ধ। ঢাকার মসজিদের কিবলা দেয়ালে কোন যামেই এরূপ দরজা দৃষ্টি-গোচর হয় না।

চক বাজার ঢাকার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ছিল। এ জন্যই চক মসজিদটি ঢাকার জন-জীবনে সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছিল। এর নিকটেই ছিল সুবাদারের সরকারী বাসভবন। ফলে এর নাম হয়েছিল বাদশাহী বাজার। বণিক সম্প্রদায় ও বিভিন্ন পেশাজিবী জনগণের পদধ্বনিতে এই স্থানটি প্রায় সব সময়ই সড়গরম থাকত। তাদের রাজনৈতিক, আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের স্নায়ুকেন্দ্র ছিল এই মসজিদ। মসজিদটি শিক্ষা ক্ষেত্র হিসেবেও প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। উলেমা সম্প্রদায় এখানে বিরাট জনসমাবেশে কোরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা দিতেন। এর পার্শ্বে অনেক ধর্মীয় গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছিল। পরবর্তীকালে ক্রমবর্ধ-মান জনসংখ্যার চাপে মসজিদের সম্প্রসারণ অপরিহার্য্য হয়ে পড়ে। সংস্কার ও সম্প্রসার-ণের কাজ মাত্রাতিরিক্ত হয়েছে বলে আজ এর নূতন অবয়ব হতে পুরাতন মসজিদটি সনাক্ত করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১. A.H. Dani, Dacca A Record of Its Changing Fortunes, (The Saogat Press, Dacca, 1956), p. 190.

২. Dr. Sayed Mahmudul Hasan, Ancient Monuments of East Pakistan (Pakistan Academy, 1970) p. 117.

৩. আঃকঃমঃ যাকারিয়া, বাংলাদেশের প্রত্ন সম্পদ, (বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৮৪), পৃ. ৪৪৭।

৪. K.B. Sayed Aulad Hasan, Notes On The Antiquities of Dacca, (1904), p. 17.

৫. মুন্সী রহমান আলী তায়েশ, তাওয়ারিখ-ই-ঢাকা, অনূদিত ডঃ আঃমঃমঃ শরফুদ্দীন (ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ১৯৮৫), পৃ. ১৯৬।

৬. Dr. Ahmad Hasan Dani, op.cit., p. 190.

Dhaka University Institutional Repository

১. চক মসজিদ / তিন গম্বুজ ও গম্বুজের জানালা (১৬৭৬ খ্রীঃ)

২. চক মসজিদ প্রধান প্রবেশ পথের উপরাংশ ।

Dhaka University Institutional Repository

৩. চক মসজিদ, প্রধান প্রবেশ পথ ও মিহরাব ।

Dhaka University Institutional Repository

কারতালাব খান মসজিদ

মুরশীদ কুলী খান প্রথম জীবনে মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্গত দাক্ষিণাত্যের বেরার প্রদেশের দিউয়ান ছিলেন। সম্রাট আওরঙ্গজেব ১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে বেরার হতে হায়দরাবাদের দিউয়ান পদে উন্নীত করেন। রাজস্ব প্রশাসনে তাঁর দক্ষতার জন্য সম্রাট আওরঙ্গজেব তাঁকে কারতালাব খান Kartalab Khan উপাধিতে ভূষিত করেন।[১] একই কারণে সম্রাট ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ সুবা বাংলার দিউয়ান পদে নিয়োগ করেন। একই সঙ্গে তিনি মুখসুদাবাদের ফৌজদার পদের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন।[২] ধীশক্তি সম্পন্ন এই সুবাদার ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দ[৩] মতানুসারে ১৭০১ খ্রীষ্টাব্দ হতে ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজধানী জাহাঙ্গীর নগরে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি প্রাচীন সামরিক ছাউনী, টাকশাল এবং বর্তমান জেলখানার নিকট বেগম বাজার সড়কে একটি মসজিদ নির্মান করেন। এর দুটো নাম রয়েছে, 'তাওয়ারিখ-ই-ঢাকা'তে মুন্সী রহমান আলী তায়েশ এটিকে বলেছেন 'বেগম বাজার কি মসজিদ'[৪] কিন্তু জনসাধারণ একে কারতালাব খানের মসজিদ হিসেবেই জানে। এর নির্মানকাল ১৭০০-১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দ[৫]।

কারতালাব খানের মসজিদটি ১০'-৬" উঁচু একটি মঞ্চের উপর দণ্ডায়মান।[৬] এর নিম্নসুত্রে বহু সংখ্যক খিলান বিশিষ্ট কক্ষ রয়েছে। এগুলো এখন দোকান ও বাস গৃহ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।[৭] আকৃতিগত বৈশিষ্ট্যে এটা ঢাকার দীর্ঘতম মসজিদ সমূহের অন্যতম। সৈয়দ মোহাম্মদ তাইফুরের মতে "এই অপূর্ব চিত্র সদৃশ ইমারত ঢাকার দ্বিতীয় বৃহত্তম মসজিদ।"[৮] তাই "এত বড় মসজিদ ঢাকাতে আর নেই" বলে শ্রী যতীন্দ্র মোহন রায় যে মন্তব্য করেছেন তা সত্য নয়,[৯] তবে তাঁর পক্ষে একটি কথা বলার আছে।

ফররুখশিয়রের লালবাগ শাহী মসজিদটিকে যে অসম্পূর্ণ অবস্থায় ফেলে রাখা হয়েছিল তার সংগে তুলনা করে বলা যায় যে বেগম বাজার মসজিদ অবশ্যই বৃহত্তম।[১০]

Dhaka University Institutional Repository

বাহ্যিক ক্ষেত্রে এ মসজিদটি ১৩'-১" দৈর্ঘ্য এবং ২৬'-১" প্রস্থ এলাকা নিয়ে নির্মিত। (তুমি নকশা-৫)। আভ্যন্তরীন ক্ষেত্রে এর দৈর্ঘ্য ৮৪'-০" এবং প্রস্থ ১৭'-২"। প্রসস্থতার ক্ষেত্রে মসজিদটি দু'টি অংশে বিভক্ত। এর কিবলাকোঠা অর্থাৎ মূল মসজিদ প্রায় ১৭'-২" প্রসস্থ। মসজিদের দেয়াল প্রায় ৪'-০" পুরু। মূল মসজিদের সামনে একটি ১৩'-১" দৈর্ঘ্য এবং ১১'-১" প্রস্থ অংশ সংযুক্ত করা হয়েছে। পূর্ব দিকে একটি সিঁড়ির সাহায্যে মসজিদে প্রবেশ করা যায়।

মসজিদের সম্মুখবর্তী ফাসাদ বেশ আকর্ষণীয়, এতে পাঁচটি বৃহৎ খিলান বিশিষ্ট প্রবেশ পথ লক্ষ্য করা যায়, প্রতিটি প্রবেশ পথ অর্ধ গম্বুজের নীচে অবস্থিত। এটা হতে সরু মিনার উরুর (thigh) মত ঈষৎ ফেঁপে বের হচ্ছে। মিনারেট গুলোর শীর্ষদেশ ফোঁকর বিশিষ্ট অলংকৃত ক্ষুদ্র দেয়াল-এর উপর পর্যন্ত পৌঁছেছে। প্রতিটি প্রবেশপথ আয়তাকার কাঠামোর মধ্যে সংস্থাপিত। মুঘল যুগের অধিকাংশ মসজিদের ন্যায় ফাসাদের কেন্দ্রীয় খিলান পথ অধিকতর গুরুত্ব পেয়েছে। উমাইয়া খলিফা ওয়ালিদ ইবন আবদুল মালিক দামেস্কের মসজিদ-ই-জামী নির্মান করেছিলেন। এর চার কোনায় চারটি সংযুক্ত বুরুজ এই মসজিদের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।[১১] কারতালাব খান মসজিদে ঠিক একইরূপ প্রক্রিয়ায় চার কোনায় চারটি সংযুক্ত বুরুজ নির্মিত হয়েছে। বাংলার স্থাপত্য শিল্পের ইতিহাসে সর্বপ্রথম এই বৈশিষ্ট্যটি লক্ষ্য করা যায় হযরত পাণ্ডুয়ার আদীনা মসজিদে।[১২] তবে দামাস্কাস ও আদীনা মসজিদের বুরুজের সাথে কারতালাব খান মসজিদের বুরুজের পার্থক্য এই যে প্রথমোক্ত মসজিদ দুয়ে এরা বপ্রদেয়াল (parapet) পর্যন্ত পৌঁছেছে; কিন্তু শেষোক্ত মসজিদের ক্ষেত্রে এরা বপ্র দেয়ালের উপরে উঠে গেছে। এদের শীর্ষে আছে কিয়স্ক।[১৩] ফাসাদের দু' বুরুজের মধ্যবর্তী স্থানে সংযুক্তসুক্ত ও আয়তাকার শিল্পা লক্ষ্য করা যায়।

আভ্যন্তরীন কিবলা কোঠা পাঁচটি আইলে বিভক্ত। কেন্দ্রীয় নেভ (Nave) বা আইলটি ২০'-২" প্রসস্থ। কেন্দ্রীয় 'নেভ' এর পার্শ্ববর্তী বে' (Bay) প্রায় ১৬'-১" প্রসস্থ, কিন্তু সর্ব দক্ষিণ ও সর্বোত্তর 'বে' দুটি ১৫'-০" প্রসস্থ। স্পষ্টতই কোঠার নির্মান

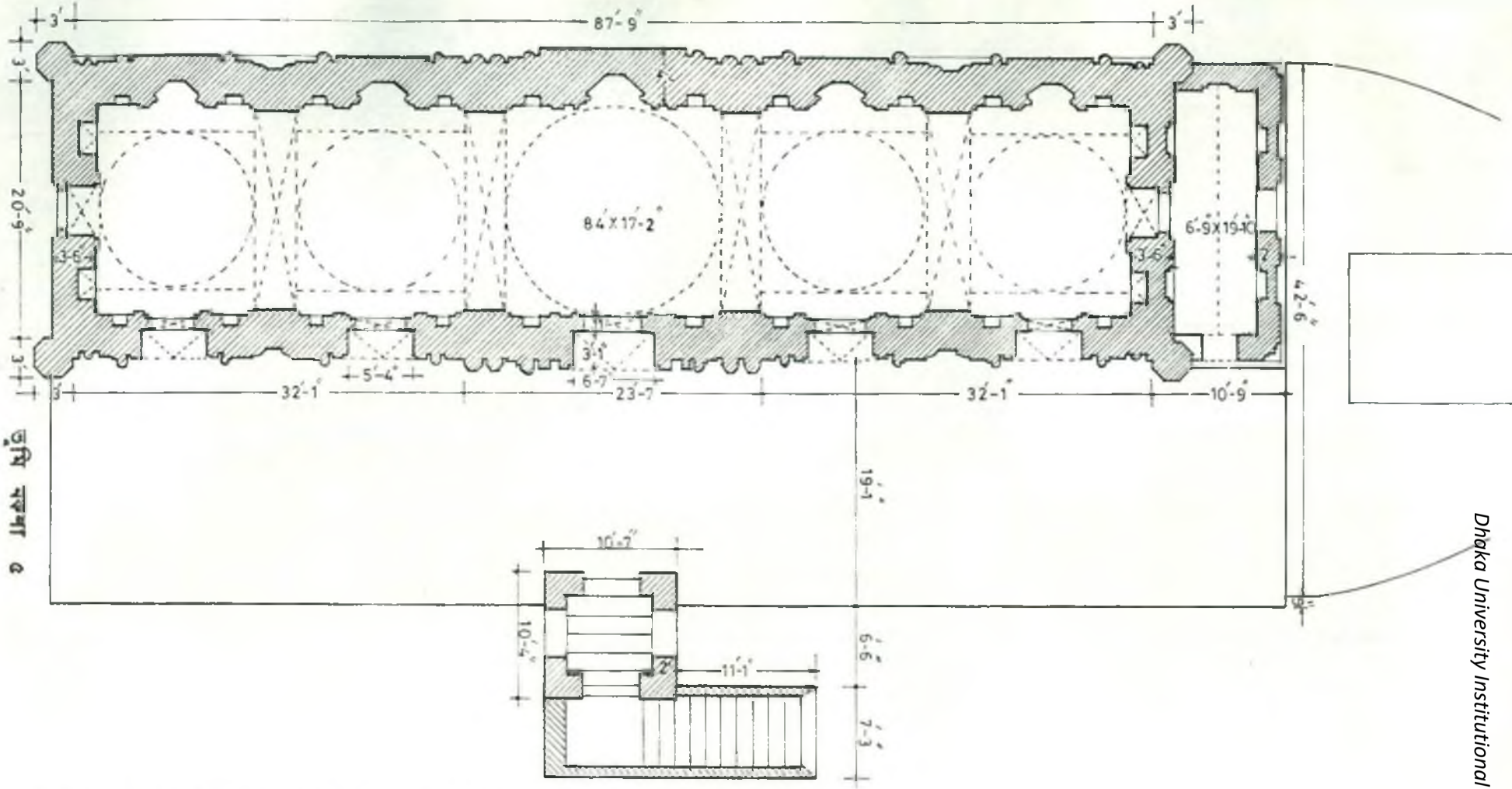

FIRST FLOOR PLAN OF KARTALAB KHAN'S MOSQUE, DHAKA.

12 9 6 3 0 12 24

SCALE OF FEET

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

পরিকল্পনায় এদের মধ্যে আনুপাতিক সামঞ্জস্য রক্ষা করা হয়েছে । সর্বোত্তর ও সর্ব দক্ষিণ 'বে' দুটি প্রায় একই মাপের আর কেন্দ্রীয় 'নেভ' এর উভয় পার্শ্বস্থ দুটোও সম আয়তন বিশিষ্ট , কেবল মাত্র কেন্দ্রীয় নেভটি প্রশস্ততম ।

আভ্যন্তরীন পাঁচটি 'বে' পাঁচটি গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত । গম্বুজগুলো প্রায় ৪'-৪" উঁচু অর্ধ কোনাকার পিপার উপর নির্মিত, কেন্দ্রীয় গম্বুজটি বৃহত্তম , এর ব্যাস প্রায় ৭০'-০" । এর দু' পার্শ্বে দুটি করে যে চারটি গম্বুজ রয়েছে তারা আকারে কেন্দ্রীয় গম্বুজের চেয়ে ক্ষুদ্রতর । তবে প্রতিটির ব্যাস ৫৬'-০" বলে এরা সমান আকার বিশিষ্ট । পশ্চিম দেয়ালে রয়েছে পাঁচটি মিহরাব । কেন্দ্রীয় মিহরাবটি ৬'-৫" উচ্চতা এবং ৪'-৬" প্রস্থ বিশিষ্ট । কেন্দ্রীয় মিহরাবের পার্শ্ববর্তী মিহরাবগুলি ৬'-৩" উচু এবং ৩'-১০" প্রশস্ত । এরূপে পূর্ব দেয়ালে পাঁচটি প্রবেশ পথ । মধ্যবর্তী প্রবেশ পথটি ৬'-৭" প্রশস্ত । কেন্দ্রীয় প্রবেশ পথের দু' পার্শ্বের চারটি প্রবেশ পথ ৫'-৪"করে প্রশস্ত এভাবে আভ্যন্তরীন ছাদে পাঁচটি গম্বুজ মসজিদটিকে একটি সংহতিপূর্ণ ও ঐক্যতানিক সুষমসম্পূর্ণতা দান করেছে এবং এর গাম্ভীর্য রক্ষা করতে যথেষ্ট পরিমানে সাহায্য করছে ।[১৪] বস্তুত পক্ষে কারতালাব খান মসজিদে এই সামঞ্জস্যপূর্ণ অনুপাতিক ব্যবহার এর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ।

কারতালাব খান মসজিদের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে একটি করে জানালা নির্মিত হয়েছে । এই জানালাগুলি চারি কেন্দ্রীক ছুঁচালো খিলানের আকৃতিতে নির্মিত । এদেরকে আয়তাকার কাঠামোর মধ্যে নির্মান করা হয়েছে, এর উপরে রয়েছে অন্ধ মার্লন । জানালার দু' পার্শ্বে একটি করে দুটো চার কেন্দ্রীক খিলান বিশিষ্ট কুলঙ্গি রয়েছে ।

কারতালাব খান মসজিদের অলংকরণ প্রশংসনীয় । এ সকল অলংকরণের মধ্যে রয়েছে সম্মুখস্থ দরজাগুলির আয়তাকার প্যানেল । ইমারতের সার্বিক অলংকরনে পদ্ম পাঁপড়ি একটি তাৎপর্যপূর্ণ স্থান অধিকার করে নিচ্ছে । ছাদে অবস্থিত বপ্র দেয়ালে (Parapet), পাঁচটি প্রবেশ পথের উপরে জানালার উপরে, পাঁচটি মিহরাবের আয়তাকার কাঠামোতে এবং প্রতিটি গম্বুজের পিপার শীর্ষে এরূপ পদ্ম পাঁপড়ি পরিশোভিত হচ্ছে । কেন্দ্রীয় প্রবেশ পথের আয়তাকার কাঠামোর উপর পদ্ম পাঁপড়ি দ্বারা আয়তাকার সুন্দর প্যানেল এবং কেন্দ্রীয় গম্বুজের পিপার অভ্যন্তরভাগ সূক্ষ্মাগ্র খিলান দ্বারা অলংকৃত হয়েছে ।

Dhaka University Institutional Repository

কেন্দ্রীয় গম্বুজের অষ্টভুজের কোনার বিন্দুতে এই খিলান সমূহ গভীরতর। এর পার্শ্ববর্তী গম্বুজ দুইটির পিপাতে বহু সূক্ষ্মাগ্র বিশিষ্ট ক্ষুদ্রতর খিলান রয়েছে। এদের দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বের গম্বুজের পিপাগুলি সাধারণ খিলানী কাঠামো দ্বারা সজ্জিত। কিবলা দেয়ালের পশ্চাৎ পার্শ্বে চার জোড়া বুরুজের উপর আটটি, উত্তর দিকস্থ দোচালার উপর চারটি, কৌনিক বুরুজে দু'টি করে আটটি এবং পাঁচটি গম্বুজের উপর পাঁচটি কিনিয়াল (finial) শোভা পাচ্ছে। পার্শ্ববর্তী গম্বুজের উপরস্থ কিনিয়ালটি দুইটি কলস সহযোগে নির্মিত, কলসের উপর রয়েছে পদ্ম পাঁপড়ি। প্রধান গম্বুজের কিনিয়ালের শীর্ষ দেশে রয়েছে একটি মাত্র কলস এবং একটি পদ্ম পাঁপড়ি।

কিবলা দেয়ালে পাঁচটি মিহরাব রয়েছে। আকৃতিতে এরা অর্ধ অষ্টভুজ, এদেরকে আয়তাকার কাঠামোর মধ্যে নির্মান করা হয়েছে। অষ্টভুজের উপর যে খিলান বিশিষ্ট কাঠামো রয়েছে তার বাঁক দুটো অনেকটা দ্বি খিলানাকৃতির। এর উপরস্থ খিলানটিতে কাস্প (cusped) বিশিষ্ট অলংকরণ রয়েছে। ভিতরের খিলানের বাঁক সরল। খিলানের চূড়াতে চমৎকার ফুল পাঁপড়ি শোভা পাচ্ছে, আর স্পানড্রিল দুটোতে রয়েছে একটি করে দুটো তালপত্র অলংকরণ। এর উপরের সম্প্রসারিত অংশে পুষ্প অলংকরণ রয়েছে। এখানে পলেস্তেরা কেটে ফুল, লতাপাতা ও জ্যামিতিক অলংকরণ করা হয়েছে। অর্ধ অষ্টভুজটি ইন্‌গ্রেইল্ড খিলান মটিফ দ্বারা অলংকৃত। এই মটিফের অভ্যন্তরে রয়েছে সবুজ রং এর অলংকরণ যাকে ঘিরে রয়েছে লাল রং এর অলংকরণ। সরল খিলানের বাঁক সংযুক্তপলকাটা সুস্ত দ্বারা বাহিত। গোটা মিহরাবটি একটি খিলানী কাঠামোর মধ্যে ধরে রাখা হয়েছে। অন্যান্য মিহরাবগুলি কম-বেশী কেন্দ্রীয় মিহরাবের খিলানের অনুরূপ। একটি ব্যতিক্রম অবশ্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে অবশিষ্ট চারটি খিলানের ক্ষেত্রে, কেননা এদের স্পানড্রিল এ দুটি করে তালপত্র অলংকরণ (পামেট) রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

কারতালাব খান মসজিদের উত্তর পূর্ব দিকে একটি ওয়াত, বাউলী বা সিঁড়ি বিশিষ্ট ইন্দারা বা কূপ ছিল । ডঃ নাজিম উদ্দিন আহমেদ মন্তব্য করেন যে এই মসজিদ নির্মানের পূর্বে এখানে একটি ইন্দারা ছিল, এবং একেই কেন্দ্র করে মসজিদটি নির্মিত হয় ।[১৫]

এতে দুটি ধারনার উৎপত্তি হয় । প্রথমতঃ, এই মসজিদটি নির্মানের পূর্বে এই সিঁড়ি বিশিষ্ট বাউলী নির্মিত হয়েছিল । দ্বিতীয়তঃ, এই ইন্দারা করতালাব খানকে এই স্থানে মসজিদটি নির্মান করতে অনুপ্রানিত করেছিল । কিন্তু প্রকৃত ব্যাপারটি সম্পূর্ণরূপে আলাদা । বস্তুত পক্ষে মসজিদ নির্মানের পরে মুসল্লিদের অজুর পানি যোগানের তাগিদেই তিনি এই ওয়াতটি নির্মান করেছিলেন । বাংলাদেশের স্থাপত্য শিল্পের ইতিহাসে এই সিঁড়ি বিশিষ্ট কূপ একটি একক ও অনন্য বৈশিষ্ট্য।[১৬] আমরা এই কূপের স্থাপত্যিক গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারিনি বলে এর অস্তিত্ব এখন বিলীন হয়ে গিয়েছে ।

ডঃ আহামদ হাসান দানীর মতে "মসজিদটি একটি নূতন পদ্ধতির দৃষ্টান্ত পেশ করে ।[১৭] এই নূতন পদ্ধতির একটি ধারা হল ইহা একটি উত্তোলিত মঞ্চের উপর নির্মিত। এর নীচে রয়েছে কিছু সংখ্যক খিলান বিশিষ্ট কক্ষ । বর্তমানে এই কক্ষ সমূহ দোকান ও অন্যান্য লোকের বসবাসের ব্যবস্থা রয়েছে ।[১৮] ডঃ মাহমুদুল হাসান এই উন্নত মঞ্চকে বলেছেন তাহখানা ।[১৯] বস্তুতপক্ষে স্থাপত্য শিল্পের ইতিহাসে এই বৈশিষ্ট্যটি নূতন নয়। ভারতীয় স্থাপত্য শিল্পে এই প্রকল্পটি সম্ভবত প্রাগৈতিহাসিক । চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ও পরবর্তীকালে জেম্‌স ফারগুসনের বর্ণনা মোতাবেক এই সত্যটি প্রমানিত হয় । এর প্রাচীনতম বিকাশ ঘটে দাক্ষিণাত্যের হিন্দু মঠ, বৌদ্ধ বিহার বা সংঘরামে । ফা-হিয়েন একটি ইমারতের কথা উল্লেখ করেছেন যাতে ৫০০ শত প্রস্তর প্রকোষ্ঠ ছিল ।[২০] জেম্‌স ফারগুসন প্রাচীন মহাবেল্লীপুরম তথা আধুনিক মমল্লা পুরামে নির্মিত একটি প্যাগোডাতে এই বৈশিষ্ট্যটি বিদ্যমান দেখেছেন ।[২১] পরবর্তী পর্যায়ে বৌদ্ধ বিহার, জৌন মন্দির ও হিন্দু মঠে এই সব বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় । স্যার জন মার্শাল এই সব হিন্দু বৈশিষ্ট্যকে হিন্দু "সেল" বা হিন্দু 'কেত" বলে চিহ্নিত করেছেন ।[২২] মুসলিম স্থাপত্য শিল্পেও এই বৈশিষ্ট্যটি লক্ষ্য করা যাচ্ছে ।

Dhaka University Institutional Repository

এই বৈশিষ্ট্যটির সার্থক প্রয়োগ হয় তোঘলক স্থাপত্যে । সতীশ গ্রোভারের মতে "তোঘলক মসজিদের আঁক বৃদ্ধিতে যে সব নক্শা ও কৌশল কাজ করেছিল তার একটি হলো এই সব মসজিদের সাহন সাধারণত এমন একটি মঞ্চ বা ভীতের উপর নির্মান করা হত যা প্রায়ই মাটির সুরের উপর ১২'-০" ফুটের বেশী উত্তোলিত ছিল ।[২৩] কালান মসজিদ[২৪] এর একটি প্রকৃষ্টতম উদাহরণ । বাংলার স্থাপত্য শিল্পে এর সাক্ষাৎ মিলবে গৌড়ের শাহনেয়ামত উল্লাহ অলীর মাজারে ।[২৫] ঢাকার স্থাপত্যে এই বৈশিষ্ট্যটি অনুসৃত হয়েছে নওয়াব শায়েস্তা খান কর্তৃক ১৬৭৬ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত চক মসজিদে[২৬] এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে নির্মিত 'বাগ-ই-মুসা খান" মসজিদে ।[২৭] এরা কারতালাব খান মসজিদের সাক্ষাৎ পূর্বসূরী । ঠিক এই পরিকল্পনাটি অনুসৃত হয়েছে ১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত আতীশ খানায় খান মোহাম্মদ মৃধার মসজিদে ।[২৮]

কিন্তু কারতালাব খান মসজিদে এই সব খিলান বিশিষ্ট কক্ষে একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে । নিম্নস্থ এই প্রকোষ্টগুলি মাদ্রাসা বা ধর্ম তাত্ত্বিক বিদ্যাপিঠ হিসাবে ব্যবহৃত হতো । কারতালাব খান মুর্শিদাবাদে ১৭২৪-৫ খ্রীষ্টাব্দে যে কাটরা মসজিদ নির্মান করেন তাতে এই ধরণের যে প্রকোষ্ট ছিল তা মাদ্রাসা হিসেবেই ব্যবহৃত হয়েছিল ।[২৯]

বেগম বাজার মসজিদে কোন সাহান বা চত্বর ছিলনা । এই উপাদানের অনুপস্থিতি দৃষ্টিকটু বলে অনেকের ধারণা, কেননা ইসলামী মসজিদ স্থাপত্য শিল্পে এটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ; হিন্দু স্থাপত্য শিল্পেও এই বৈশিষ্ট্যটি অনেকটা অত্যাবশ্যকীয় । তবে মসজিদে এটা যে একেবারেই অত্যাবশ্যকীয় এরূপ মনে করার কোন সঙ্গত কারণ নেই, কেননা এই উপাদানের অনুপস্থিতি কতিপয় বিশ্ব বিখ্যাত মসজিদেও লক্ষ্য করা যায় । ৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে আমর ইবন আল-আস কর্তৃক নির্মিত ফুসতাতের মসজিদ-ই-জামী,[৩০] কর্ডোভার মসজিদে জামী,[৩১] যা পাশ্চাত্যে ইসলামের কাবা হিসেবে পরিচিত[৩২] এবং গুলবর্গার মসজিদ-ই-জামীতে[৩৩] ও এই বৈশিষ্ট্যটি ছিল না । তবে কারতালাব খান মসজিদে সম্ভবতঃ প্রয়োজনের তাগিদেই এই উপাদানটি বিশেষ কোন গুরুত্ববহ ছিলনা । এর অবশ্য দুটো কারণ রয়েছে, প্রথম এই মসজিদটি শহরের অন্যতম প্রধান জনাকীর্ণ অঞ্চলে চৌরাস্তার ধারে নির্মিত বলে এটা উত্তোলিত মঞ্চের উপর অবস্থান করছে । তাই উপর তলা রাস্তার কর্মকোলাহল ও

Dhaka University Institutional Repository

হট্টোগোল হতে ছিল প্রায় সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। কাজেই মুসল্লীদের কার্যকরী ও সুখপ্রদ প্রার্থনার জন্য এই পরিবেশ ছিল উপযোগী। দ্বিতীয় কারণটি ছিল ভৌগোলিক। বাংলাদেশে এপ্রিল হতে আগষ্ট মাস পর্যন্ত সূর্য রশ্মি হতে উদ্ভূত তাপ ও উষ্ণতা এদেশের মসজিদে প্রার্থনা-কারীদের পক্ষে যন্ত্রনাদায়ক ও বিরক্তিকর ছিল। আবার অন্যদিকে এ সময়কার কাল বৈশাখীর ঝড়ো হাওয়া, ও আশ্বিনা ঝড় এবং মুষলধারে বৃষ্টি মুসল্লিদের জন্য অসুস্থিকর পরিবেশ সৃষ্টি করতো। সম্ভবতঃ এই আবহাওয়াগত কারণেই বাংলাদেশের মসজিদ স্থাপত্যে এই উপাদানের প্রয়োজনবোধ হয়নি।[৩৪] যদিও হযরত পাণ্ডুয়ার আদীনা মসজিদে এর উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম দেখা যায়।

কারতালাব খান মসজিদের একটি বৈশিষ্ট্য হল দোচালা কুঁড়ে ছাদ আচ্ছাদিত একটি কুঠরী। এই কুঠরীটি মসজিদের উত্তর পার্শ্বে অবস্থিত। ঢাকার স্থাপত্যে ইহা একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। এই কুঠরির ঝুঁকে পড়া বাঁকানো এবং পতনোন্মুখ ছাদ সবচেয়ে আকর্ষণীয়। এই কুঠরিটিকে মিঃ আর. ডি. ব্যানার্জী ইমাম সাহেবের কবরস্থান হিসেবে বর্ণনা করেছেন।[৩৫] বস্তুতপক্ষে এটা ইমাম সাহেবের হুজরাহ।[৩৬] ডঃ আহমদ হাসান দানী[৩৭] মিঃ আর.ডি. ব্যানার্জীর মন্তব্য ভ্রান্ত বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। বাঙালীরা বাঁশের স্থিতি স্থাপকতার সুযোগ নিয়ে তাদের ইট নির্মিত গৃহ ও ইমারত সমূহে বক্র রেখা বিশিষ্ট ছাদ এবং বাঁকানো কার্ণিশ ব্যবহার করতো। এখানকার ইসলামী স্থপতিরা কৃষকদের কুঁড়ে ঘরের এই শ্রেণীর ছাদকে তাদের স্থাপত্যে চমৎকারভাবে কাজে লাগিয়ে ছিল, কেননা তারা এটাকে সুন্দর বলে বিবেচনা করতো।[৩৮] বাংলার জলবায়ু, আবহাওয়া ও ভূ-প্রকৃতি অনুসরণ করে প্রয়োজনের তাগিদেই কয়েকটি কারণে এ ধরণের ইমারত গঁড়ে উঠেছিল।

(এক) অন্যান্য নির্মান উপাদান যেমন ইট, পাথর, ইত্যাদির মধ্যে যেখানে কাঠ ও বাঁশ প্রধান নির্মান উপাদানের অন্তর্ভুক্ত, সেখানে বক্ররেখার দ্বারা বেষ্টিত ছাদ গৃহ নির্মান প্রকৌশলে সহজতর প্রকল্প হিসেবে বিবেচিত। (দুই) বাংলাদেশী আবহাওয়া যেখানে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমান ৯২ ইঞ্চি[৩৯] (তিন মাসের পরিমান), সেখানে এ ধরণের ছাদের আবশ্যকতা প্রশ্নাতীত বিষয় বলে ইহা এ দেশের মাটিতে ঐতিহ্যগত ব্যাপার হয়ে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

382738

Dhaka University Institutional Repository

দাঁড়ায়, কেননা এই পদ্ধতিতে বৃষ্টির পানি ছাদের উপর হতে অতি সহজেই নিচের দিকে গড়িয়ে পড়তে পারে। প্রাচীন বাংলার স্থাপত্য শিল্পের প্রধানতম উপাদানও অলঙ্কার মধ্যে একটি ছিল বক্ররেখা দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ছাদের অদ্ভুত প্রকৃতি, যা সাধারণতঃ বাঙ্গালী[৪০] বা বাঙ্গালা দুয়ার নামে[৪১] বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত হয়ে রয়েছে। মূলতঃ বাংলাদেশে ইহা ছিল সীমাবদ্ধ, যেখানে ইসলামী স্থপতিগণ কৃষকের কুঁড়ে ঘরের ছাদ দ্বারা নির্দেশিত কাঠামোর সদ্ব্যবহার করেছিল। ফলশ্রুতিতে এই বাঁকানো ছাদ এমন একটি উপাদানে পরিণত হল যা খিলান, পটমণ্ডপ এবং গম্বুজ সহযোগে সমগ্র উত্তর ভারতে সুবিস্তীর্ণভাবে ব্যবহৃত হতে লাগল।[৪২] বাংলাদেশের এই প্রকৃতির স্থাপত্য শিল্পের আবির্ভাব একান্তই ঐতিহ্যগত। গৌড়ের কদেহ খানের সমাধি সৌধ ইহার প্রকৃষ্টতম উদাহরণ।[৪৩] বস্তুতপক্ষে গৌড়ের কদেহ খানের এই সমাধি সৌধটি বাংলা দো-চালা কুঁড়ে ছাদসহ একটি শিল্প-রীতির প্রারম্ভ সূচিত করে।[৪৪]

কারতালাব খান মসজিদের আকর্ষণীয় বিষয়বস্তু হলো এর পাঁচটি গম্বুজ। কয়েকটি কারণে এই মসজিদের পাঁচটি গম্বুজ একটি আকর্ষণীয় বিষয়বস্তু হিসেবে পরিগনিত হয়ে রয়েছে। (ক) গম্বুজ নির্মান পরিকল্পনায় এই মসজিদটি মুঘল যুগের অন্যান্য মসজিদ হতে স্বতন্ত্র ধর্মী,[৪৫] কেননা মুঘল যুগের মসজিদ সাধারণত এক বা তিন গম্বুজ বিশিষ্ট। এই ধরণের মসজিদ উত্তর ভারতে দিল্লী, আগ্রা ও লাহোরে অধিক সংখ্যায় বিদ্যমান। বাংলাদেশে যে সমস্ত মসজিদ মুঘলদের দ্বারা নির্মিত হয়েছে তাও এক হতে তিন গম্বুজ বিশিষ্ট। কিন্তু কারতালাব খান মসজিদে পাঁচটি গম্বুজের আবির্ভাব স্থপতিদের কৌতুহলের সৃষ্টি করেছে। বস্তুতপক্ষে এই ধরণের ইমারত ভারতবর্ষে বা মুসলিম বিশ্বের অন্যত্র অত্যন্ত বিরল। এই জন্যই কারতালাব খান মসজিদে পাঁচটি গম্বুজের আবির্ভাব এর অভিনব বৈশিষ্ট্য।

বাংলাদেশের স্থাপত্যে পাঁচ গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদের দৃষ্টান্ত এই প্রথম। এই জন্যই বাংলাদেশের স্থাপত্যে এটা এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। গৌড়, ও হযরত

Dhaka University Institutional Repository

পান্ডুয়াতে এর কোন দৃষ্টান্ত মেলেনি । ভারতীয় উপমহাদেশেও এরূপ দৃষ্টান্ত অত্যন্ত বিরল। তবে পাটনাতে চামনি ঘাটে[৪৬] এরূপ একটি দৃষ্টান্তের সাক্ষাৎ মেলে । এই মসজিদটির কিবলা কোঠা পাঁচটি 'বে-'তে বিভক্ত। এর প্রতিটি কোনায় অর্ধ কোনাকার বুরুজ রয়েছে । পাঁচটি 'বে' পাঁচটি গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত । এর পাঁচটি দরজা রয়েছে বলে ডঃ আর নাথ একে পঞ্চমুখী মসজিদ বলে অভিহিত করেছেন ।[৪৭] এই জন্যই ঢাকার স্থাপত্যে বেগম বাজার মসজিদ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ । এর উত্তরসূরীও সংখ্যায় বেশী নেই । ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দে কারতালাব খান ওরফে মুর্শিদকুলী খান ঢাকা হতে মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। মুর্শিদাবাদ রেলওয়ে ষ্টেশনের দুই মাইল পূর্বে মুর্শিদকুলী খান ১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দে কাটরা মসজিদটি নির্মান করেন । পরিকল্পনায় এই মসজিদটি আয়তাকার । এর দৈর্ঘ্য ১৩০'-০" এবং প্রস্থ ২৪'-০" । এর চার কোনায় অষ্টভুজাকার মানারা রয়েছে । ডঃ আহমদ হাসান দানী এই মসজিদটিকে ঢাকার কারতালাব খান মসজিদের অনুকরণ বলে মনে করেছেন ।[৪৮]

তথ্য নির্দেশ

১. Dr. Syed Mahmudul Hasan, Dacca the city of Mosques, (Islamic Foundation, Bangladesh, 1981), p. 41.

২. The History of Bengal, Vol-ii (Muslim Period,1200-1757), Edited by Sir Jadunath Sarkar, Published by the University of Dacca, 1948), Bengal Under Murshid Quli Khan by Jadnuath Sarkar, p. 399.

৩. ডঃ আহমদ হাসান দানীর মতে, তিনি ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দ হতে ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ঢাকায় অবস্থান করেন ।
দ্রষ্টব্য: Dr. Ahmad Hasan Dani, Muslim Architucture in Bengal. (Dacca, Paramount Press, 1961), p. 202.
Dacca A Record of Its Changing Fortunes, (The Saogat Press, Dacca-1956), p.p. 101-2.

Dhaka University Institutional Repository

৪. Munshi Rahman Ali, Tawarikh-i-Dacca, (1910). p. 266.

৫. Dr. Ahmad Hasan Dani, Muslim, op. cit. p. 202. Dacca A record, p. 191; Dr. Syed Mahmudul Hasan , Ancient Monuments of East Pakistan (The Pakistan Academy, 1970), p. 119 ; Dr. Nazim Uddin Ahmed ; Discover the Monuments of Bangladesh. (The University Press Ltd. Dhaka, 1984), p. 179.

৬. Dr. Ahmed Hasan Dani, Muslim. op. cit,. p. 202.

৭. Ibid.

৮. Syed Muhammad Taifoor, Glimpses of Old Dhaka. (The Pioneer Printing Press Ltd. 1956), p. 188.

৯. শ্রী যতীন্দ্র মোহন রায়, ঢাকার ইতিহাস, প্রথম খণ্ড (দি কমলা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১৩১৯ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৩৪১ ।

১০. Sayed Mahammed Taifoor, op. cit., p. 188.

১১. K.A.C. Creswell. A. Short Account of Early Muslim Architecture (Penguin Books, 1958), p. 58.

১২. Dr. Ahmad Hasan Dani, Muslim, op, cit., p. 71.

১৩. মোহাম্মদ শামসুল হক, ' কারতালাব খান মসজিদ' , ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, অষ্টম সংখ্যা, ১৯৭৮, পৃ. ১৪৭ ।

১৪. মোহাম্মদ শামসুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮ ।

১৫. Dr. Nazim Uddin Ahmed. Discover. op,cit., p. 179.

Dhaka University Institutional Repository

১৬. Syed Muhammed Taifoor. Glimpses of Old Dhaka, A short Historical Narration of East Bengal and Assam with special treatment of Dhaka. (The Pioneer Printing Press Ltd. 1956), p. 188.

১৭. Dr. Ahmad Hasan Dani, Muslim, op,cit., p. 202.

১৮. Ibid.

১৯. Dr. Syed Mahmudul Hasan, Dacca the City of Mosques, op.cit., p. 41.

২০. মোহাম্মদ শামসুল হক, কারতালাব খান মসজিদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২।

২১. James Fergusson, History of Indian and Eastern Architicture, Vol. i, (New Delhi, Second Indian Ed. 1972), p. 173.

২২. The Cambridge History of India, Vol. 3 (Delhi,S. Chand & Co. 1956, edited by Sir Wolseley Haig, Sir John Marshall, The Momuments of Muslim India, p. 592.

২৩. Satish Grover, The Architicture of India, Islamic (727-1707), (Vikas Publishing House Pvt. Ltd. 1981), p.p. 41.42.

২৪. Ibid. Fig. 2.17.

২৫. Dr. Ahmad Hasan Dani, Muslim, op,cit., Plate LVIII/84.

২৬. মোঃ আবদুর রশিদ, ঢাকা নগরীর মসজিদ নির্দেশিকা (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭), পৃ. ৩৪২.

২৭. Ibid, p. 313.

Dhaka University Institutional Repository

২৮. Dr. Ahmad Hasan Dani, op.cit, Plate LXXIII/ Dr. Mahmudul Hasan, Ancient Monuments of East Pakistan, Plate. 16/ Enamul Haque, Islamic Art Heritage of Bangladesh (Bangladesh National Museum, 1987), p. 38.

২৯. The Islamic Heritage of Bengal, Edited by George Michell Unesco 1984, Inventory of Key Monuments by Catherine B. Asher, p. 91.

৩০. K.A.C. Kreswell, op,cit., p. 11, Dr. Sayed Mahmudul Hasan, Mosque Architicture of Pre-Mughal Bengal, (Dacca University Press Ltd., 1979), p. 3.
Dogan Kuban, Muslim Religious Architicture (Leiden E.G. Brill, 1974), p. 12.

Dhaka University Institutional Repository

৩১. K.A.C. Creswell, op.cit.,P. 223.

৩২. Philip K Hitti, Hiotry of the Arabs,(Macmillan, London-1968),P. 508.

৩৩. James Fergusson, Vol. II, op. cit., p. 263.

৩৪. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস,আবিসুজ্জামান সম্পাদিত, (১ম খণ্ড) বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৮৭), ডঃ মমতাজুর রহমান তরফদার, বাংলার শিল্পকলা, পৃ - ১৮১ ।

৩৫. R.D. Banerji (Annual Report of the Archacological Survey of India, 1924-25) P. 93 মোঃ আবদুর রশিদ 'ঢাকা নগরীর মসজিদ নির্দেশিকায়" ইহাকে প্রাক্তন ইমাম মৌলভী হাসানউদ্দীনের মাযার বলে যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তা সমর্থন যোগ্য নয় ।

৩৬. Dr. Ahmad Hasan Dani, Dacca A record Op.cit. p. 102/ Dr. Syed Mahmudul Hasan, Ancient Monuments of East Pakistan, op.cit. P. 119 একই লেখকের Dacca the City of Mosques. op.cit. P. 42. আঃ কঃ মুঃ যাকারিয়া, " বাংলাদেশের প্রত্ন সম্পদ ' (বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী - ১৯৮৪) পৃ 88৮ ।

৩৭. Dr. Ahmad Hasan Dani, Dacca A Record, op.cit. P.102.

৩৮. James Fergusson, op.cit.P.254.

৩৯. History of Bengal, Volume. 11,Muslim period ,Edited by Sir Jadu Nath Sarkar, Bengal under Shaista Khan and Ibrahim Khan by Sir Jadu nath Sarker, P. 387.

৪০. The Cambridge History of India, Vol. 111. op. cit., Sir John Marshall, The Monuments of Muslims India,p.600.

Dhaka University Institutional Repository

৪১. Encyclopadedia of World Art, Vol. III. Indo-Iranian Art. Landscape Architecture (Mc Graw Hill Book Co., INC. New York, 1971), p. 25.

৪২. Charles Fabri, An Introduction, To Indian Architecture, (New York 1963), p. 47.

৪৩. Dr. Ahmad Hasan Dani, Muslim, op.cit., Plate LVII/83.

৪৪. Ibid - p. 23.

৪৫. Ibid - p. 202.

৪৬. Dr. R.Nath, op,cit., p. 112.

৪৭. Ibid. p. 109.

৪৮. Dr. Ahmad Hasan Dani, Muslim. op.cit., p. 276.

Dhaka University Institutional Repository

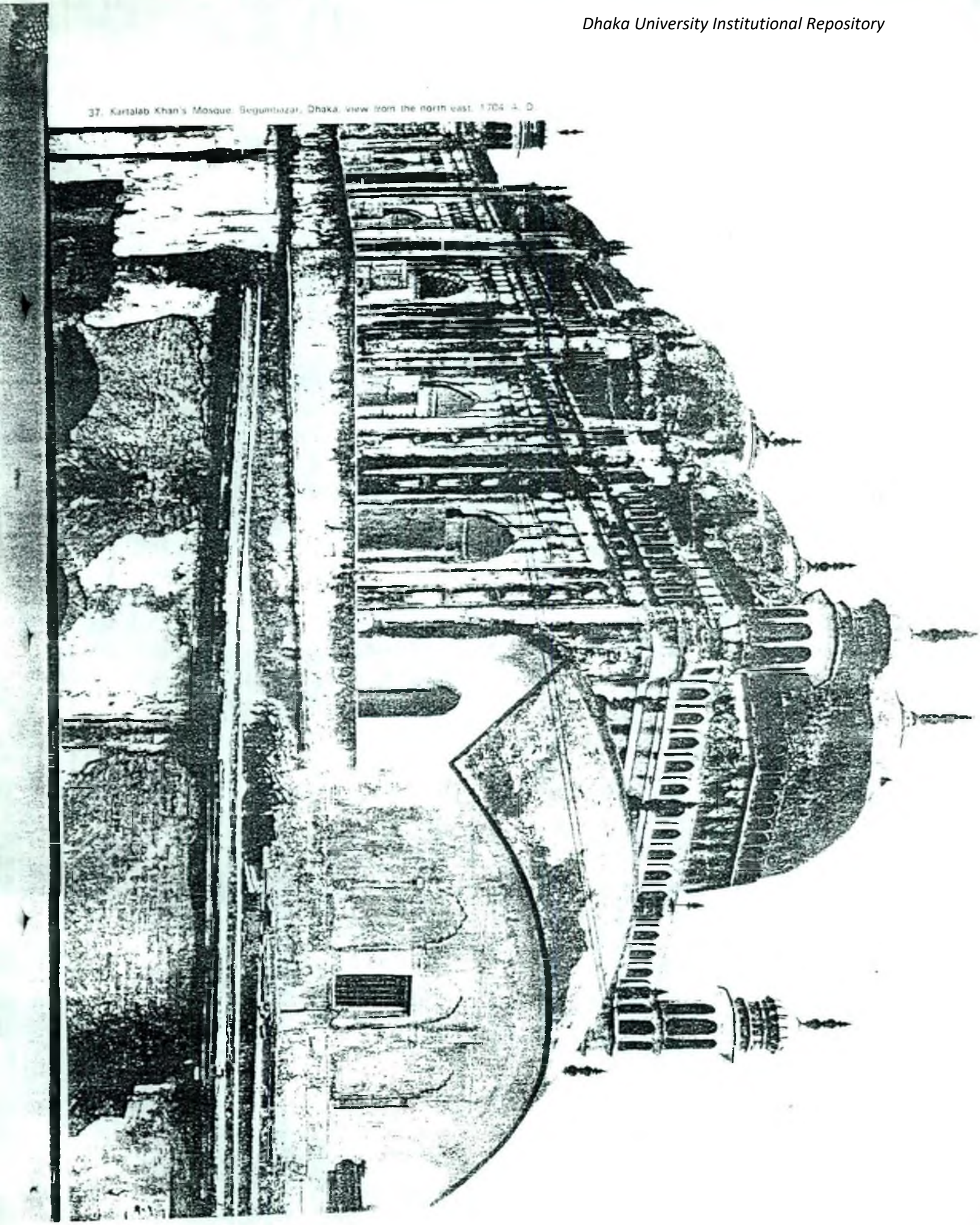

37. Kartalab Khan's Mosque, Begumbazar, Dhaka, view from the north east, 1704 A. D.

Dhaka University Institutional Repository

১. কারতালাব খান মসজিদ / (১৭০১-৪ খ্রঃ) পাঁচ গম্বুজ ও মিনার ।

২. কারতালাব খান মসজিদ / প্রধান প্রবেশ পথ

Dhaka University Institutional Repository

৩. কারতালাব খান মসজিদ / প্রধান মিহরাব ।

৪. কারতালাব খান মসজিদ / নামাজ গৃহের প্রধান মিহরাবসহ ক্বিবলা দেয়ালের দক্ষিণাংশ ও দক্ষিণ পার্শ্বের প্রবেশ পথ (ভিতর থেকে) ।

Dhaka University Institutional Repository

৫. কারতালাব খান মসজিদ / পার্শ্ব মিহরাব ।

৬. কারতালাব খান মসজিদ / প্রধান গম্বুজের স্কুইঞ্চ ।

Dhaka University Institutional Repository

আরমানীটোলা ছোট মসজিদ

ঢাকার আরমানীটোলা ছোট মসজিদটি মীর্জা গোলাম পীরের (তারা) মসজিদের পূর্ব দিকে এবং হোটেল ওরিয়েন্ট হতে অল্প কিছু দক্ষিণে সতিশ চন্দ্র চক্রবর্তী (শরৎ চন্দ্র চক্রবর্তী)[১] সড়কে অবস্থিত। মসজিদের কেন্দ্রীয় প্রবেশ পথের উপরে ঝুলন্ত শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, ইহা জনৈক খানজাদীর স্ত্রী কর্তৃক ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয়েছে। (**ভূমি নকশা ৬**)

মসজিদটি বাহ্যিক ক্ষেত্রে ২৩'-০" দৈর্ঘ্য এবং ১৫'-০" প্রস্থ। এবং অভ্যন্তরীন ক্ষেত্রে ইহা দৈর্ঘ্যে ১৮'-০" প্রস্থে ১'-১০"। ঢাকা মহানগরীর অন্যান্য মসজিদের অনুকরণে এই মসজিদের দালানে তিনটি প্রবেশ পথ রয়েছে। কেন্দ্রীয় প্রবেশ পথটি পার্শ্ববর্তী প্রবেশ পথ দুয় হতে উচ্চতর। ডঃ আহামদ হাসান দানীর মতে[২] ইহা সহজ সরল ক্ষুদ্র মসজিদ। আর আ. ক. মু. যাকারিয়া[৩] বলেন যে, এই মসজিদে উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব কিছুই নেই। বাস্তব ক্ষেত্রে এই মসজিদের তিনটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ঢাকা নগরীর পুরাতন মসজিদ সমূহে কিবলা দেয়ালে সচরাচর কোন মিম্বর নেই, কিন্তু এখানে কিবলা দেয়ালে অনুপ্রবিষ্ট তিন খাপ বিশিষ্ট একটি মিম্বর রয়েছে। এই মসজিদে কিবলা দেয়ালে একটি অবতলাকার মিহরাব নির্মিত হয়েছে। ঢাকার মসজিদে সচরাচর অর্ধ অষ্ট কোনাকার মিহরাব লক্ষ্য করা যায়। দ্বিতীয়তঃ, একমাত্র ইসলাম খানের মসজিদ ব্যতীরেকে মহানগরীর অন্যান্য মসজিদের কিবলা দেয়ালে কোন জানালা নেই, কিন্তু এই মসজিদে কিবলা দেয়ালে মিহরাবের দুই পার্শ্বে দুটো জানালা রয়েছে। মিহ-রাবের দক্ষিণ পার্শ্বের জানালাটি ঠিক মিম্বরের উপরেই নির্মিত হয়েছে।

পরিশেষে এই মসজিদটি ভল্ট বিশিষ্ট চৌচালা ছাদ দ্বারা আচ্ছাদিত। এই ছাদ এই ইমারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

তথ্য নির্দেশ

১. Dr. Ahmad Hasan Dani, Dacca A Record of Its Changing Fortunes (The Saogat Press 1956), p. 93.

২. Ibid.

৩. আঃকঃমঃ যাকারিয়া, বাংলাদেশের প্রত্ন সম্পদ, (বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৮৪), পৃ. ৪৪১।

Dhaka University Institutional Repository

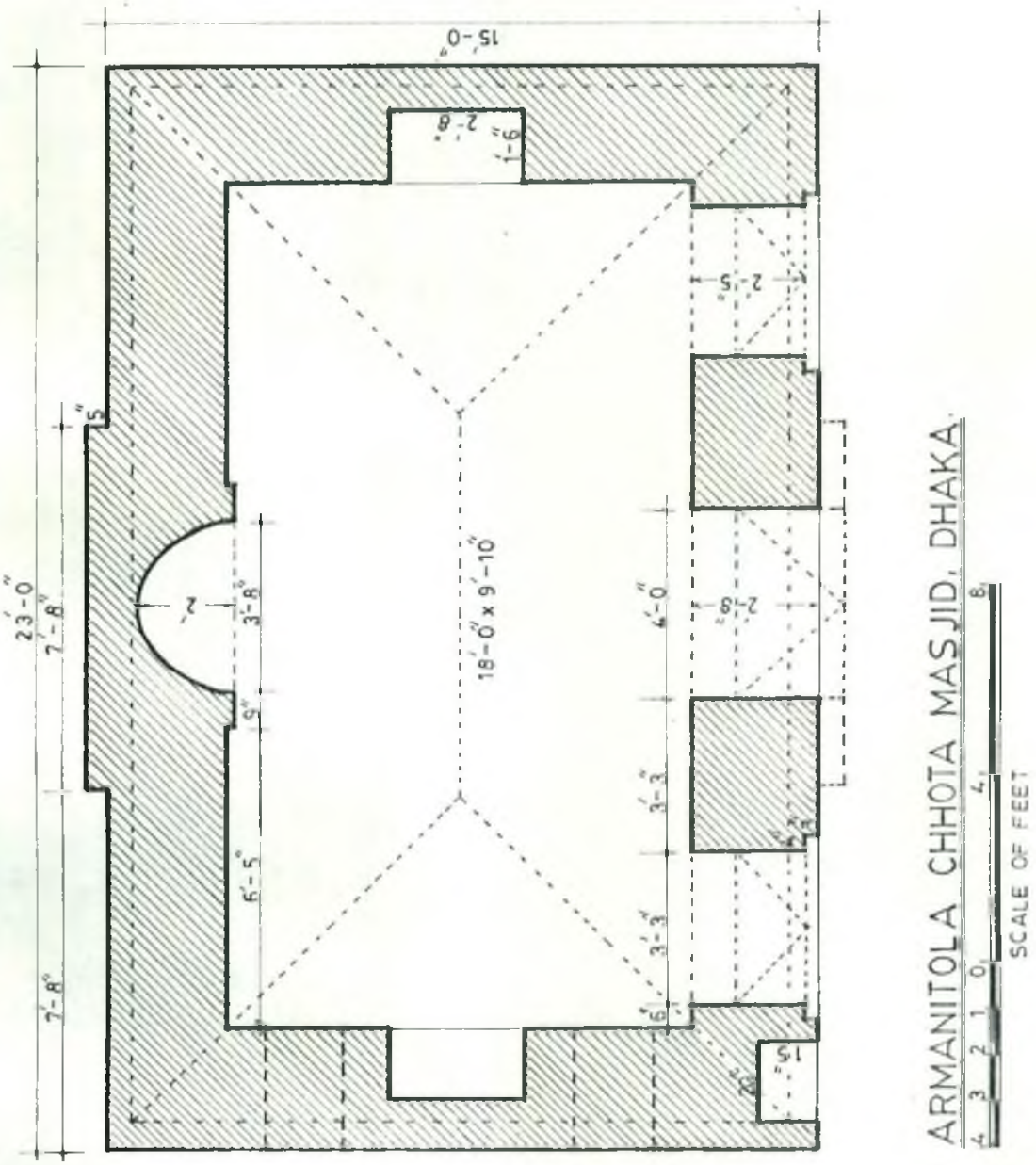

ভূমি নকশা ৬

Dhaka University Institutional Repository

মীর্জা গোলাম পীরের মসজিদ

অষ্টাদশ শতাব্দীর তিন চতুর্থাংশে মীর আবু সৈয়দ নামে একজন ধনাঢ্য তুরানী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মধ্য এশিয়া হতে ঢাকাতে আগমন করেন। তাঁর পুত্র ছিলেন মীর্জাজান। এই পরিবার প্রথমত: ঢাকার মহল্লা আলী আবু সাইদ[১], আধুনিক আরমানী টোলায় বসতি স্থাপন করে। ঢাকাতে আসার পরে এই পরিবার ঢাকার প্রখ্যাত প্রথম শ্রেণীর ভদ্রলোক মীর আশ্রাফ আলী খানের পরিবারের সাথে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হয়। মীর আশ্রাফ আলী খান অনেক সম্পত্তির মালিক ছিলেন। তাঁর মাসিক আয় ছিল সম্ভবত ২০ হাজার টাকা। মীর আবু সাঈদ অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ ও বিচক্ষণ ছিলেন। তিনি বাবু বাজারের রাস্তার ধারে তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা।[২] এই মসজিদের নীচের তলাতে কিছু দোকানপাঠ রয়েছে। এর উত্তর দিকে এক গম্বুজ বিশিষ্ট তাঁর সমাধি সৌধ রয়েছে।

মীর্জা আহম্মদজান ওরফে মীর্জা গোলাম পীর মীর্জা জানের পুত্র এবং মীর আবু সাঈদের পৌত্র ছিলেন। সম্ভবত মীর আশ্রাফ আলী খানের অনুকরণেই তিনি ত্রিপুরা ও বাকের গঞ্জ জেলায় বিশাল সম্পত্তির মালিক হন।[৩] তাঁর অর্থে ঢাকার বেগম বাজার মহল্লার কারতালাব খান ওরফে মুর্শিদ কুলী খানের পাঁচ গম্বুজ বিশিষ্ট বৃহৎ মসজিদটি পুনঃ সংস্কার করা হয়।[৪] তিনি বলগোলাতে বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে তিন গম্বুজ বিশিষ্ট একটি মনোরম মসজিদ নির্মান করেছিলেন।[৫] আরমানিটোলাতে তিনি একটি কবরস্থান ও নজারখানা তৈরী করেছিলেন। কিন্তু মীর্জা গোলাম পীরের অমর কীর্তি হচ্ছে এই কবরস্থান ও নজার খানার নিকটস্থ তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ। ভাগ্যের পরিহাসে এই প্রখ্যাত পরিবারের বসত বাড়ির জায়গায়এখন আরমানিটোলা শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় বিদ্যমান রয়েছে। নজার খানায় বিদ্যমান রয়েছে ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়। মীর্জা সাহেব সম্ভবত বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে বলগোলাতে তাঁর নতুন প্রাসাদ সদৃশ বসত বাড়ি নির্মান করেছিলেন।[৬] এই অট্টালিকাতেই বহু বৎসর যাবৎ ঢাকা সার্ভে স্কুল চলছিল। মীর্জা গোলাম পীর ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন, এবং তাঁর আধ্যা-

Dhaka University Institutional Repository

থিক পীরের মগবাজার খানকায় তিনি সমাহিত হন ।

অধুনা মাহুতটুলী চৌমুহনীর অল্প দূরে আরমানীটোলা সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের পার্শ্বে আবুল খায়রাত ৮/১ গলিতে নির্মিত এই মসজিদটি মীর্জা গোলাম পীরের স্মৃতি বহন করছিল । কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মসজিদের নতুন মোতয়াল্লী ছিলেন আলীজান বেপারী নামক একজন সাবান ও তামাক ব্যবসায়ী।[7] প্রচুর অর্থ হাতে নিয়ে তিনি এই মসজিদের সংস্কারকার্যে মনোনিবেশ করেন । তিনি মসজিদের পূর্ব দিকে একটি নতুন বারান্দা সংযোজন করেন এবং মসজিদের ভিতর ও বাইরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে তিনি জাপান ও ইংল্যাণ্ড হতে অলংকারিক চীনা মাটির টালী আমদানী করেন। মসজিদটি সৌন্দর্যময় করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে তিনি প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন । নতুন অলং-করণে সেতারা বা তারা নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করে বলে দুর্ভাগ্যক্রমে এটা তারা বা সিতারা মসজিদ নামে পরিচিতি লাভ করে[8] এবং প্রতিষ্ঠাতা মীর্জা গোলাম পীরের নামটি কালের করাল গ্রাসে চাপা পড়তে উদ্যত হয় ।[9] মসজিদটি সম্প্রসারণ প্রকল্পের জন্য ১৯৮৫ সনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রেসিডেন্ট এইচ,এম, এরশাদ ৮১ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেন।[10] ফলে মসজিদের সম্প্রসারণ কার্যে যে তৎপরতা লক্ষ্য করা যায় তাতে মসজিদের আসল অবয়ব অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যুগপৎ পাল্টে যায় । (ভূমি নকশা ৭)

এই মসজিদের দুটো রূপ-একটি আদি ও অন্যটি আধুনিক । আদি সত্তায় এই মস-জিদটি একটি আয়তাকার নামাজ কোঠা সহযোগে গঠিত ছিল । আদি মসজিদটির দৈর্ঘ্য ছিল ৩৫'-৯" এবং প্রস্থে ১৩'-৯' এর চার কোনায় চারটি বুরুজ ছিল । পূর্ব দিকে তিনটি দরজা[11] এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিকে একটি করে মোট ৫টি দরজা ছিল । মসজিদের কিবলা কোঠা তিনটি গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল । কেন্দ্রীয় গম্বুজটি পার্শ্ববর্তী গম্বুজদ্বয়ের চেয়ে আকার ও আয়তনে ছিল বৃহত্তর । বর্তমানে এই মসজিদটি অভ্যন্তরীন ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য ৬৬'-৮" প্রস্থ ১৩'-৯" । এর দেয়াল ০৪'-০" পুরু ।

Dhaka University Institutional Repository

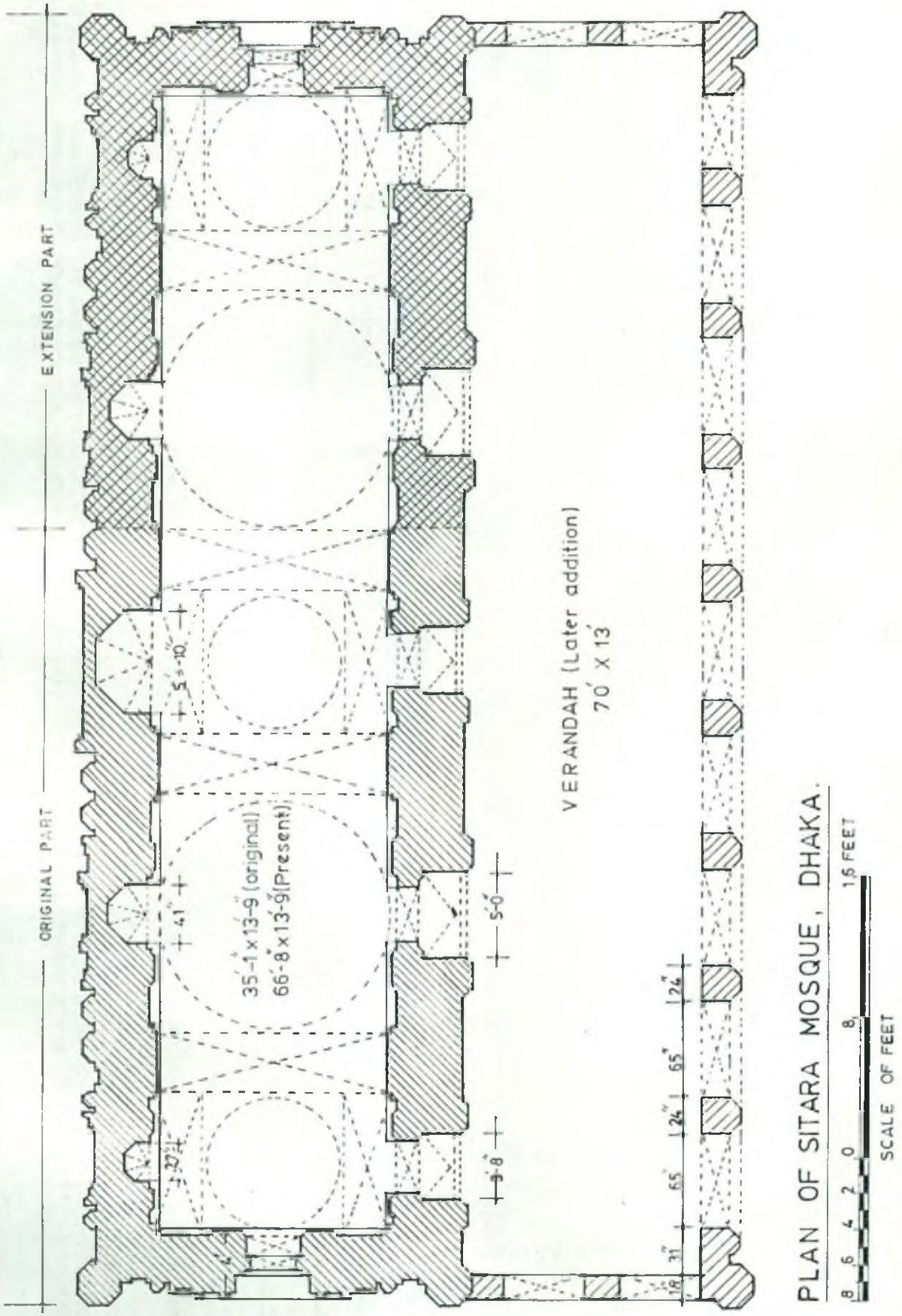

ভূমি নকশা ৭

Dhaka University Institutional Repository

স্থাপত্যগত কাঠামো ও অলংকরণ এর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করে প্রাচীন ও নতুন মসজিদের পৃথক নক্সা চিহ্নিত করা যেতে পারে। বর্তমানে মসজিদটিতে প্রবেশ করার নির্মিত পাঁচ-টি দরজা রয়েছে । এই দরজা গুলির মধ্যে দক্ষিণ দিকের তিনটি দরজাই প্রাচীন । প্রথম দরজাটি ৩'-৮" প্রশস্, ২য় দরজাটি ৫'-০" প্রশস্ এবং তৃতীয়টি ৩'-৮" প্রশস্। স্পষ্টতই প্রাচীন মসজিদের ৫'-০" প্রস্থ বিশিষ্ট দরজাটি ছিল আদি মসজিদের প্রধান প্রবেশ পথ। উত্তর দিকে মসজিদটিকে বর্ধিত করে দুটো নতুন দরজা নির্মান করা হয়েছে । সম্প্রসারিত মসজিদের এই চতুর্থ দরজাটি বা নতুন মসজিদের দক্ষিণ পার্শ্বের দরজাটি ৫'-০" প্রশস্ । আর সর্বোত্তর দরজাটিতে রয়েছে ৩'-৮" প্রশস্তা, এতে করে পুরাতন মসজিদের সর্ব দক্ষিণ দরজা ও সর্বোত্তর দরজা আর নতুন মসজিদের সর্বোত্তর দরজার মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করা হয়েছে এবং উত্তর দিক হতে দ্বিতীয় এবং দক্ষিণ দিক হতে দ্বিতীয় দরজার মধ্যে অনুপাত লক্ষ্য করা যায় । তিন আইল বা তিন দরজা বিশিষ্ট মসজিদ হলে এই দুটো দরজার কোন এক-টি কেন্দ্রীয় প্রবেশ পথ হিসেবে পরিগণিত হতে পারতো । কিন্তু দরজা পুনঃ সংগঠনের ফলে এই দুটো দরজার কোনটিই কেন্দ্রীয় প্রবেশ পথ হিসেবে পরিগণিত হতে পারে নি । প্রধান প্রবেশ পথের স্থান দখল করেছে উত্তর বা দক্ষিণ দিক হতে তৃতীয় নাম্বার প্রবেশ পথটি যা ৩'-৮" প্রশস্ । অনুপাতে দক্ষিণ দিক হতে দ্বিতীয় দরজাটি হতে এই তৃতীয় দরজাটি ১'-৪" ক্ষুদ্রতর । স্পষ্টতই আসাদ সংগঠনে এই তৃতীয় দরজাটি অন্যান্য দরজার সাথে অনুপাত রক্ষা করে নির্মিত হয় নি । মসজিদের সম্প্রসারণ পরিকল্পনায় এ একটি বিশেষ ত্রুটি ।

মীর্জা গোলাম পীরের মসজিদের আইলের ব্যবস্থাপনায়ও ত্রুটি লক্ষ্য করা যাচ্ছে । প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম 'বে' সমূহ প্রায় একই পরিমাপ বিশিষ্ট । অর্থাৎ প্রতিটি ৮'-০" প্রশস্ । আর দ্বিতীয় ও চতুর্থ 'আইল' দুটোওএকই পরিমাপ বিশিষ্ট অর্থাৎ প্রতিটি ১৪'-০" প্রশস্ । স্পষ্টতই তৃতীয় নম্বর 'বে'টি তার পার্শ্ববর্তী 'আইল'সমূহ হতে ৬'-০" কম প্রশস্ ; । অথচ এই বে টিই কেন্দ্রীয় আইল বা নেভ হিসেবে পরিগণিত হওয়া উচিৎ ছিল । এই অবস্থায় দক্ষিণ দিক হতে ২নং আইলটি ভেঙ্গে নতুন করে নির্মান করার প্রয়োজনীয়তা দেখা

Dhaka University Institutional Repository

দিত; কিন্তু এরূপ কার্যে আদি মসজিদের সুরুপটি প্রায় বিলিন হয়ে যেতো। এ জন্যই সম্ভবত ২ নং বে এর সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে ৪ নং বে টি নির্মান করা হয়েছে।

এই মসজিদের প্রতিটি 'আইল' ও 'বে' গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত। বস্তুত দক্ষিণ দিকের গম্বুজ ত্রয় হলো আদি মসজিদের গম্বুজ। পরবর্তীতে উত্তর দিকে আরো দুটো গম্বুজ নির্মান করা হয়েছে। আদি মসজিদের কেন্দ্রীয় গম্বুজটির অনুপাত রক্ষা করে উত্তর দিকে চতুর্থ গম্বুজটির সংযোগ সাধন ঘটেছে। আর প্রথম ও তৃতীয় গম্বুজটির সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে সর্বোত্তর গম্বুজটি নির্মান করা হয়েছে। আদি মসজিদের কেন্দ্রীয় গম্বুজটি আকারে হলো বৃহত্তর। এ জন্যই নতুন সংগঠনে ৪ নং গম্বুজটি বৃহত্তর পরিসরে রূপ পেয়েছে, কিন্তু পুনঃ গঠিত মসজিদে এই দুটো গম্বুজের কোনটিই কেন্দ্রীয় গম্বুজ হিসেবে পরিগণিত হয়নি। পক্ষান্তরে আদি মসজিদের উত্তর দিকস্থ তৃতীয় গম্বুজটি এখন কেন্দ্রীয় গম্বুজের স্থান অধিকার করে নিয়েছে। মসজিদের গম্বুজ সংস্থাপনে ইহা একটি বিস্ময়কর ত্রুটি, কেননা এটা ছিল পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্রতর গম্বুজ অথচ এখন হয়েছে কেন্দ্রীয় গম্বুজ। বস্তুত পক্ষে চারটি গম্বুজকে ক্ষুদ্রতর অনুপাতে নির্মান করে এই কেন্দ্রীয় গম্বুজটিকে অন্যান্য গম্বুজের চেয়ে বৃহত্তর পরিসরে নির্মান করা উচিত ছিল। কিন্তু কলাকৌশলিক অসুবিধার জন্য এটা করা সম্ভবপর হয়নি; কেননা এই অবস্থায় এখানকার কেন্দ্রীয় গম্বুজটির দুই পার্শ্বের দুইটি বৃহত্তর গম্বুজ ভেঙ্গে ফেলার প্রয়োজন ছিল। এটা ছিল অবশ্য অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ও ব্যয়সাধ্য ব্যাপার।

মীর্জা গোলাম পীর মসজিদের প্রবেশ পথ ও পাঁচটি গম্বুজের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে কিবলা দেয়ালে পাঁচটি মিহরাব নির্মান করা হয়েছে। দক্ষিণ দিকের প্রথম ও দ্বিতীয় নম্বর মিহরাবটি হলো মৌলিক, প্রথমটি ২'-৭" প্রশস্ত, দ্বিতীয়টি ৪'-১" প্রশস্ত। উত্তর দিকের সম্প্রসারণে তিনটি মিহরাব স্থান করে নিয়েছে। দক্ষিণ দিক হতে তৃতীয়টি ৫'-১০", চতুর্থটি ৪'-১" এবং পঞ্চমটি ২'-৭" প্রশস্ত। স্পষ্টতই ৪'-১" প্রশস্ত মিহরাবটি ছিল আদি মসজিদের কেন্দ্রীয় মিহরাব এবং এটাই মসজিদের কেন্দ্রীয় মিহরাব হিসেবে পরিগণিত হলে উত্তম হতো। কিন্তু নতুন সংস্করণের ফলে তা সম্ভব হয়ে উঠেনি। কিবলা দেয়ালের মিহরাব সংস্থাপনে এটাই হলো কারিগরী বিধি সম্মত সংস্থাপনা, কিন্তু ৫'-১০"

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গ এই মিহরাবটির সম্মুখস্থ 'বে' এবং কেন্দ্রীয় প্রবেশ পথের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে নির্মিত হয়নি, কেননা এই 'বে'টি 'নেভ' এর আকার পায় নি এবং কেন্দ্রীয় প্রবেশ পথটি জাঁকালো প্রবেশ পথের মত মর্যাদা পায় নি । এ জন্যই পুরাতন মসজিদ ও এর অংশ বিশেষের ভাঙ্গন কর্মে এবং সম্প্রসারিত মসজিদের নির্মান পরিকল্পনায় সামঞ্জস্য সংরক্ষিত হয়নি । পুরাতন ও সম্প্রসারিত অংশ নিয়ে বর্তমান মসজিদটি সর্ব মোট ৬৬'-৮" দৈর্ঘ্য কিন্তু এর মধ্যে পূর্ব দিকের ফাসাদে ৩৫'-১" অংশ পর্যন্ত মৌলিক (অভ্যন্তরীন পরিমাপ) অর্থাৎ এখানে প্রায় ৩০'-০" পর্যন্ত অংশ সম্প্রসারিত হয়েছে । এরূপ কিবলা দেয়ালের ২৮'-০৪" অংশ মৌলিক, এখানে ৩৬'-৮" পর্যন্ত অংশ সম্প্রসারিত হয়েছে । সুতাবতই কিবলা দেয়ালে তিনটি মিহরাবই নতুন করে নির্মান করা হয়েছে । আর ফাসাদে নতুনভাবে নির্মিত হয়েছে দু'টো দরজা । এ জন্যই বোধ হয় দক্ষিণ দিক হতে কিবলা দেয়ালে ৪ নং মিহরাবটি ও ৪ নং প্রবেশ পথটির মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করা সম্ভব হয়নি ।

মীর্জা গোলাম পীর মসজিদের গম্বুজ নির্মানে পরিকল্পনায় পুরাতন ও নতুন অংশে প্রায় একই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে । পুরাতন অংশের কেন্দ্রীয় গম্বুজটি আর নতুন অংশের কেন্দ্রীয় গম্বুজটি অর্থাৎ দক্ষিণ দিক হতে দ্বিতীয় ও চতুর্থ গম্বুজটি নির্মান পরিকল্পনায় বর্গ হতে অষ্টভুজে পৌঁছতে উত্তরণের স্থানে পেন্ডেনটিভ ব্যবহার করা হয়েছে । অষ্টভুজের প্রতিটি কোনাতে আটটি স্কুইঞ্চ নির্মান করা হয়েছে । প্রতি দু'টো স্কুইঞ্চের মধ্যে আবার দুটি অগভীর স্কুইঞ্চ নির্মিত হওয়াতে স্কুইঞ্চের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৬টিতে । অষ্টভুজের কোনার স্কুইঞ্চ গুলো স্বভাবতই গঠন মূলক, আর দু'ইটি স্কুইঞ্চের মধ্যবর্তী সহযোগী স্কুইঞ্চ গুলি প্রধানতঃ অলংকারিক হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু বস্তুতপক্ষে এরাও কিছু কিছু গঠন মূলক কাজে অংশগ্রহণ করেছে । এ সব স্কুইঞ্চ এর উপরে রয়েছে বৃত্ত, বৃত্তের মাথায় অষ্ট কোনাকার পিপার উপর গম্বুজ উত্তোলিত হয়েছে ।

ক্ষুদ্রতর গম্বুজগুলি অর্থাৎ উত্তর দিক হতে ১, ৩ ও ৫ নং গম্বুজ নির্মানে কিছুটা ভিন্নতর পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে । পূর্ব ও পশ্চিম দেয়াল হতে দুটো অর্ধ বৃত্ত সামনের

Dhaka University Institutional Repository

দিকে সম্প্রসারিত করে এখানে বর্গ তৈয়ার করা হয়েছে। বর্গের চারিটি কোনাতে সূক্ষ্মাগ্র খিলান বিশিষ্ট কুইঞ্চ নির্মান করা হয়েছে, দুটো কুইঞ্চের মধ্যে আবার চারটি সহায়ক কুইঞ্চ নির্মিত হওয়ায় কুইঞ্চের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে আটটিতে। সহায়ক কুইঞ্চ গুলির অতি অল্পই সাংগঠনিক কর্ম তৎপরতা রয়েছে। স্পষ্টতই এখানে পেনডেনটিভের আশ্রয় নেয়া হয়নি। বৃহত্তর গম্বুজ দুটোর অষ্টভুজের ভিতের পরিমাপ হলো ৩৯'-৪" আর ক্ষুদ্রতর গম্বুজ গুলির অষ্ট ভুজাকার ভিতের পরিধি হলো ৩৭'-৪"। সুতাবতই বৃহত্তর ও ক্ষুদ্রতর গম্বুজ পরিকল্পনায় পরিধির ব্যবধান দাঁড়াচ্ছে ২২'-০"। গম্বুজ নির্মান পরিকল্পনায় এ একটি সাংঘাতিক ত্রুটি, কেননা পরিধিতে এত ব্যবধান থাকায় সমুন বৃহত্তর গম্বুজের পার্শ্বে ক্ষুদ্রতর গম্বুজগুলি কিউপুলার আকার প্রাপ্ত হয়েছে। এতে করে মসজিদের বাহ্যিক সৌন্দর্য ক্ষুন্ন হয়েছে। এই মসজিদের পাঁচটি গম্বুজ সংস্থাপনায় আরও একটি ত্রুটি লক্ষ্যণীয়। এখানে কেন্দ্রীয় বৃহত্তম গম্বুজ বলে কিছু আঁচ করা যায় না। যাহোক গম্বুজগুলি ২'-৭" উঁচু ড্রামের উপর নির্মিত।

সিতারা মসজিদের কার্নিশ নতুন ও পুরাতন এই দুইটি অংশ নিয়ে গঠিত। এই কার্নিশের অলংকরণে চারটি স্তর রয়েছে। নিম্নতম স্তরটিতে পুষ্পসহ লতার হালের একটি সুনির্দিষ্ট রেখা রয়েছে। এখানে পূর্ণ রূপে পরিস্ফুটিত ফুল লক্ষ্য করা যায়। তার উপরে রয়েছে একটি নিমগ্ন প্যানেল, যা অলংকারিক ক্ষেত্রে তিনটি স্তরে বিভক্ত। দুটি কুলিয়ামার মধ্যে রয়েছে একটি পুষ্পদানী, তার পরে ২টি পুষ্পদানীর মধ্যে রয়েছে একটি কুলিয়ামা। এসবগুলি একটি আয়তাকার কাঠামোর মধ্যে ধরে রাখা হয়েছে, যার তিনটি দিকে কিনারা গুলি কিতা দণ্ড সদৃশ নক্সা দ্বারা অলংকৃত হয়েছে। উপরের কিনারা নিরবচ্ছিন্ন ফুলের রেখা দ্বারা বৈশিষ্ট্য মন্ডিত হয়েছে। তারপরে রয়েছে একটি ফুলেল ডোরা, এর উপরে আবার রয়েছে পদ্ম ফুলের একটি সারি। কুলিয়ামা এখানে বর্গের মধ্যে স্থান করে নিয়েছে। এই বর্গের কিনারাগুলি গোলক বৎ নক্সা, চারা গাছ, ও পত্রালংকার দ্বারা সজ্জিত হয়েছে। পুষ্পদানীগুলো আয়তাকার কাঠামোর মধ্যে ধরে রাখা হয়েছে। এই আয়তের সীমানা ফুল ও পত্রালংকার দ্বারা সজ্জিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সিতারা মসজিদের প্রবেশপথ গুলি খিলান বিশিষ্ট।এই গুলি একটি অর্ধ গম্বুজের মধ্যে দিয়ে উন্মুক্ত। সূচাগ্র কলা বিশিষ্ট খিলান সমূহ দ্বৈত খিলানের ইনট্রাডোস পুষ্পধার এবং উপরে তারকা খচিত অর্ধচন্দ্র দ্বারা অলংকৃত। খিলানের সফিত (soffit) সমূহ পদ্মালংকার পুষ্পমালা এবং ফুল দ্বারা অলংকৃত।

গম্বুজের পেনডেনটিভ সমূহ ফুল গাছ ও তারকাকৃতির ফুল দ্বারা অলংকৃত হয়েছে। এর কেন্দ্রে রয়েছে একটি বৃহৎ পুষ্প পাত্র। অষ্টভুজ ও বর্গের মধ্যকার অংশটিতে গলার হার সদৃশ অলংকরণ রয়েছে এবং এর মধ্যে রয়েছে বৃহৎ পুষ্পপাত্র এবং ক্ষুদ্র ফুলের চারা গাছ। অষ্ট ভুজের একটি তারকা দ্বারা অলংকৃত হয়েছে, প্রতিটি বাহুতে রয়েছে পাঁচটি করে তারকা।

সিতারা মসজিদের প্রধান মিহরাব একটি আয়তাকার কাঠামোর মধ্যে ধরে রাখা হয়েছে। এই আয়তক্ষেত্রের উপরে রয়েছে সূচ্যগ্র খিলান বিশিষ্ট কাঠামো; এর উপরে রয়েছে নয়ন খিলানাকৃতির কাঠামো। সূচ্যাগ্র খিলান এবং আয়তক্ষেত্রের মধ্যবর্তী অংশটি পুষ্প গুচ্ছ দ্বারা অলংকৃত হয়েছে। আয়তক্ষেত্রের তিনটি দিকেই পদ্মালংকার শোভা পাচ্ছে। খিলানের শীর্ষ দেশে রয়েছে অর্ধচন্দ্র, মিহরাবের অর্ধ বৃত্তাকার অংশ ফুলেল অলংকরণ দ্বারা পরিশোভিত হচ্ছে।

গম্বুজের শিরা সমূহ অন্ধ মার্লন দ্বারা অলংকৃত হয়েছে। এর ভিতরে রয়েছে তারকা চিহ্ন। গম্বুজের চূড়া সমূহ এ যাবৎ ঢাকা শহরে প্রাপ্ত সবচেয়ে চমৎকার বৈশিষ্ট্যে অনুরণিত। এরা প্রথমে বালাবন্ধ, পরে অর্ধকলস, তার পরে তিনটি পূর্ণ কলস, পরে পদ্ম পাঁপড়ি এবং পরে পূর্ণ পদ্ম দ্বারা নির্মিত হয়েছে। গম্বুজের গাত্রে খচিত রয়েছে তারকা পুঞ্জ। নির্মাণ পরিকল্পনায় ত্রুটি বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও মীর্জা গোলাম পীরের মসজিদটি একটি অতুলনীয় ইমারতের রূপ লাভ করেছে। এর কারণ হলো এর অপূর্ব অলংকরণ, বাংলাদেশের স্থাপত্যের ইতিহাসে এরূপ আর কখনও দেখা যায় নি।

Dhaka University Institutional Repository

এই মসজিদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব রয়েছে। এর প্রতিষ্ঠাতা মীর্জা গোলাম পীর ছিলেন প্রখ্যাত সমাজসেবী ও সাংস্কৃতিক মননশীলতা সম্পন্ন লোক। তিনি মসজিদকে কেন্দ্র করে ইসলামের দুইটি ঈদ অতি জাক জমক সহকারে পালন করতেন। ডেকসি ভর্তি পোলাও কোরমা পাক করে মহল্লায় মহল্লায় পাঠাতেন। এই মসজিদকে কেন্দ্র করে একটা লঙ্গর খানাও পরিচালিত হত। এখানে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে মক্তব। এলাকার ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদেরকে দীনি শিক্ষা দেওয়া হয়। এখানে ১৯০৬ সালে আলী জান বেপারী দারুল কোরআন ক্বি কোরকানীয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে এ মসজিদটি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। এর ছবি বাংলাদেশ ব্যাংকের ১০০ শত টাকার নোটে ছাপানো হয়েছে। এই মসজিদের স্থাপত্য কলা কৌশল ও অলংকরণ জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, প্রতিদিন শত শত লোক এ মসজিদটি দেখতে আসে। এবং বাংলাদেশ টেলিভিশনের পর্দায়ও দেখানো হচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১. Syed Muhammed Taifoor, Glimpses of Old Dacca,(The Pioneer Printing press Ltd. Dhaka.1956),p. 267.

২. Ibid.

৩. কিন্তু জমিদার অপেক্ষা দানশীল হিসেবে তিনি ঢাকা বাসির নিকট অধিক পরিচিত। রবিউল আউয়াল মাসের প্রথম ১২ দিন তিনি ঈদ-ই-মিলা-নুন্নবী উপলক্ষে নিজের দায়িত্বে ও পরিচালনায় পোলাও, কোরমা, পাক করে মিন্নাট মিন্নাট ডেকচি ভরতি করে শহরের বিভিন্ন মহল্লায় প্রেরণ করতেন। মহরম মাসের আশুরা বা প্রথম দশ দিন তিনি ঢাকার দরিদ্র জনগনকে ভুড়ি ভোজে আপ্যায়িত করতেন।

৪. Sayed Muhammed Taifoor, op .cit., p. 267.

৫. Ibid

৬. Ibid

৭. আঃ কঃ মঃ যাকারিয়া, 'বাংলাদেশের প্রত্ন সম্পদ', (বাংলাদেশ শিল্প কলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৮৪), পৃ. ৪৪৮।

৮. Ahmad Hasan Dani, Dacca A Record of Its Changing Fortunes, (Asiatic press,1962),p. 193

৯. আমাদের মতে মসজিদটি তারা বা সিতারা মসজিদ নামে অভিহিত হওয়া উচিৎ নয়, কেননা এতে ইতিহাসের বিকৃতি ঘটে। যে ব্যক্তিটি মসজিদটি প্রথম নির্মান করেন সেই মির্জা গোলাম পীরের নামেই ইহার নামকরণ করা উচিৎ। তা না হলে আমরা এক্সে এক্সে ঢাকার আদি ইতিহাসকে ভুলে যাব।

১০। মোঃ আবদুর রশিদ, ঢাকা নগরীর মসজিদ নির্দেশিকা (ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ ১৯৮৭), পৃ. ৪৫।

১১. অধ্যাপিকা আয়েশা বেগম, "তারা মসজিদ অতীত ও বর্তমান" শিরোনামায় লিখিত প্রবন্ধে (দ্রষ্টব্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, দ্বাত্রিংশ সংখ্যা অক্টোবর, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা ২০৭ চিত্র -১) আদি তারা মসজিদের যে চিত্র সংযোজন করেছেন তা ভুল, কেননা আদি তারা মসজিদে কোন বারান্দা বা এর পূর্ব দেয়ালে পাঁচটি দরজা ছিল না।

Dhaka University Institutional Repository

১. মীর্জা গোলাম পীরের মসজিদ / পাঁচ গম্বুজ ও মিনার (উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ)।

২. মীর্জা গোলাম পীরের মসজিদ / তিন গম্বুজ ও মিনার (পুরাতন)।

Dhaka University Institutional Repository

৩. মীর্জা গোলাম পীরের মসজিদ / প্রধান প্রবেশ পথ (পুরাতন) ।

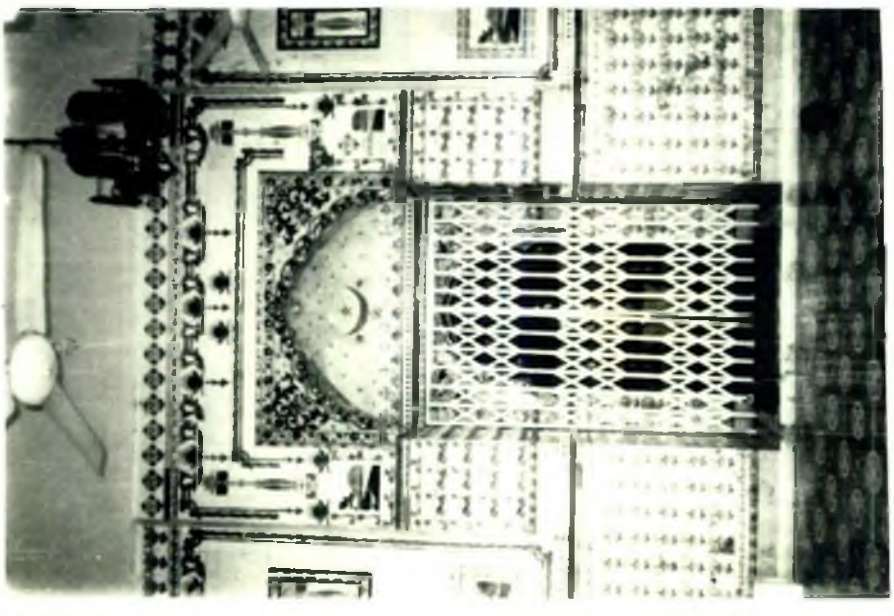

৪. মীর্জা গোলাম পীরের মসজিদ / পার্শ্ববর্তী (পুরাতন) বর্তমানে মধ্যবর্তী প্রবেশ পথ ।

Dhaka University Institutional Repository

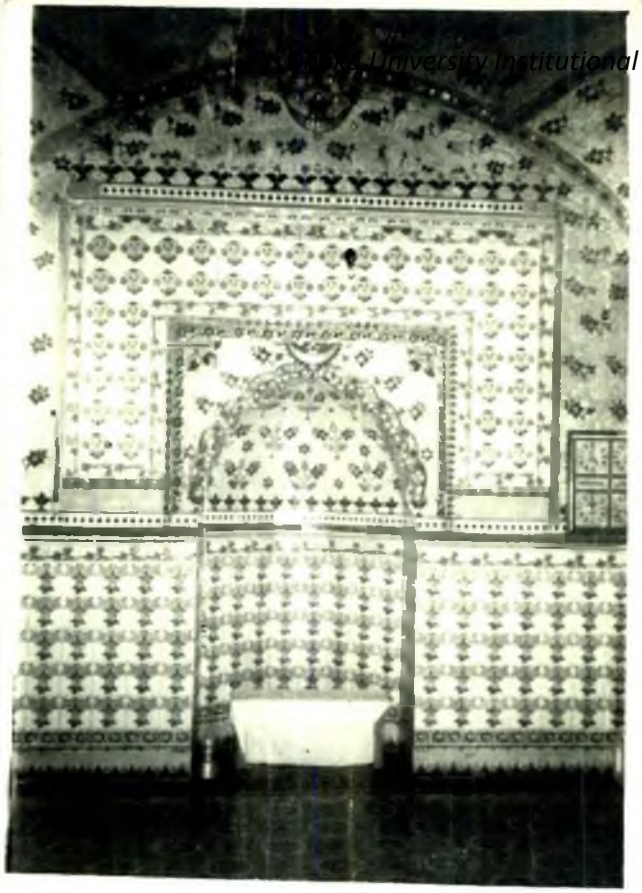

৫. মীর্জা গোলাম পীরের মসজিদ, প্রধান মিহরাব (পুরাতন) ।

Dhaka University Institutional Repository

আমীর উদ্দীনের মসজিদ

বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে বাদামতলী ঘাটের নিকটে বাবু বাজার সেতুর পূর্ব দিকে প্রাচীর বেষ্টিত স্থানে একটি অনুপম সৌন্দর্য বিশিষ্ট মসজিদ রয়েছে। এই মসজিদটি সাধারণতঃ দারোগা আমীর উদ্দীনের মসজিদ নামে পরিচিত। দারোগা আমীর উদ্দীনের পরিচিতি সম্পর্কে বিতর্কের অবকাশ রয়েছে। আ.ক.ম. যাকারিয়ার মতে, তিনি কুমিল্লা জেলার বাঙ্কারামপুর থানার অনুর্গত রূপসাদী গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন।[১] হাকিম হাবিবুর রহমান,[২] সৈয়দ মোহাম্মদ তৈফুর,[৩] ডঃ মাহমুদুল হাসান[৪] বলেন যে, তিনি ত্রিপুরা জেলার অনুর্গত রতন পুরের অধিবাসী ছিলেন। ডঃ আহম্মদ হাসান দানী[৫] ও আ.ক.ম. যাকারিয়ার[৬] বর্ণনা মোতাবেক তিনি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে পুলিশ বিভাগে চাকুরী করতেন। ডঃ সৈয়দ মাহমুদুল হাসান স্পষ্ট করে বলেছেন যে তিনি জন কোম্পানীর (John Company) দপ্তরে পুলিশ ইন্সপেক্টর ছিলেন। সেই সুযোগে তিনি প্রচুর অর্থ রোজগার করেন। এই অর্থ দ্বারা তিনি জমিদারী এস্য করে একটি বাসোপযোগী দালান, মসজিদ, এবং মাকবারা নির্মান করেন।[৭] কিন্তু বর্তমান গবেষক এ সম্পর্কে একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করেছেন।[৮] আমীর উদ্দীনের উত্তর পুরুষ ঐ স্থানের অধিবাসী গোলাম কুতুবে রাব্বানী ওরফে আবদুল গণি এবং তার ভাই গোলাম মাহবুবে রাব্বানী আমীর উদ্দীনের প্রৌপুত্র হিসেবে দাবী করেন। তাদের বর্ণনা মোতাবেক আমীর উদ্দীন সাহেব বাংলাদেশের বাইরের অধিবাসী ছিলেন। এবং আঠারো শতাব্দীর প্রথম দিকে ঢাকাতে আসেন। তিনি চিশতিয়া তরীকার অনুরূপ জাজুলিয়া তরীকার বিশিষ্ট শাখা দারকোয়া তরীকার অনুর্ভূক্ত ছিলেন। দারকোয়া সম্ভবত ফার্সি শব্দ। জাজুলিয়া তরীকার বিশিষ্ট শাখা হিসেবে একদা এই তরীকা প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। আলজেরিয়া ও মরক্কোতে এখনও এই তরীকার অস্তিত্ব রয়েছে। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে এই তরীকার উদ্ভব ঘটেছিল।[৯] আমীর উদ্দীনের মসজিদের নির্মান তারিখ অনেকেই উল্লেখ করেন নি। আজী মুহম্মদ হায়দার[১০] হলেন একমাত্র ঐতিহাসিক যার মতে, ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে এই মসজিদটি নির্মিত হয়েছে।

আভ্যন্তরীন ক্ষেত্রে আমীর উদ্দীন এর মসজিদের দৈর্ঘ্য ৩৬'-৩" প্রস্থ ১৩'-১" এর কাসাদে তিনটি দরজা এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিকে আরও দুটো দরজা রয়েছে। এভাবে দরজার সংখ্যা হয়েছে সর্বমোট পাঁচটি। কেন্দ্রীয় দরজাটি দুই পার্শ্বের দরজা হতে উন্নত-তর।

এটা ঈষৎ উদ্‌গত আকারের । সবগুলি দরজাই আয়তাকার কাঠামোর মধ্যে অবস্থান করছে । এর দক্ষিণ, পূর্ব ও উত্তর দিকে তিনটি আধুনিক বারান্দা নির্মিত হয়েছে । দক্ষিণ দিকের বারান্দাটি ১০'-৮" প্রশস্থ । পূর্ব দিকের বারান্দাটি দৈর্ঘ্যে ৩৮'-৩" এবং প্রস্থে ১৫'-৮" । (ভূমি নকশা ৮)

মূল মসজিদের চারি কোনায় চারটি মিনার রয়েছে । এই মিনারগুলি ছাদের উপর উঠে গেছে ।

এই মসজিদটি তিন 'আইল' গভীর । কেন্দ্রীয় 'নেভটি' পার্শ্ববর্তী আইল হতে প্রশস্থতর । মসজিদের তিনটি দরজা ও তিনটি আইলের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে এদের উপর তিনটি গম্বুজ নির্মান করা হয়েছে । কেন্দ্রীয় গম্বুজটি অর্ধগোলকবৎ । এর বহিঃভাগ দশটি পাঁজর বা রিব্রেলে বিভক্ত । প্রতি দুটি পাঁজরের মধ্যবর্তী দূরত্ব ৫'-০" । কাজেই এই গম্বুজের পরিধি হলো ৫০'-০" । পার্শ্ববর্তী গম্বুজদ্বয় তরমুজের আকৃতিতে নির্মিত । আমীর উদ্দীনের মসজিদের এ একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এই জন্যে যে, বাংলাদেশের স্থাপত্যে তরমুজের আকৃতি বিশিষ্ট্য গম্বুজ আর দেখা যায় না । পার্শ্ববর্তী গম্বুজগুলিও রিব্রেল বিশিষ্ট । এই দুটো গম্বুজ সাতটি পোলিক্সে ছয়টি ভাগে বিভক্ত । প্রতি দুটি পোলিক্সের মধ্যবর্তী দূরত্ব হলো ৫'-৪" । তাই এ দুটি গম্বুজের প্রতিটির পরিধি ৩২'-০" । আমীর উদ্দীনের মসজিদে তিনটি আইলের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে তিনটি মিহরাব নির্মান করা হয়েছে । কেন্দ্রীয় মিহরাবটি বৃহত্তম । এখানে কোন মিম্বার নেই ।

যে পদ্ধতিতে এই মসজিদের তিনটি গম্বুজ উত্তোলিত করা হয়েছে তা অত্যন্ত আকর্ষ-ণীয় । কেন্দ্রীয় গম্বুজটির বর্গের কোনাতে সূক্ষ্মাগ্র ফলা বিশিষ্ট স্কুইঞ্চ নির্মান করা হয়েছে । প্রতি দুটো সূক্ষ্মাগ্র ফলা বিশিষ্ট স্কুইঞ্চের মধ্যে রয়েছে অগভীর সূক্ষ্ম ফলা বিশিষ্ট স্কুইঞ্চ । এই স্কুইঞ্চের উপর নির্মিত হয়েছে গম্বুজ । কিন্তু পার্শ্ববর্তী গম্বুজ নির্মানে সম্পূর্ণ ভিন্ন-তর পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে । এখানে বর্গের চার কোনাতে রয়েছে চারটি স্কুইঞ্চ । দুটো স্কুইঞ্চের মধ্যে নির্মান করা হয়েছে একটি সহযোগী স্কুইঞ্চ, এভাবে উত্তরণ স্থল একটি অষ্টভুজের রূপ নিয়েছে । এই অষ্টভুজের আটটি কোনাতে আবার স্কুইঞ্চ নির্মিত হয়েছে । প্রতি দুটো স্কুইঞ্চের মধ্যে রয়েছে সহযোগী স্কুইঞ্চ । বস্তুতপক্ষে এখানে প্রতিটি

Dhaka University Institutional Repository

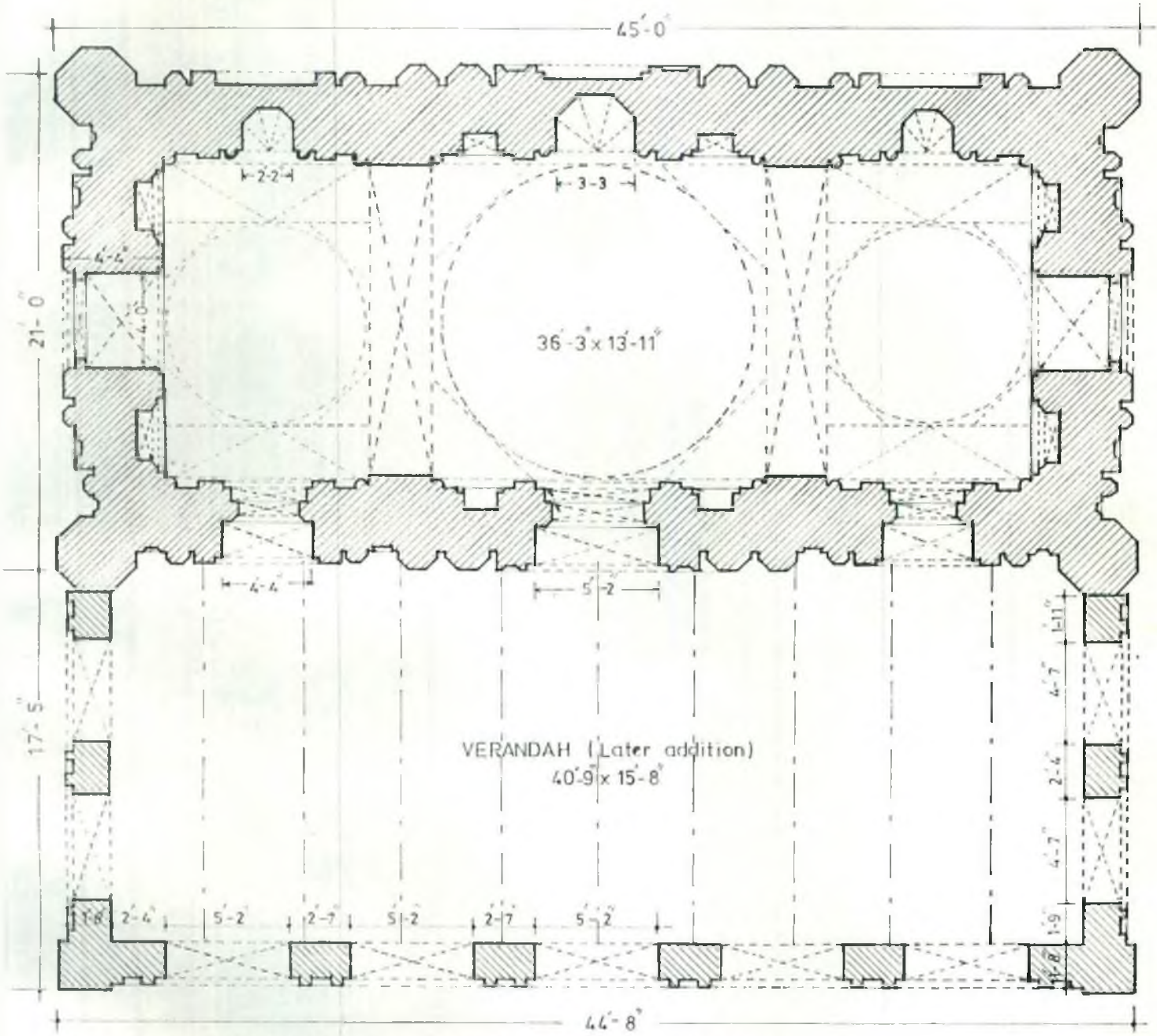

PLAN OF DAROGHA AMIRUDDIN'S MOSQUE, DHAKA.

6 4 2 0 6 12 FEET

SCALE OF FEET

ভূমি নকশা ৮

Dhaka University Institutional Repository

স্কুইঞ্চের দুটো উদ্দেশ্য রয়েছে । একটি কাঠামোগত ও অন্যটি অলংকারিক ।

আমীর উদ্দিনের মসজিদ অলংকরণের জন্য প্রসিদ্ধ । অধিকাংশ অলংকরণই ফ্রেস্কো, টাটকা পলস্তরার উপর পানি রং এ করা প্রাচীর চিত্র । দরজাগুলি সূচ্যাগ্র কলা

বিশিষ্ট খিলানের মধ্যে স্থাপিত । এই খিলানের দুটো স্প্যান্ড্রিল ডান, বাম, ও উপরে কুনেল স্ক্রোল (Scroll) সহ বিভিন্ন নক্সায় অলংকৃত হয়েছে । খিলানের আয়তাকার কাঠামোর উপরিভাগ পাঁচটি প্যানেলে বিভক্ত । কেন্দ্রীয় প্যানেলের উভয় পার্শ্বে দুটি কুনেল চারার চাকতি রয়েছে । খিলানী কাঠামোর এক্সট্রাডোস (Extrados) এর প্রতিটি পার্শ্ব ৭টি প্যানেলে বিভক্ত । সর্বোচ্চ অংশের নীচে তিনটি প্যানেল বিভিন্ন নক্সায় অলংকৃত হয়েছে । নিম্নের তিনটি প্যানেল ফাঁকা । কেন্দ্রীয় দরজার উভয় পার্শ্বে দুটো বড় পলতোলা স্তম্ভ রয়েছে, যারা একটি সুবৃহৎ পূর্ণ কলস বিশিষ্ট পাদপীঠের উপর দণ্ডায়মান। পার্শ্ববর্তী দরজা দুটোর প্রতিটির উপরের অংশ হলদে ফুল ধারণকারী চারা দ্বারা অলংকৃত হয়েছে । খিলানের স্প্যানড্রিল এর উপরস্থ প্যানেলের দুটি কিনারা দু'টো সুন্দর ফুল দ্বারা চিহ্নিত হয়েছে । দু'টি স্প্যানড্রিল এর কোনা অর্ধ বিকাশোন্মুখ সুন্দর ফুল দ্বারা পরিশোভিত। সূচ্যাগ্র কলা বিশিষ্ট খিলানের উপরিভাগ সর্পিল রজ্জু সদৃশ দু' সারি অলংকরণ দ্বারা বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত । খিলানের শীর্ষদেশে একটি বৃহৎ কুনেল স্ক্রোল শোভা পাচ্ছে । খিলানের এক্সট্রাডোস কয়েকটি প্যানেলে বিভক্ত রয়েছে । এদের কয়েকটি পুষ্প অলংকরণ এবং কয়েকটি ইনগ্রেইন্ড খিলানী নক্সা দ্বারা অলংকৃত হয়েছে ।

কেন্দ্রীয় মিহরাবটি সূচ্যাগ্র কলা বিশিষ্ট দ্বি খিলান । আকৃতিতে ইহা অর্ধ অষ্টভুজ । এর আভ্যন্তরীন অর্ধ গম্বুজাকৃতিক অংশ নয়টি অন্ধ খিলানে বিভক্ত । তারিক স্তম্ভ এ খিলানগুলি বহন করছে । খিলানের বক্র চাপের মধ্য ও উপরি অংশ বিভিন্ন প্রকার নক্সায় অলংকৃত হয়েছে । এর তক্ত ফুল এবং পাতা নক্সার মধ্যসু চাকতি বিশেষ । সূচ্যাগ্র কলা বিশিষ্ট খিলান অর্ধ নিমগ্ন স্তম্ভ দ্বারা বাহিত । এতে রয়েছে জেব্রাডোরা অলংকরণ ।

Dhaka University Institutional Repository

কেন্দ্রীয় মিহরাবের বাহু দুটোকে এক্ষ হ্রাসমান করিনথিয়ান স্তম্ভ ধরে রেখেছে। পার্শ্ববর্তী মিহরাব দু'টো আয়তাকার কাঠামোর মধ্যে সুবৃহৎ সূক্ষ্মাগ্র ফলা বিশিষ্ট খিলান। এই আয়-তের উপর অংশ ঘন রং এর ফুল গাছ দ্বারা আঁকানোভাবে অলংকৃত। অনুভূমিক রেখা দুটোর চূড়ান্ত বিন্দু হতে দুটো বাহু কিছু দূরে নেমেছে। এতে জটিল ধর্মী ফুলেল নক্সা শোভা পাচ্ছে। অনুভূমিক রেখার নীচে এবং দুটো বাহু দ্বারা নির্দেশিত সীমার মধ্যে পুষ্প অলংকরণ এখানকার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। খিলান গুলির স্প্যানড্রেল সমূহ কোনাতে অর্ধবিকা-শোম্মুখ ফুল দ্বারা সজ্জিত হয়েছে। সূক্ষ্মাগ্র ফলা বিশিষ্ট খিলানের বাঁক জুড়ে রয়েছে দু'সারি সর্পিল আকারের আঁকাবাঁকা নক্সা। এখানে অর্ধ চন্দ্রাকৃতি অংশ ফুলেল স্ক্রোল দ্বারা চিত্রিত হয়েছে। খিলান সমূহের আয়তাকার কাঠামোর বাহুগুলি পলতোলা স্তম্ভের উপর অবস্থান করছে। এই স্তম্ভে রয়েছে করিনথিয়ান স্তম্ভশীর্ষ। স্তম্ভ সমূহ অবশ্য কলস সম্বলিত পাদানীর উপর দণ্ডায়মান।

কেন্দ্রীয় গম্বুজের বর্গের কোনার দুটো সূক্ষ্মাগ্র ফলা বিশিষ্ট খিলানী কাঠামোর মধ্যে অগভীর সূক্ষ্মাগ্র খিলানী কাঠামো নির্মান করা হয়েছে। সূক্ষ্মাগ্র খিলানের উপরে তিনটি সা-রিতে বিভিন্ন নক্সায় অত্যন্ত আঁকানো অলংকরণ রয়েছে। নিম্নতম সারিটিতে রয়েছে গাছ গাছড়া, লতা-পাতা, পুষ্প সম্ভারের সমারোহ। মধ্যের সারিটি পরস্পর বুনট আকারে গ্রথিত অর্ধ চন্দ্রাকৃতির মালা দ্বারা বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত। । উপরের সারিটিতে রয়েছে অন্ধ মার্লন। পার্শ্ববর্তী গম্বুজের স্কুইঞ্চের উপরে পত্রালংকার গম্বুজের ভীত পরিশোভিত করেছে। গম্বুজের তক্ত এ রয়েছে ফুলেল স্ক্রোল। বর্গের স্কুইঞ্চের চূড়ায় ফুল শোভা পাচ্ছে।

মানারার উপরের অংশটি আটটি অষ্টভুজ দ্বারা বিভক্ত হয়েছে। প্রতিটি অষ্টভুজ অলংকৃত হয়েছে ইনগ্রেইল্ড খিলান সহযোগে। এই ইনগ্রেইল্ড খিলানী কাঠামো ক্ষুদ্রতর স্তম্ভের উপর দণ্ডায়মান। এর উপরে রয়েছে অষ্ট ভুজাকার ছাইচ। পরবর্তী স্তরে অষ্ট ভুজাকার মঞ্চের উপরে আটটি পাঁজর বিশিষ্ট kiosk বা মণ্ডপ নির্মিত হয়েছে। মঞ্চের ভীতে পত্রালংকার শোভা পাচ্ছে। আর kiosk এর উপর ফিনিয়াল নির্মিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

আমীর উদ্দিনের মসজিদটি বুড়ীগঙ্গা নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত। এই জন্যই এর একটি পরিবেশগত সৌন্দর্য রয়েছে। নদীর বক্ষ হতে এর সৌন্দর্য সম্যক উপলব্ধি করা যায়। নির্মান পরিকল্পনা ও অলংকরণে এই মসজিদে যে কারিগরী দক্ষতা ও সৌকুমার্য পরিলক্ষিত হয় তার জন্য এটা মহানগরীর স্থাপত্য শিল্পে একটি মাইল ফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। বস্তুতপক্ষে এর অলংকরণের জন্য এটাকে জহুরীর বাক্স (Jeweller's Box) রূপে গন্য করা যেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১. আঃ কঃ মু. যাকারিয়া, বাংলাদেশের প্রত্ন সম্পদ, (বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী,), ১৯৮৪), পৃ ,৪৫৩ ।

২. হাকিম হাবিবুর রহমান, আসুদ গান-ই-ঢাকা', (১৯৪৬) পৃ. ২১ ।

৩. Syed Muhammed Taifoor, Glimpses of Old Dhaka, (The Pioneer Pr nting Press Ltd. 1956), p. 266.

৪. Dr. Syed Mahmudul Hasan, Dacca the City of Mosques, (Islamic Foundation Bangladesh, 1981), p. 45.

৫. Ahmad Hasan Dani, Dacca A Record of Its Changing Fortunes, (Asiatic Press, Dacca 1962,), p. 202.

৬. আঃ কঃ মুঃ যাকারিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৩ ।

৭. Dr. Syed Mahmudul Hasan, op.cit., p.46.

৮. এই তথ্য অনুসারে দারোগা আমীর উদ্দীনের মসজিদটি দারকোয়া আমির উদ্দীনের মসজিদ নামে অভিহিত হওয়া উচিৎ । আমীর উদ্দীনের প্রৌপুত্র দুয়ের লিখিত শিলের চিঠিখানা এই কথাই বলে ।

৯. ফকির আবদুর রশিদ, সুফী দর্শন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০, পৃ. ২১৬ ।

১০. Azimusshan Haidar, A City and Its Civic Body (Dacca Municipality, 1966), p. 12

Dhaka University Institutional Repository

মৌলবী আমিরউদ্দিন সাহেবের পরিচিতি

নওয়াব নুসরাত জঙ্গের পর ঢাকার অভিজাত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে মৌলবী আমিরউদ্দিন সাহেবের নাম অন্যতম। জনাব আমিরউদ্দিন সাহেবের পূর্ব পুরুষ জনাব আকবর আলি বাংলাদেশের বাহির হইতে আসিয়া ত্রিপুরা জেলার রতনপুরে বসতি স্থাপন করেন। পরবর্তীতে ঢাকায় স্থায়ী ভাবে বসবাস শুরু করেন। তাঁহাদের ত্রিপুরা জেলায় বর্দাখাত পরগনায়, ময়মনসিংহ ও ঢাকা জেলায় বিভিন্ন জায়গায় বিরাট জমিদারী ছিল। জনাব আমিরউদ্দিন সাহেব নিজে ঢাকা শহরের বুড়িগঙ্গা নদী তীরে বাদামতলি নামে পরিচিত এলাকায় (যাহা দনদরবার একটি সুন্দর বাড়ি ও মসজিদ নির্মাণ করিয়াছু নামের সহিত সেখানে বসবাস করিতে থাকেন।

নওয়াব নুসরাত জঙ্গের ছোট ভাই সৈয়দ আহাম্মদ আলি খান বাহাদুর এর সহিত আমিরউদ্দিন সাহেবের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। তাহারা উভয়েই বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধাচার জন্য বিরাগ-ভাজন হন। এবং এই সময় ~~উভয়ই~~ উভয়ই কারাগারে বন্দি হন। আমিরউদ্দিন সাহেব ঢাকার কারাগারে আবদ্ধ হন ~~এবং~~ সৈয়দ ~~আহাম্মদ~~ আহম্মদ আলিকে কলকাতায় নজর ~~বন্দী~~ বন্দি রাখেন। পরবর্তীতে নওয়াব নুসরাত জঙ্গের প্রভাবে উভয়ই মুক্তিলাভ

Dhaka University Institutional Repository

হইতে মুক্তি পান। কিন্তু ইংরেজ সরকার আমিরউদ্দিন সাহেবের প্রতি ভাল ধারনা না থাকায় কারণে তাঁহার নির্মিত সুন্দর বহুত বাড়িটি রিকোজিশনের মাধ্যমে দখল করিয়া হস্পিটাল হাট নির্মান করে। তাঁহার নির্মিত সুন্দর প্রাচীন মসজিদ, পারিবারিক গোরস্থানে তাঁহার কবরের উপর নির্মিত বিরাট গম্বুজের সমাধি আজও তাঁহার স্মৃতি বহন করিতেছে। তাঁহার জমিদারী অধিকাংশই ~~অধি~~ অধিক পুত্র গোলাম মওলার সময়ে রাজস্ব খাজনা বাকি থাকায় নিলাম হয়ে যায়।

মৌলবী ~~আ~~ আমিরউদ্দিন সাহেবের আরবি ও ফার্সি ভাষায় ভাল জ্ঞান ছিল। তাঁহার হাতের লেখা খুব সুন্দর ছিল। তিনি শেষ বয়সে জমিদারী সকল কার্যকর্ম ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র ধর্মকর্মে আত্ম নিয়োগ করেন এবং নিজ হাতে কোরান ও কিছু ছোট পুস্তিকা লিখিয়া যান। যাহার কিছু নিদর্শন এখনও আছে।

তিনি আধ্যাত্মিক জগতে প্রভূত উন্নতি করিয়া একজন সাধক পুরুষ রূপে পৃথিবী হইতে বিদায় নেন। তাঁহার আধ্যাত্মিকতার বহু গল্প লোকেদের মুখে শুনা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি শেষ জীবনে একজন কামেল ওলী রূপে নিজের প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি "দারবেশীয়া" তরিকার একজন ভক্ত ছিলেন। মনে হয় "দারবেশীয়া" শব্দটি ভুলবশতঃ তাঁহার নামের সহিতঃ দারগা বলিয়া উল্লেখ করা ~~হইয়াছে~~ হইয়াছে। তাঁহার নামের সহিত দারগা শব্দটি সংযুক্ত করিয়া একটি বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হইয়াছে; যে তিনি ইংরেজ সরকারের অধীনে চাকরী করিয়াছেন। যাহা সঠিক নহে। তাঁহার সঠিক নাম মৌলবী আমিরুদ্দিন হাওলাদার। তিনি একজন ধর্মপরায়ন মুসলিম ছিলেন। এই সত্য তথ্যটি তুলিয়া ধরার জন্যই তাঁহার অধঃস্তন পুরুষ হিসাবে মৌলবী আমিরুদ্দিন সাহেবের পরিচিতি তুলিয়া ধরা হইল।

এই সংগে জনাব আমিরুদ্দিন সাহেবের বংশ তালিকা সংযুক্ত করা হলো।

[illegible]
২৯ নং [illegible] ৩৩ রোড
[illegible], ঢাকা
[illegible] ৫০০২১৬

[illegible]
৭নং [illegible] রোড
[illegible], ঢাকা
২৯/৭/৯২

Dhaka University Institutional Repository

বংশ তালিকা

- মৌলবী আমিরউদ্দিন সাহেব
  - মুন্সী দেলওয়ার আলি (নিঃসন্তান)
  - আয়েশাতুন্নেছা (জামাতা ইসমাইল দেওয়ান আলি)
  - মুন্সী ইউসুফ আলি
    - গোলাম মওলা
      - (নুরুন্নেছা)
  - মুন্সী উজির আলি
    - রেজা রব্বানী (জীবন মিয়া)
      - মো: জমির উদ্দিন (দুই কন্যা)
      - মো: বোনাজিং আহাম্মেদ (নিঃসন্তান)
      - খোকা মিয়া (নিঃসন্তান)
      - গোলাম রব্বানী (লাল মিয়া)
        - গোলাম কুদ্দুসে রব্বানী (সান মিয়া)
          - গোলাম ফারুক রব্বানী
          - হামিদা বেগম
          - গোলাম আনোয়ার রব্বানী
          - ফাহিমা বেগম
          - রাশিদা বেগম
        - গোলাম মাহবুবে রব্বানী (টুলু মিয়া)
          - গোলাম মাহফুজ রব্বানী
          - শাহানুর আক্তার
          - খাদিজা পারভীন
          - গোলাম আজাদ
        - কানিজ ফাতেমা রব্বানী (রানী)

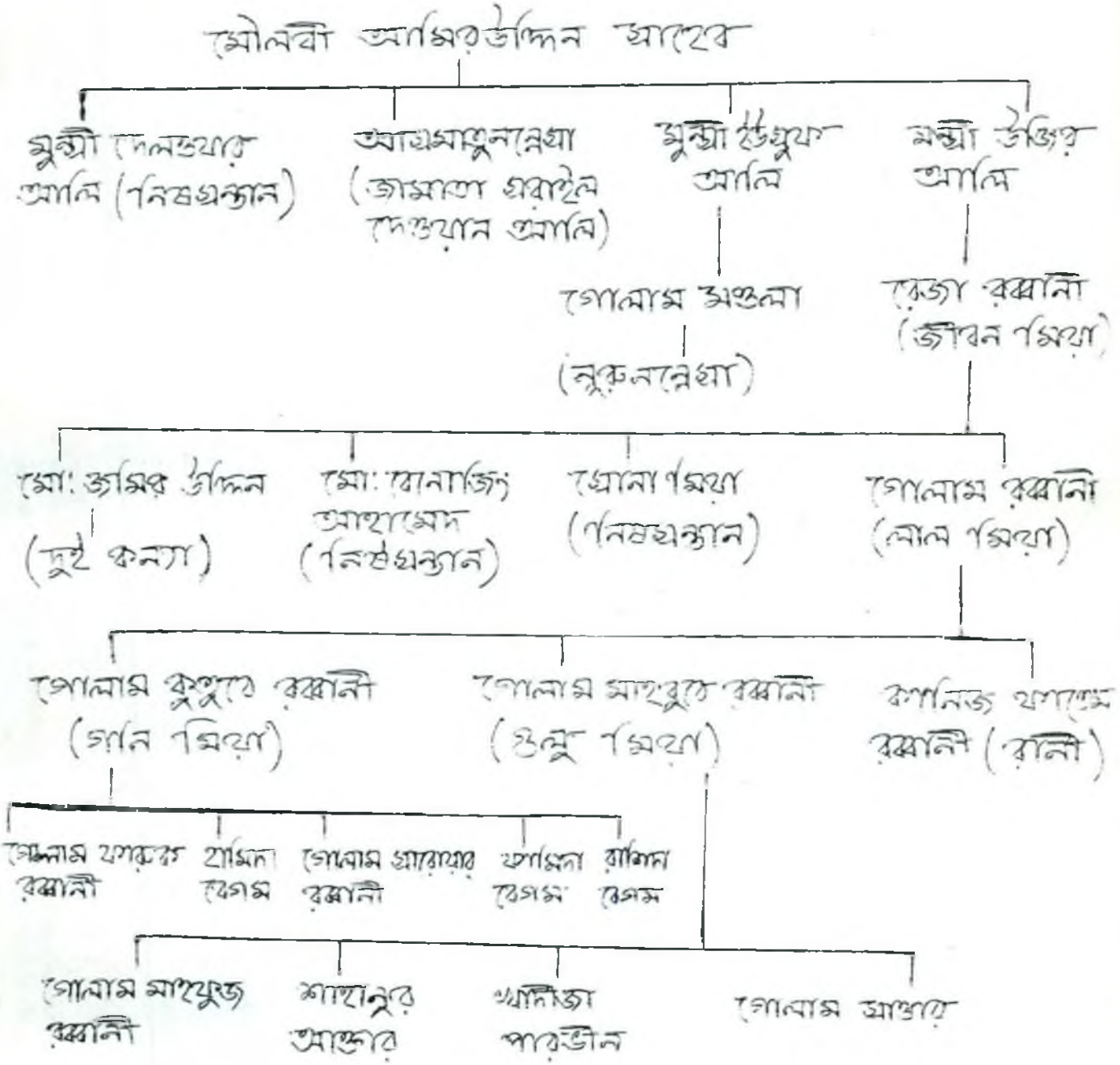

(গোলাম মাহবুবে রব্বানী)
২৭/৭/১২

Dhaka University Institutional Repository

১. আমীর উদ্দীনের মসজিদ, (ঊনবিংশ শতাব্দী) তিন গম্বুজ ও মিনার।

২. আমীর উদ্দীনের মসজিদ (পিছনের দৃশ্য)।

Dhaka University Institutional Repository

৩. আমীরউদ্দীনের মসজিদ, প্রধান প্রবেশ পথ।

৪. আমীর উদ্দীনের মসজিদ, প্রধান মিহরাব

Dhaka University Institutional Repository

৫. আমীরউদ্দীনের মসজিদ, প্রধান গম্বুজের স্কুইঞ্চ ।

৬. আমীরউদ্দীনের মসজিদ, পার্শ্ববর্তী গম্বুজের স্কুইঞ্চ।

Dhaka University Institutional Repository

স মা ধি সৌ ধ

Dhaka University Institutional Repository

বিবি চাম্পার সমাধি

ছোট কাটরার প্রাঙ্গনের মধ্যে বিবি চাম্পার সমাধি সৌধ নির্মিত হয়েছে । এই সমাধি সৌধটি নওয়াব শায়েস্তা খান তাঁর দ্বিতীয় দফা শাসনামলে নির্মান করেছিলেন । বিবি চাম্পার সঠিক ইতিহাস আজও অজ্ঞাত । তবে এটা সত্য যে বিবি চাম্পার নামানুসারে এই মহল্লার নাম চাম্পাটুলী হিসেবে প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে । তবে **কেউ** হয়ত অনুমান করেন যে এই মহল্লাতে কোন এক সময় চাম্পা চারা গাছ জন্মাত, যার জন্য এই মহল্লার নামকরণ করা হয়েছে চাম্পাটুলী ।[১] কিন্তু এই অভিমত গ্রহণযোগ্য নয় ; কেননা বিবি চাম্পার সমাধি সৌধের উপস্থিতি প্রমান করে যে, এই মহল্লার নাম বিবি চাম্পার নাম অনুসারেই করা হয়েছে ।[২]

বিবি চাম্পার পরিচিতি সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে ভয়ংকর বিতর্ক রয়েছে । মিঃ র‍্যাংকিন,[৩] এফ. বি. ব্রাডলি বার্ট[৪] প্রভৃতি ইংরেজ ঐতিহাসিকদের মতে বিবি চাম্পা নওয়াব শায়েস্তা খানের জনৈকা দুহিতা ছিলেন । হাকিম হাবিবুর রহমান তাঁর "আসুদ-গান-ই-ঢাকা" গ্রন্থে স্থানীয় ঐতিহ্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেছেন যে তিনি ছিলেন শায়েস্তা খানের উপপত্নী ।[৫] তিনি মিঃ র‍্যাংকিন এর মতবাদকে অস্বীকার করেন । হাকিম হাবিবুর রহমানের যুক্তি এই যে, গোলাপ, চাম্পা ও চামেলী মুঘল যুগের রাজকীয় অন্তঃ পুরিকার দাসীদের অত্যন্ত সাধারণ নাম হিসেবে বিবেচিত ছিল । এই জন্যই তিনি বিবি চাম্পাকে শায়েস্তা খানের উপ-পত্নী বা বাদী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন ।[৬] ডঃ আহম্মদ হাসান দানী[৭] ও ডঃ সৈয়দ মাহমুদুল হাসান অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করেই হাকিম হাবিবুর রহমানের মতামতকে স্বীকার করে নিয়েছেন[৮]; কিন্তু শ্রী যতীন্দ্র মোহন রায় শায়েস্তা খানের কন্যা মতবাদ বা উপ পত্নী মতবাদ সরাসরি অস্বীকার করেছেন ।[৯] সৈয়দ মোহাম্মদ তৈফুর[১০] ও আঃ কঃ মঃ যাকারিয়া[১১] এ বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে না আসতে পেরে বিবি চাম্পাকে শায়েস্তা খানের বাঙ্গালী পত্নী বা উপ-পত্নী বলে রায় দিয়েছেন । তাঁদের এই অভিমতের পিছনে অবশ্য যুক্তি রয়েছে । 'মায়াসির-উল-উমারা' গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, নওয়াবের প্রথম ও আদী বেগম ছিলেন আবদুর রহমান খান-ই-খানানের পুত্র শাহ নেওয়াজ খানের কন্যা । আর নওয়াবের অন্যান্য পত্নীগণ ছিলেন নিছক উপ-পত্নী মাত্র ।[১২] বস্তুত পক্ষে সম্রাট

Dhaka University Institutional Repository

জাহাঙ্গীর শায়েস্তা খানের সাথে শাহনেওয়াজ খানের কন্যার বিবাহের ব্যবস্থা করেছিলেন।[১৩] আধুনিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে আজিমুশ্শান হায়দার বিবি চাম্পাকে নওয়াব শায়েস্তা খানের বাঙ্গালী বেগম[১৪] এবং মওদুদুর রশিদ তাঁকে শায়েস্তা খানের অন্যতম স্ত্রী বলে অভিহিত করেন।[১৫] তাঁরা আরো বলেছেন যে বিবি চাম্পা ছিলেন শাহজাদা খোদাবন্দ খানের মাতা যিনি সাধারণতঃ মির্জা বাঙ্গালী নামে বিখ্যাত। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে সমাধি সৌধের দ্বার পথের উপরে একটি অনুলিপিসহ এক খানা ফলক ছিল যা হারিয়ে যাওয়াতে এই অসু-বিধার সৃষ্টি হয়েছে। (ভূমি নকশা ৯)। আমরা শেষোক্ত মত সমর্থন করি। এর অবশ্য কারণ রয়েছে প্রথমতঃ, বাংলার স্থাপত্যে নর্তকী ও বাইজীদের দ্বারা নির্মিত মসজিদ রয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ গৌড়ের লোটন মসজিদ এবং ঢাকার ইসলাম পুরের বাইজী মসজিদ। ইসলামী স্থাপত্যে বিশেষতঃ বাংলাদেশীয় স্থাপত্যে উপ-পত্নীর জন্য কোন মসজিদ বা সমাধি সৌধ প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি। স্পেনের তৃতীয় আবদুর রহমান অবশ্য তাঁর উপ-পত্নী যোহরার নামে একটি প্রাসাদ তৈরী করেছিলেন। দ্বিতীয়তঃ শাহজাদা খোদাবন্দ খান ওরফে মীর্জা বাঙ্গালীর বংশধররা এখনও ঢাকায় বসবাস করছেন। তারা শায়েস্তা খানের বৈধ বংশধর হিসেবে দাবী করেন। তাদের কুলজী শাস্ত্র অনুসন্ধান করে উপ-পত্নী সম্পর্কীয় কোন তথ্য পাওয়া যায় না। কাজেই বিবি চাম্পা শায়েস্তা খানের বৈধ বাঙ্গালী বেগম ছিলেন।

বিবি চাম্পার সমাধি সৌধ ২৫'-০" বিশিষ্ট একটি বর্গক্ষেত্র এর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, একে একটি বর্গাকার ইমারত বলে মনে হলেও অভ্যন্তর ভাগকে একটি অষ্ট কোনা-কার দালান বলে ভ্রম হয়। এর কারণ হল বিবি চাম্পার সমাধি সৌধ ইট, চুন ও সুরকীর একটি বিলক্ষণ প্রসস্তর স্তুপ। অভ্যন্তরীন ক্ষেত্রে চার পার্শ্বে চারটি বিশালাকার খিলান বিশিষ্ট কুলজি, চারটি দরজা ও চারটি কোনের আনজাম দিতে গিয়ে এই সম্ভাব্য অষ্ট কোনের সৃষ্টি হয়েছে। এই বর্গাকার ইমারতের চারিটি কোনায় চারিটি বুরুজ ছাদের উপরে প্রথম অষ্টভুজ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। এই বুরুজগুলি সাধারণতঃ বৃত্তাকার, বিবি চাম্পার ক্ষেত্রে ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য, কেননা অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রায়ই অষ্ট কোনাকার বুরুজ লক্ষ্য করা যায়। এই সমাধি সৌধের চারিটি পার্শ্বের কেন্দ্রে চারটি উদ্গত সম্মুখভাগ রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

TOMB OF BIBI CHAMPA WITHIN CHHOTA KATRA, DHAKA

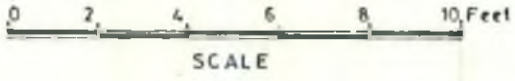

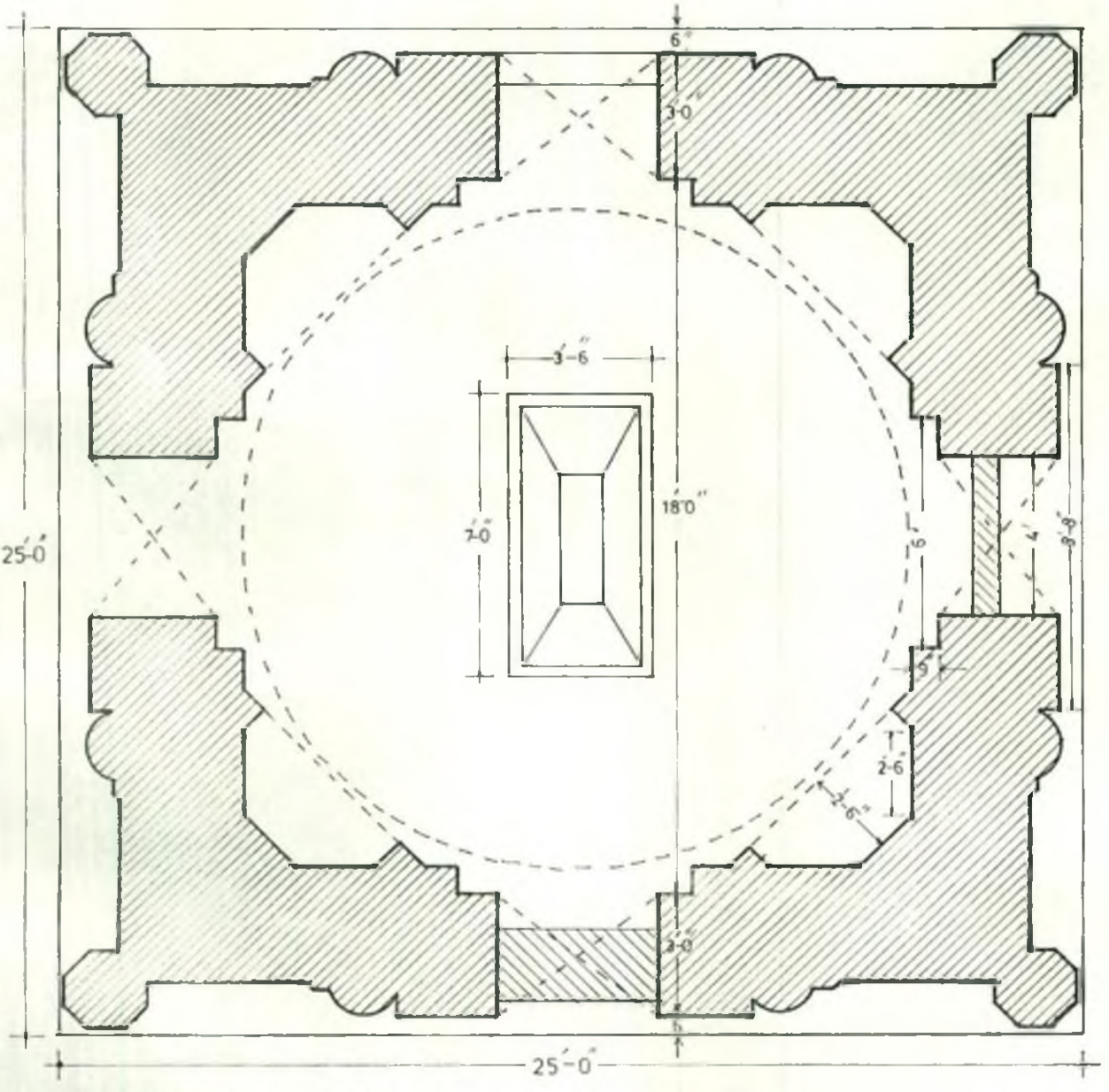

GROUND PLAN

ভূমি নকশা ১

Dhaka University Institutional Repository

বস্তুতপক্ষে গম্বুজটি ছাদের প্রায় সবটুকু স্থান অধিকার করে দিয়েছে । সমতল ছাদ বলতে কিছু আছে বলে মনে হয় না ।

আভ্যন্তরীন ক্ষেত্রে এই বর্গকার ইমারতের চারিটি কোনাতে চারটি বৃহৎ কুলঙ্গী বিশিষ্ট খিলান রয়েছে । এর দুটো খিলানের মধ্যে একটি করে চারটি সুগভীর কুলঙ্গী সমন্বিত খিলান আছে । পূর্ব দিকের খিলানটি গবাক্ষ পথ হিসেবে কাজ করে । আর পশ্চিম দিকের খিলানটি দ্বার পথ হিসেবে ব্যবহৃত হয় । এই দ্বার পথের একটি অসাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে । এ একটি সংকীর্ণ গলিপথ যা ১২'-৫" লম্বা এবং ৩'-১০" প্রশস্ত । এর মাধ্যমে সমাধি সৌধের অভ্যন্তর ভাগে পৌঁছা যায় । উত্তর ও দক্ষিণ দিকের খিলান বিশিষ্ট কুলঙ্গী গোলাপদানী, আতর দানী ও মোমবাতি ইত্যাদি রাখার জন্য ব্যবহৃত হত ।

এই ইমারতের চার কোনায় তথা দুইটি খিলানের মধ্যবর্তী স্থানে পেনডেনটিভ নির্মান করে উত্তরণের স্থল তরাট করে দেয়া হয়েছে । এভাবে উপরে একটি বৃত্ত গঠিত হয়েছে যার উপরে উত্তোলিত হয়েছে গম্বুজ । কিন্তু বাহ্যিক ক্ষেত্রে গম্বুজ উত্তোলনে এর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় । বর্গাকার ইমারতের চারিটি কোনায় যে চারটি ত্রিভুজাকার স্থান রয়েছে সেই ত্রিভুজাকার স্থান হতে দেয়াল ৩'-০" উঁচু হয়ে প্রথম অষ্ট কোনাকার কাঠামো সৃষ্টি করেছে । পরে আবার এই দেয়াল আরো ১'-৭" উচু হয়ে দ্বিতীয় অষ্টভুজ গঠন করেছে । এর উপরেই প্রায় ৩'-৬" উচ অষ্ট কোনাকার পিপা । এই পিপার উপরে উত্তোলিত হয়েছে গম্বুজ । গম্বুজটি অনেকটা উলটানো পিয়ালার মত । এতে রয়েছে দুইটি সংকীর্ণ তোরা । সমাধি ফলক একটি সহজ, সরল স্থাপত্য । আগেকার সমাধি ফলকটি এখন আর নেই, কেননা শেফার্ড নামক এক পাদ্রি এখানে বাস করতেন । যিনি কোন এক সময় আগেকার সেই সমাধি ফলকটিকে নষ্ট করে দিয়েছেন ।[১৬]

বিবি চাম্পার সমাধি সৌধটির তিনদিকে বিভিন্ন কারখানা ও দোকানপাঠ গড়ে উঠেছে । মাঝে মাঝে আবর্জনার স্তুপ লক্ষ্য করা যায়, ফলে এই সমাধি সৌধটি তার প্রাচীনত্ব হারাতে বসেছে । বর্তমানে এটি বাংলাদেশ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পুরাকীর্তি

Dhaka University Institutional Repository

সংরক্ষণ আইনের অন্তর্ভুক্ত করা হলেও এর কোন উল্লেখযোগ্য সংস্কার করা হয়নি বা এর চার পার্শ্ব পরিস্কার রাখার ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। বস্তুত বড় কাটরা বা ছোট কাটরার ওয়াকফকৃত জমি বেদখল হয়ে গেছে। সম্ভ্রম প্রদর্শনের জন্য এর সামাজিক গুরুত্ব রয়েছে। এখানে রীতিমত বাতি জ্বালানো হয় ও গোলাপ-পানি ছিটানো হয়, তবে এটা এখনও দরগায় রূপান্তরিত হয়নি।

তথ্য নির্দেশ

১. Azimusshan Haidar, Dacca History and Romance In Place Names, (Dacca Municipal Publication, 1967), p. 30-31./

২. Dr. Ahmad Hasan Dani, Dacca A Record of Its Changing Fortunes, (The Saogat Press, Dacca, 1956)/ p. 108, Syed Mahmudul Hasan, Ancient Monuments of East Pakistan, (The Pakistan Academy Publication, 1970) p. 118; শ্রী যতীন্দ্র মোহন রায়, 'ঢাকার ইতিহাস', ১ম খণ্ড (দি কমলা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, কলিকাতা, ১৩১৯ বাংলা সন), পৃ. ৩৩৮ / Syed Muhammed Taifoor, Glimpses of Old Dacca, (The Pioneer Printing Press Ltd. 1956, p. 150/ F.B. Bradley Birt. The Romance of An Eastern Capital. (Metropoliton Book Co. Pvt. Ltd. 1975), p. 273.

Dhaka University Institutional Repository

৩. J.T. Rankin, The study of Antiquities in Dacca, (The Sreenath Press, Dacca, 1920), p p. 15.16.

৪. F.B. Bradley Birt, The Ramance Of An Eastern Capital, (Metro - politon Book Co. Pvt. Ltd. 1975), p. 273.

৫. Hakim Habibur Rahman, Asudgan-i, Dacca, p. 56.57

৬. Ibid.

৭. Dr. Ahmad Hasan Dani, Muslim Architecture in Bengal, (Dacca Museum, 1961), p. 207.

৮. Syed Mahmudul Hasan, Ancient Monuments of East Pakistan, op. cit., P. 118.

৯. শ্রী যতীন্দ্র মোহন রায়, ঢাকার ইতিহাস প্রথম খণ্ড পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩৮।

১০. Syed Muhammed Taifoor, op .cit. p.p. 150-51.

১১. আঃ কঃ মুঃ যাকারিয়া, 'বাংলাদেশের প্রত্ন সম্পদ' (বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৮৪) পৃ. ৪৫৩।

১২. Syed Muhammed Taifoor, op. cit. pp. 151

১৩. Ibid

১৪. Azimusshan Haidar, op.cit. p. 30

১৫. মঞ্জুরুর রশীদ, 'সচিত্র বাংলাদেশ' (১০ বর্ষ, ৭ সংখ্যা, ১৫ই মার্চ, ১৯৮৯) পৃ. ২০

১৬. Azimusshan Haidar, op. cit., p. 31.

Dhaka University Institutional Repository

১. বিবি চাম্পার সমাধি (১৬৮০-৮৮ খ্রীঃ)

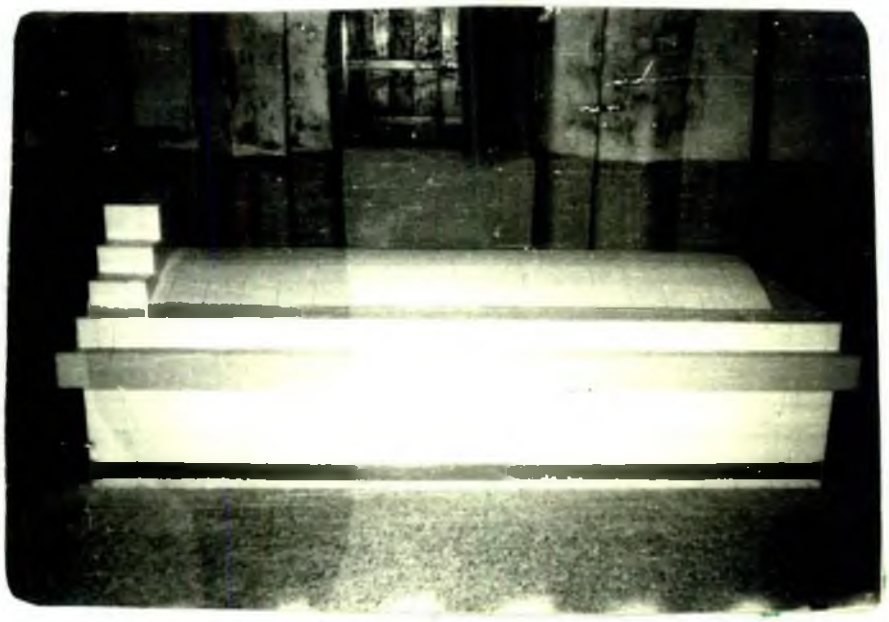

২. বিবি চাম্পার কবর ।

Dhaka University Institutional Repository

খাজীর উদ্দিনের সমাধি

বুড়িগঙ্গা নদীর উত্তর তীরে বাবু বাজার সড়কের দক্ষিণ পূর্ব দিকে দেয়াল দ্বারা পরিবেষ্টিত স্থানে খাজীর উদ্দিনের মসজিদ ও সমাধি সৌধ নির্মান করা হয়েছে। বাবু বাজার সড়ক হতে একটি গলি পথের মাধ্যমে এই স্থানে পৌঁছা যায়। (ভূমি নকশা ১০)

খাজীর উদ্দিনের সমাধি সৌধটি আভ্যন্তরীন ক্ষেত্রে ১৬'-৬" বিশিষ্ট একটি বর্গ। পশ্চিম দিকে রয়েছে এর দরজা পথ। উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে তিনটি জানালা বিদ্যমান। এরা চারি কেন্দ্রিক খিলান বিশিষ্ট এবং আয়তাকার কাঠামোর মধ্যে গড়া। এদের সামগ্রিক কাঠামো একটি বৃহত্তর সূক্ষ্মাগ্র ফলা বিশিষ্ট খিলানী খন্ডয়ের মধ্যে ধরে রাখা হয়েছে এবং এক কোনা হতে অপর কোনা পর্যন্ত এরা সম্প্রসারিত। এদের উপরের অংশ অন্ধ মার্লন দ্বারা অলংকৃত। জানালা গুলোর কাঠামো উদ্গত। পশ্চিম দিকের দরজা পথটি উদ্গত আকারে নির্মিত। একটি সূক্ষ্মাগ্র ফলা খিলান বিশিষ্ট এই দরজাটি অর্ধ গম্বুজের মধ্যে স্থাপিত। এতে রয়েছে বহু সংখ্যক খোপ বা প্যানেল। উত্তর, দক্ষিণ ও উপরের দিকের আয়তাকার প্যানেল এর সৌন্দর্যকে বহুল পরিমানে বর্ধিত করেছে। প্রধান দরজার 'দু' পার্শ্বে রয়েছে 'দু'টো অষ্টকোনাকার স্তম্ভ, এদের শীর্ষে পুষ্প, পুষ্প পাপড়ি, পুষ্প কুঁড়ি দ্বারা পরিবেষ্টিত কিয়স্ক (kiosk) নির্মিত হয়েছে।

এই সমাধি সৌধের চারিকোনায় চারটি অষ্টকোন বুরুজ রয়েছে। এসব বুরুজ প্যারাপেটের উপর উঠে গেছে। প্যারাপেটের উপরস্থ অষ্টকোনায় অংশটি আটটি ইনগ্রেইন্ড খিলান বিশিষ্ট মতিফ দ্বারা অলংকৃত হয়েছে। এদের উপরে রয়েছে অষ্ট কোনাকার ছাইচ, তার উপরে একটি কিয়স্ক (kiosk) এবং তার উপরে একটি ফিনিয়াল (finial) নির্মিত হয়েছে।

এই বর্গাকার ইমারতের আভ্যন্তরীন অংশের চারটি কোনায় চারটি সূক্ষ্মাগ্র ফলা বিশিষ্ট স্কুইঞ্চ নির্মিত হয়েছে। দুটো কোনার স্কুইঞ্চের মধ্যে রয়েছে একটি করে অগভীর স্কুইঞ্চ। এভাবে উপরের স্তরে স্কুইঞ্চ ব্যবহার করে অষ্টকোন গঠন করা হয়েছে। এই অষ্টভুজের প্রতিটিতে রয়েছে আটটি স্কুইঞ্চ। দুটো প্রধান স্কুইঞ্চের মধ্যে আটটি অগভীর স্কুইঞ্চ

Dhaka University Institutional Repository

নির্মান করা হয়েছে। এই স্কুইঞ্চ খিলান এক্সট্রাসমান যুক্ত শ্রেণী দ্বারা সমর্থিত। এভাবে বৃত্তে পৌঁছা গেছে, এই বৃত্তের পাদদেশ অন্ধ মার্লন দ্বারা অলংকৃত হয়েছে। বৃত্তের উপর অষ্ট কোনাকার পিপা নির্মান করে তার উপর তোলা হয়েছে গম্বুজ। প্রতিটি ভুজের পরিমাপ ৭'-০" । আর গম্বুজের পরিধি ৫৩'-১০" । এর ব্যাসার্ধ হলো ১৩'-১০" । এভাবে একটি উচুঁ অষ্ট কোনাকার পিপার উপর দণ্ডায়মান রয়েছে গোলার্ধবৎ গম্বুজ।

মুসলিম স্থাপত্যে অনেক ক্ষেত্রে মসজিদের চেয়ে সমাধি সৌধ অধিকতর গুরুত্ব পেয়েছে, কিন্তু আমীর উদ্দীনের সমাধি সৌধ এর ব্যতীক্রম। আমীর উদ্দীনের মসজিদ নির্মানে যে স্থাপত্য কলা-কৌশল অবলম্বিত হয়েছে এবং যে অনুপম অলংকরণ ব্যবহৃত হয়েছে সমাধি সৌধের ক্ষেত্রে ঠিক তদরূপটি হয় নি। বর্তমানে এর দিকে বিশেষ নজর দেয়া হচ্ছেনা। বিস্ময়ের বিষয় এই যে এটা এখন গুদাম ঘর হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

তথ্য নির্দেশ

1. Dr. Ahmad Hasan Dani, Dacca A Record of Its Changing Fortunes . (The Saogat Press, 1956), p. 109.

Dhaka University Institutional Repository

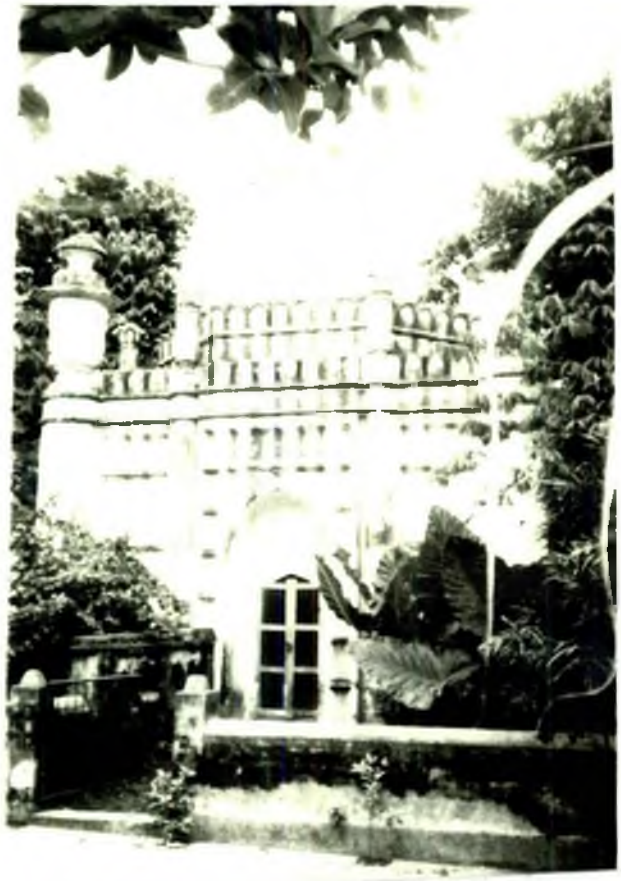

১. আমীর উদ্দীনের সমাধি (ঊনবিংশ শতাব্দী)

Dhaka University Institutional Repository

দুদু মিয়ার সমাধি

হাজী শরিয়ত উল্যা ছিলেন অষ্টাদশ/ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রখ্যাত ফরায়েজী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা। মোহাম্মদ মোহসীন ওরফে দুদু মিঞা তাঁর সুযোগ্য সন্তান ছিলেন। দুদু মিঞা তাঁর পিতার ফরায়েজী আন্দোলনকে বহুদূর এগিয়ে নিয়ে যান এবং বাংলার তাঁতি জেলা-পুলোর কৃষকসেরকে সংঘবদ্ধ করতে সচেষ্ট হন।[১] তিনি ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর তারিখ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণ একমত হতে পারেন নি। মিঃ হেদায়েত হোসাইন[২] এর মতে দুদু মিঞা ২৪শে সেপ্টেম্বর ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু বরণ করেন। জেমস্ ওয়াইজ[৩] এর মতামত অভিন্ন। তারিউ, তারিউ, হাকীর[৪] কিন্তু তাঁর মৃত্যু তারিখ ১৮৬১ খ্রীঃ বলে উল্লেখ করেছেন। আর ডঃ আবদুর রহিমের মতে তিনি ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু বরণ করেন[৫]। তাঁর মৃত্যুর স্থান সম্পর্কেও ঐতিহাসিকদের মধ্যে একই রকম মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। মিঃ হেদায়েত হোসাইনের মতে তিনি ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত বাহাদুর-পুরে মৃত্যু বরণ করেন[৬]। জেমস ওয়াইজ এম. হেদায়েত হোসাইনের সাথে একমত। কিন্তু নতিকা আকন্দ[৮] ও ডঃ মোহাম্মদ আবদুর রহিম[৯] এর মতে তিনি ঢাকাতে মৃত্যু বরণ করেন। উপরন্তু তাঁর মাযার বা কবরস্থান কোন স্থানে অবস্থিত সেই সম্পর্কেও ঐতিহাসি-কগণ অভিন্ন মত পোষণ করেন নি। এম. হেদায়েত হোসাইনের মতে দুদু মিঞা বাহাদুরপুরে সমাধিস্থ হন। কিন্তু আড়িয়াল খাঁ নদী তাঁর বাড়ীওসমাধির প্রতিটি চিহ্নই ধুয়ে মুছে ফেলেছে[১০]। ডঃ আহমদ হাসান দানী[১১], ডঃ মোহাম্মদ আবদুর রহিম ও মিসেস নতিকা আকন্দ সবাই এক মত যে তিনি ঢাকাতেই সমাধিস্থ হন। স্পষ্টতই এম. হেদায়েত হোসাইন ভুল বশতঃ বাহাদুরপুর কে তাঁর সমাধি স্থল বলে উল্লেখ করেছেন। জেমস্ ওয়াইজ ও এম. হেদায়েত হোসাইন তাঁর মৃত্যু স্থান সম্পর্কে যে অভিমত দিয়েছেন তাও ভ্রান্ত, কেননা ফরায়েজী আন্দোলনের অন্যতম শত্রু জমিদার ও বৃটিশ সরকারের পুলিশ বাহিনী অবিরাম তাঁর পিছনে ঘুরছিল। এই জন্যই সম্ভবতঃ তিনি 'আহমদ নাম নামানুক' এই ছদ্ম নামে কাজকর্ম সমাধা করছিলেন। এর পরেও তিনি শেষ রক্ষা পান নি। ধৃত হয়ে পর পর দু'বার তিনি কারাবরণ

Dhaka University Institutional Repository

করেন । দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি যখন ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে জেল হতে মুক্তি লাভের পর তিনি আর বাহাদুরপুরে থাকা যুক্তিসঙ্গত মনে করেন নি । এ জন্যই ফরিদপুর ছেড়ে তিনি ঢাকাতে অবস্থান নিলেন এবং ঢাকাতেই মৃত্যু বরণ করেন । তাঁর সমাধি স্থলও এ কথা প্রমান করে ।

দুদু মিঞার মাযার বা কবরস্থানটি মাহুতটুলীর চৌমাথা হতে প্রায় ৫০ গজ দূরে বংশাল সড়কের একটি সংকীর্ণ গলির মধ্যে অবস্থিত । বর্তমানে ১৩৭ নং বংশাল সড়ক নামে পরিচিত । দুদু মিঞা দালানের ঠিক পিছনেই । কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ স্থাপত্য হিসেবে মাযারটি যে বিশ্লেষণের দাবী করতে পারে তার কোন সুষ্ঠু আলামত এখানে পাওয়া যায়নি । মাযারের পূর্ব দিকের দেয়ালটি শুধুমাত্র অত্যন্ত জীর্ণাবস্থায় পড়ে রয়েছে । কিছুদিন পূর্বে ডঃ আহমদ হাসান দানী কবরটি দেখে যে বর্ণনাটি রেখে গিয়েছেন তাই এখানে অনুসরণ করা হচ্ছে । তাঁর মতে কবরটি ভূমির উপরিভাগে সমতলে অবস্থিত। একটি ক্ষুদ্র আয়তাকার আবেষ্টনীর মধ্যে ইহা সংরক্ষিত । তিনি উল্লেখ করেছেন যে দুটো দরজার মাধ্যমে এর অভ্যন্তরে প্রবেশ করা যায় । কিন্তু বর্তমানে একটি ক্ষুদ্র দরজা ভগ্নাবস্থায় পড়ে রয়েছে । তিনি আরো বলেছেন এই আবেষ্টনীটি ইট নির্মিত এবং পলেস্তরা দ্বারা প্রলেপিত । এর উপরে চুনকামের আবরণ দেয়া হয়েছে । বর্তমানে এখানে পাতা নক্শা নির্মিত একটি পর্দা লক্ষ্য করা যায় । এই পাতা নক্শা সমূহ পলেস্তরার মধ্যে খচিত । জীর্ণ দশায় উপনীত এই কবরস্থান একটি ক্রমবর্ধমান অনুন্নিক্ষ্য পরিবেশের শিকার হচ্ছে । এর চারদিকে উঁচু উঁচু দালান উঠে যাওয়ায় এর অস্তিত্ব কবে বিলীন হবে তার জন্যই এটা এখন দিন গুণছে ।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১. Dr. A.H. Dani : Dacca A Record of Its Changing Fortunes, Asiatic Press, 1962, p. 192.

২. E.J. Brill's First Encyclopaedia of Islam, 1913-1936, Edited by, M.T.H. Houtsma, A.J. Wensinck and others ; E.J. Brill, New York, 1987, p. 58.

৩. W.W. Hunter, A Statistical Account of Bengal, Vol. V, p.290.

৪. Ibid.

৫. Muhammad Abdur Rahim, The Muslim Society and Politics in Bengal, (A.D. 1757-1947) Published by the University of Dacca, 1978, p. 79.

৬. E.J. Brill's Encyclopaedia of Islam, op.cit., p. 58.

৭. W.W. Hunter, op.cit.,p. 290.

৮. Latifa Akanda, Social History of Muslim Bengal (Some Aspects of the Social History of Bengal with Special Reference to Muslims, 1854-1884, Islamic Cultural Centre, Dacca, 1981, p. 186.

৯. Muhammad Abdur Rahim, op.cit., p. 79.

১০. E.J. Brill's First Encyclopaedia of Islam, op.cit.,p.p.58/59 ; Dr. A.H. Dani, Dacca A Record, op.cit., p. 193.

Dhaka University Institutional Repository

শাহ মোহাম্মদ জামানের সমাধি

পাটুয়াটুলী ও শাখারী বাজারের সঙ্গম স্থলে কোতয়ালী পুলিশ ষ্টেশন রয়েছে। এখান থেকে কোতয়ালী রোড বেয়ে অগ্রসর হলে তাঁতি বাজারে পৌছা যায়। এই তাঁতি বাজারে একটি সমাধি সৌধ লক্ষ্য করা যায়। ইহা শাহ মোহাম্মদ জামানের সমাধি সৌধ নামে পরিচিত। তাঁরই জনৈক ভক্ত শায়েক মোহাম্মদ জাকির[১] ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই সমাধি নির্মান করেন।[২] বস্তুতপক্ষে এই মাজারটি একটি দেয়াল দ্বারা বেষ্টিত হয়েছিল। এখানে একটি এক গম্বুজ বিশিষ্ট বর্গাকার মসজিদও ছিল, কিন্তু মসজিদটি সম্প্রসারণ ও পুনঃনির্মাণের ফলে গম্বুজটি লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। এখানে একটি মাদ্রাসা ছিল বলে জানা যায়, কিন্তু এটারও এখন কোন অস্তিত্ব নেই। সম্ভবত মাদ্রাসাটি রাস্তার পূর্ব দিকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে এখনো আছে।

শাহ মোহাম্মদ জামানের সমাধি সৌধটি আভ্যন্তরীন ক্ষেত্রে ১৫'-২" × ৯'-৮" (ভূমি নকশা ১১ ১)। সম্ভবতই ঢাকার সমাধি সৌধের মধ্যে এটাই হলো ক্ষুদ্রতম। এর আভ্যন্তরে প্রবেশ করার নিমিত্ত দুটি দ্বিকেন্দ্রিক চুঁচালো খিলান বিশিষ্ট প্রবেশ পথ রয়েছে। দক্ষিণ দিকের দরজাটি শিকেল পর্যন্ত ৬'-০" উঁচু আর ২'-১১" প্রশস্ত। এই দরজাটি ভিতরের দিকে আয়তাকার কাঠামোর মধ্যে রাখা হয়েছে। পূর্ব দিকের দরজাটি ৫'-২" উচুঁ এবং ২'- ২$\frac{১}{২}$" প্রশস্ত। এই মাজারের একটি ব্যতীক্রম ধর্মী বৈশিষ্ট্য হলো এর কিবলা দেয়ালে একটি বাতায়ন পথ রয়েছে। এই বাতায়ন পথটি খিলানের শীর্ষ বিন্দু পর্যন্ত ৪'-২" উচুঁ এবং ১'-১" প্রশস্ত। এ ছাড়াও রয়েছে উত্তর দিকে আরেকটি বাতায়ন পথ, যা খিলানের শীর্ষ বিন্দু পর্যন্ত ৪'-১" উচুঁ এবং ২'-০" প্রশস্ত। মাজারের অভ্যন্তরে অতি ক্ষুদ্র ১২ টি কুলঙ্গি লক্ষ্য করা যায়। এই ইমারতের বাইরের পার্শ্বের পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে দরজার দুই পার্শ্বে চারি কেন্দ্রীক খিলান বিশিষ্ট প্যানেল নির্মিত হয়েছে। উত্তর ও পশ্চিম দিকস্থ জানালার দুই পার্শ্বেও একই রকমের অলংকরণ লক্ষ্য করা যায়। এই ইমারতের দেয়ালের উচ্চতা

Dhaka University Institutional Repository

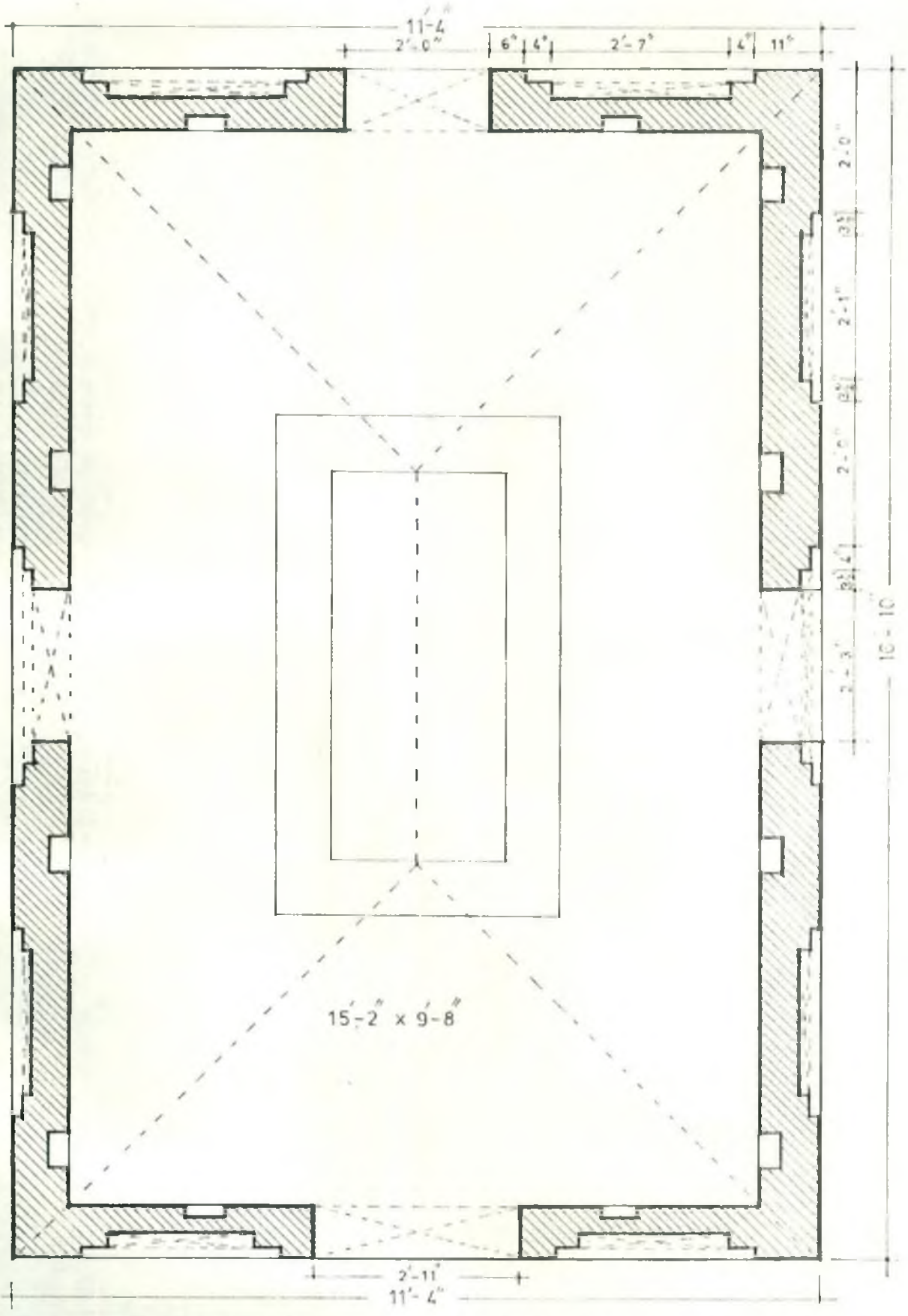

PLAN: TOMB OF SHAH MUHAMMAD JAMAL, TANTIBAZAR, DHAKA.

0 2 4 6 Feet

SCALE: 1/2" = 1'-0"

ভূমি নকশা ১১

N

Dhaka University Institutional Repository

হলো ৬'-৭" । এত নীচু দেয়াল বিশিষ্ট কোন প্রাচীন ইমারত ঢাকার বুকে আর কোথাও দেখা যায় না । ছাদের ছাইচ এর উপর প্যারাপেট মার্লন দ্বারা অলংকৃত হয়েছে । ছাদটি উত্তর ভারতীয় চালোয়া প্রকৃতির ঢোলানা দ্বারা বৈশিষ্ট মন্ডিত ।

শাহ্ মোহাম্মদ জামালের সমাধি সৌধটি অযত্নে পরে রয়েছে । এর চার পার্শ্বে নির্মিত হয়েছে দেয়াল ও পথ সংলগ্ন দালানকোঠা । বর্তমানে এটাকে ভেংগে ফেলার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে । এর কারণ হলো পার্শ্ববর্তী মসজিদটিতে মুসল্লিদের স্থান সংকুলান হচ্ছিল না । তাই মসজিদটি এই দিকে সম্প্রসারণ করার প্রচেষ্টা চলছে । এ অবস্থায় বাংলাদেশের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক ব্যবস্থা নেয়া দরকার, যাতে করে এই পুরা কীর্তিটি অক্ষত অবস্থায় থাকে ।

তথ্য নির্দেশ :

১. Hakim Habibur Rahman, Asudgan-i-Dacca. p. 21-23.

২. Ahmad Hasan Dani. Dacca A Record of Its Changing Fortunes (The Baogat Press Dacca ,1956), p. 92.

Dhaka University Institutional Repository

১. শাহ মোহাম্মদ জামালের কবর ।

Dhaka University Institutional Repository

কা ট রা

Dhaka University Institutional Repository

বড় কাটরা

আমীর-উল-উমারা নওয়াব শায়েস্তা খান এর সুবাদারীর পরে সম্রাট শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র শাহ্ সুজা বাংলার সুবাদার হয়ে আসেন। সম্রাট শাহজাহান ছিলেন স্থাপত্য শিল্পের ইতিহাসে রোমান সম্রাট জাস্টিনিয়ুনের সাথে তুলনীয়। বিশ্বের অন্যতম বিস্ময় তাজমহলের স্রষ্টা সম্রাটের পুত্র শাহ্ সুজার স্থাপত্য শিল্পের প্রতি যে অকৃত্রিম ঝোঁক থাকবে তা স্বাভাবিক। এই জন্যই ঢাকা নগরীর কতিপয় সুন্দরতম ইমারত নির্মানে স্থাপত্যের প্রতি তাঁর আগ্রহের সাক্ষাৎ পরিচয় রয়েছে। এসব ইমারত জাকজমক ও আড়ম্বরের প্রতি তাঁর সুক্ষ্ম রুচিরই পরিচয় বহণ করে। বড় কাটরা এই রূপ ইমারত সমুহের অন্তর্গত একটি জাঁকালোতম ইমারত। সম্রাট পুত্র এই কাটরাটি ঐতিহাসিক লালবাগ দুর্গের প্রায় অর্ধমাইল দূরে বুড়ীগঙ্গা নদীর তাটিতে চক বাজার মসজিদের দক্ষিণে নির্মান করেছিলেন। শাহজাদার আদেশে তাঁর মীর-ই-ইমারত অর্থাৎ প্রধান স্থপতি মীর আবুল কাসেম আল-হোসাইনী আত-তাবতাবাই আস-সামনানী এই কাটরাটি নির্মান করেছিলেন।[১] বড় কাটরার ইতিহাস সম্বলিত শিলালিপি তোরণ দ্বারের গম্বুজের নীচে অষ্টভুজের চারি দিকে জুড়ে স্থাপিত। শিলালিপির ভাষা ফার্সি।[২] এর নির্মান তারিখ সম্বন্ধে যে চরণটি রয়েছে তাহলো 'দর আমান বাদ আজ আগ্রে দাওড়া।' " আবজাদ " পদ্ধতিতে অক্ষর গুলোর সংখ্যা ধরে হিসাব করলে এই কাব্যের মধ্যে লিখিত অক্ষরগুলোর অংক সংখ্যার যোগফল দাঁড়ায় ১০৫০ হিঃ অর্থাৎ ১৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দ;[৩] এটাই যুক্তিযুক্ত।

এই বিশাল অট্টালিকা নির্মানের পিছনে কি উদ্দেশ্য কাজ করেছিল তা উদ্ধার করা কঠিন। এফ.বি. ব্রাডলিবার্ট,[৪] সৈয়দ মোহাম্মদ তৈফুর,[৫] ডঃ আহাম্মদ হাসান দানী[৬], ডঃ আবদুল করিম,[৭] আজিমুশ্শান হায়দার,[৮] আঃ কঃ মঃ যাকারিয়া[৯] ও ডঃ রফিকুল ইসলাম,[১০] সবাই একমত যে, এই কাটরাটি সম্রাট তনয় শাহসুজার রাজ প্রাসাদ হিসেবে নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু তিনি এর নির্মানকার্যে সন্তুষ্ট হতে পারেন নি বলে তিনি এটাকে তাঁর বাসস্থানে পরিণত না করে একে এর নির্মাতা আবুল কাসেমকে দিয়েছিলেন।[১১] শাহ্ সুজার আগেকার সুবাদাররা সাধারণত দুর্গের মধ্যে বাস করতেন। তাঁরা বাসযোগ্য

Dhaka University Institutional Repository

প্রাসাদ নির্মাণের কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন নি। কিন্তু শাহসুজা ছিলেন শাহান শাহ্ শাহজাহানের পুত্র। এই জন্যই তিনি তাঁর বসবাসের জন্য একটি প্রাসাদ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। এই তথ্যের পিছনে এই মর্মে জোরালো যুক্তি রয়েছে। কিন্তু এই প্রাসাদটিকে কাটরা নামে কেন অভিহিত করা হয়েছে তার কোন যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা এর মধ্যে পাওয়া যায় নি। কাটরার অর্থ হলো 'ছোট বাজার কম্পাউন্ড'।[১২] আর প্রাসাদকে বলা হতো 'কাসর'। এটা কাসর হিসেবে নির্মিত হলে এটা কেন কাটরা নামে অভিহিত হবে সে বিষয়ে আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। তবে এই বড় কাটরা ছাড়াও এরই পার্শ্বে আরও দু'টি কাটরা ছিল; একটি হলো ছোট কাটরা, যা জীর্ণাবস্থায় বিদ্যমান, অপরটি হলো মুকিম কাটরা, মুকিম কাটরার কোন অস্তিত্ব আজ বিদ্যমান নেই। আমীর-উল উমারা শায়েস্তা খান ভারত বর্ষে বহু কাটরা নির্মাণ করেছিলেন বলে ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে। কাটরা বলতে যদি বাজার বুঝায় তা হলে বড় কাটরার সম্পূর্ণ অংশটি না হলেও এর কিছু অংশ বাজার হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করছিল। অনুমানের ভিত্তিতে একথা বলা যেতে পারে। সম্রাট শাহজাহানের রাজত্ব কাল হতে বাংলা মুলুকের উপর মগ ও পর্তুগীজ জলদস্যুদের উপদ্রব বেশী পরিমাণে বেড়ে গিয়েছিল।[১৩] আর বড় কাটরা নির্মিত হয়েছিল বুড়ীগঙ্গা নদীর তীরে। কাজেই এটি জলদস্যুদের আক্রমন থেকে শহরকে রক্ষা করার একটি সীমান্ত প্রহরী কসর রূপে গড়ে তোলা হয়েছিল। এই অনুমানটিও ভিত্তিহীন নয়। রোমান বায়জান্টাইন ও সাসানীয় আমলে সীমান্তে এরূপ ধরণের সীমান্ত ঘাটি নির্মিত হতো। মুসলমানরা এই নীতি অনুসরণ করে সীমান্ত প্রহরী দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন। এইগুলি সচরাচর খান,[১৪] রিবাত,[১৫] ও মঞ্জিল নামে অভিহিত হতো।

পরবর্তীকালে শাহ সুজা ঢাকা থেকে রাজমহলে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। তবে শাহ সুজা এবং মীর জুমলা ঢাকাতে স্বল্পকালীন বিরতিতে এই কাটরাতেই অবস্থান গ্রহণ করতেন।[১৬] ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে কয়রুখ সিয়ারের অনুদানে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর উপর ন্যস্ত হয়। আস্তে আস্তে সমস্ত ক্ষমতা ইংরেজ

Dhaka University Institutional Repository

কোম্পানীর হাতে চলে যায়। ১৫০ বৎসর পূর্বে ইব্রাহিম খান ঢাকার শাসকদের বাসস্থান হিসেবে দুর্গের মধ্যে একটি প্রাসাদ নির্মান করেছিলেন। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে শাসন ক্ষমতা ইংরেজদের হাতে চলে গেলে তদানীন্তন নায়েব নাযিম জাসারত খান দুর্গ মধ্যকার প্রাসাদ ছেড়ে দেন। তিনি অল্প দিনের জন্য বড় কাটরায় আস্তানা নিয়েছিলেন। তাঁর জন্য নিম-তলী কুঠি নির্মিত হচ্ছিল।[১৭] এর নির্মানকাজ শেষ হলে কাটরা ছেড়ে তিনি কুঠিতে চলে যান।[১৮] সেখানে তিনি ও তাঁর বংশধররা প্রায় ৭৫ বৎসর কৃত্রিম শাসক হিসেবে বসবাস করেছিলেন।

সৈয়দ মোহাম্মদ তৈফুর[১৯] এর মতে নগরীর দিকে অর্থাৎ কাটরার উত্তর তোরণে সুন্দর তোঘড়া অক্ষরে লিখিত একখানা শিলালিপি ছিল। উক্ত তোরণটি বিংশ শতাব্দীর শুরুতে প্রচন্ড ভূমিকম্পে ধ্বসে যায়।[২০] এর সাথে শিলালিপিটিও ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এর কিছু অংশ জাতীয় যাদুঘরে এখনও রক্ষিত রয়েছে। 'D Oyly অন্য একটি অনুলিপির একটি বিশ্বস্থ ফটোগ্রাফ দিয়েছিলেন।[২১] গদ্যে এই শিলালিপিটি ছাদউল্লিন মোহাম্মদ আস-শিরাজী উৎকীর্ণ করেন। এই শিলালিপিতে ১০৫৫ হিঃ সন অর্থাৎ ১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে লিখা হয়েছে। উপরোল্লিখিত কাব্য শিলালিপিটির এক বৎসর পরে এই শিলালিপিটি খোদিত হয়। এই শিলালিপি হতে জানা যায় যে, শাহ সুজা এই বড় কাটরার নির্মান পদ্ধতির অনুমোদন দেননি। এর ফলে তিনি এর অংশ বিশেষ এই নগরে আগত মুসাফিরদের আরাম আয়েশের জন্য দান করে যান। এই ইমারতের বাইশটি কক্ষ এই মর্মে ওয়াকফ করে দেয়া হয় যে, এর আয় হতে ইমারতটির রক্ষণাবেক্ষণ চলবে।[২২]

ভূমি নকশা অনুযায়ী ঢাকার বড় কাটরা ছিল একটি আয়তাকার ইমারত। ইহা দৈর্ঘ্যে ছিল ২৩০'-০" এবং প্রস্থে ২২২'-০" এর মাঝ খানে ছিল একটি উন্মুক্ত চত্বর যা দৈর্ঘ্যে ১৯২"-০" এবং প্রস্থে ১২৭'-০"। (ভূমি নকশা - ১২)

Dhaka University Institutional Repository

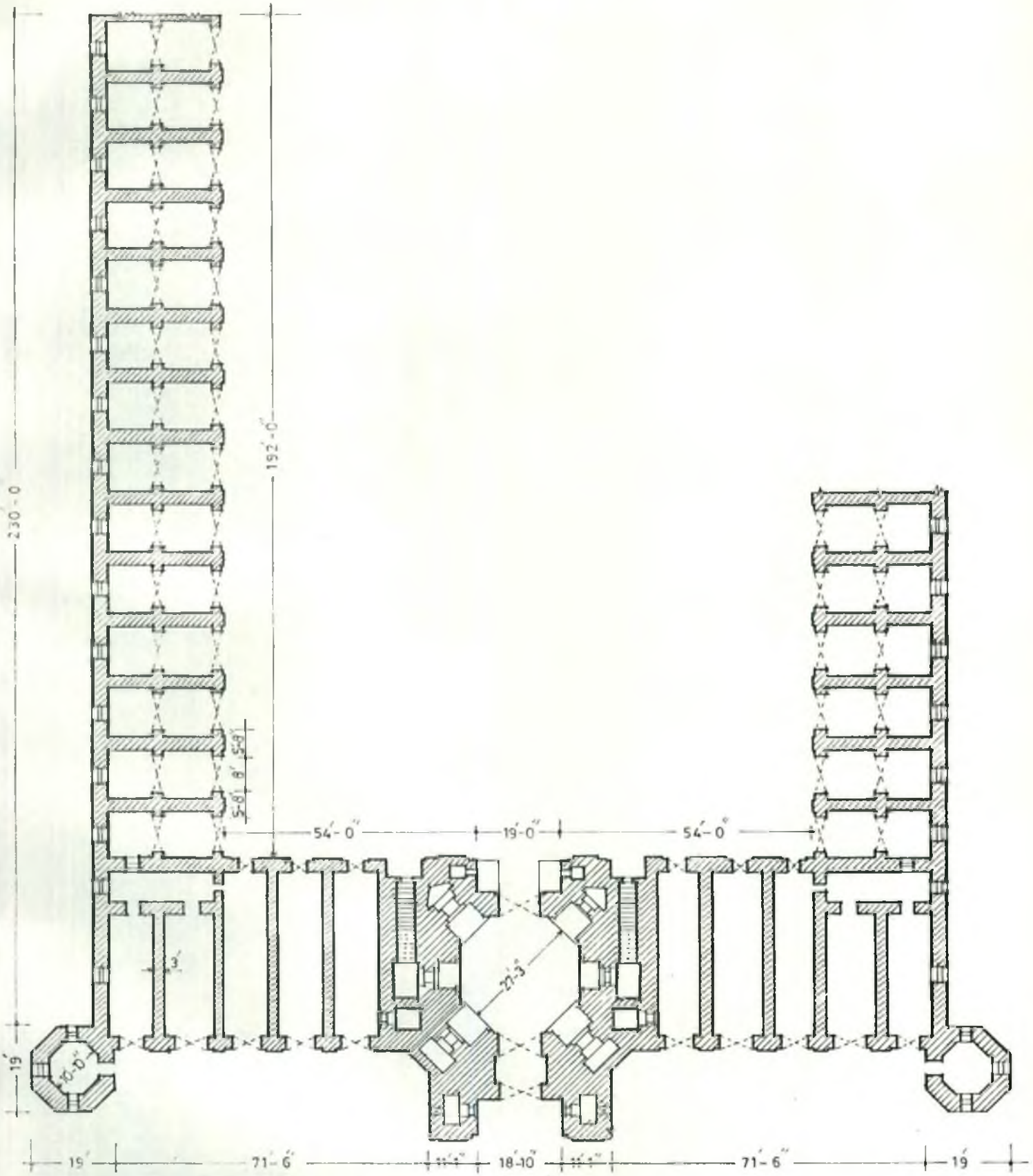

GROUND FLOOR PLAN, BARA KATRA, DHAKA.

ভূমি নকশা ১২

Dhaka University Institutional Repository

অন্যান্য কাটরার পরিকল্পনা অনুযায়ী এই কাটরাতেও চারি দিকের ক্ষেত্রে চারটি প্রবেশ পথ ছিল বলে অনুমান করা যেতে পারে । তবে পূর্ব ও পশ্চিম এর তোরণপথ সম্পর্কে কোন ধারণা দেয়া দুঃসাধ্য । উত্তর দিকের তোরণটির কিছু অংশ ভগ্নাবস্থায় পড়ে রয়েছে । এই তোরণটি দক্ষিণ দিকের তোরণের মত এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল কিনা সে সম্বন্ধে কোন ধারণা দেয়ার উপায় নেই । এই জন্যই কাটরার দক্ষিণ সারিটি এখনও পূর্ণরূপে বিদ্যমান ।[২৩] তাই এটা স্থাপত্য পর্যালোচনার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব বহণ করে রয়েছে । বস্তুতঃ পক্ষে দক্ষিণ দিকের ব্লকে এখন বড় কাটরা মাদ্রাসা বিদ্যমান থাকাতে কাটরার এই অংশটি অনেকটা জীর্ণাবস্থায় হলেও প্রায় অক্ষত রয়েছে ।

বস্তুতঃ পক্ষে এই তোরণ পথটি আসল ইমারত হতে প্রায় ৯'-৬" উদ্গত করে নির্মান করা হয়েছে । এই উদ্গত অংশটি ১০'-৪" প্রলম্ব । দক্ষিণ দিক হতে তোরণের এই উদ্গত অংশে প্রবেশ করা যাব ১৮'-১০" x ৯'-৬" বিশিষ্ট একটি দহলিজ চোখে পড়ে । এর উভয় পার্শ্বে রয়েছে ৪টি করে কক্ষ । প্রথমটি ক্ষুদ্রতর দ্বিতীয়টি ক্ষুদ্র, তৃতীয়টি বৃহত্তর প্রায় ৭'-৩"x ৪'-৭" বিশিষ্ট । // উত্তর পার্শ্বের তৃতীয় কক্ষ দু'ইটি প্রহরী কক্ষ হিসেবে বিবেচ্য । এদের বাম দিকে রয়েছে একটি/ কক্ষে ক্ষুদ্র কক্ষ । দহলিজের উত্তরে রয়েছে চৌচালা ছাদ বিশিষ্ট একটি স্থান যা ৩'-৬" প্রশস্ত । এর পরে রয়েছে একটি আয়তকার স্থান যা ৬'-৩" প্রশস্ত । এই স্থানটির উভয় পার্শ্বে ছোট বড় তিনটি কক্ষ লক্ষ্য করা যাচ্ছে । বৃহত্তরটি ৪'-৩" x ৩'-০" আয়তন বিশিষ্ট । এই স্থানটির উত্তরে আরও একটি ৬'-০" প্রলম্ব ভলটেড স্থান লক্ষ্য করা যায় । এখান হতে সরাসরি একটি অষ্টভুজে পৌঁছা যায় । এই অষ্টভুজটি ২৭'-৩" ব্যাস বিশিষ্ট । এর প্রতিটি ভুজের পরিমান হলো ১১'-৪" । এই অষ্টভুজটি ৮টি চারি কেন্দ্রিক ভুঁছানো খিলান দ্বারা বাহিত। এর উপরে রয়েছে গম্বুজ । অষ্টভুজ হতে গম্বুজ-এ পৌঁছতে যে উত্তরণের স্তর বা অবস্থান্তর প্রক্রিয়া রাখি হয়েছে তার

Dhaka University Institutional Repository

গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এই যে, অষ্টভুজের কোন গুলোতে কোন স্কুইঞ্চ নির্মান না করে গম্বুজটিকে সরাসরি অষ্টভুজের উপর স্থাপন করা হয়েছে। অষ্টভুজের দক্ষিণ ও উত্তর দিকের ভুজের খিলান পথ ছাঁড়া অন্য ছয়টি ভুজের পার্শ্বে প্রতিটি ৭'-৬" X ৬'-০" প্রসস্থ বিশিষ্ট ৬টি কক্ষ রয়েছে। পূর্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ পূর্ব ও দক্ষিণ পশ্চিম কক্ষ হতে প্রতিটি দিকে আরও দু'টি ক্ষুদ্রাকৃতির এবং তৃতীয়টি বৃহৎ আকৃতির কক্ষে পৌছা যায়। বৃহত্তর কক্ষগুলো ৭'-০"X ৩'-৯" পরিমান বিশিষ্ট। কিন্তু উত্তর পূর্ব, ও উত্তর পশ্চিম কক্ষ হতে যে দুটো ক্ষুদ্রতর এবং একটি বৃহত্তর কক্ষে প্রবেশ করা যায় তাদের মধ্যে শেষোক্তটি ৬'-৩" দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট ত্রিভুজাকৃতির কক্ষ। অষ্টভুজ হতে একটি ত্রিকেন্দ্রীক খিলানের মাধ্যমে সর্বশেষ অর্ধ গম্বুজ আকৃতির তোরণ পথে যেয়ে হওয়া যায়। এই অর্ধ গম্বুজাকৃতির তোরণ পথের উভয় পার্শ্বে ৯'-৩" X ৫'-৩" বিশিষ্ট আয়তাকার কক্ষ লক্ষ্য করা যায়। এই কক্ষগুলো হতে আবার ডান ও বাম পার্শ্বে আরও একটি ক্ষুদ্রতর ও একটি বৃহত্তর কক্ষে চলে যাওয়া যায়।

তোরণ পথের দুই পার্শ্বস্থ ইমারত সমূহ পূর্বে অন্ধ মার্লন দ্বারা অলংকৃত ছিল। দুটো ভুজের মধ্যবর্তী সীমানা নির্ধারণ করার জন্যই এই অন্ধ মার্লন ব্যবহার করা হয়েছিল। প্রধান তোরণ পথ হতে পশ্চিম দিকে ২৭'-৭" দূরে একটি সুরঙ্গ পথ ছিল বলে অনুমান করা যায়। এটা বর্তমানে ইটের গাথনি দিয়ে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। খিলানটি ৮' উচ্চ এবং ৫'-৯" প্রসস্থ। কথিত আছে যে এই পথটি লালবাগ দুর্গ পর্যন্ত চলে গিয়েছিল। প্রধান তোরণ পথটির পূর্ব ও পশ্চিম পার্শ্বে দুটো ঘুরানো সিঁড়ি দ্বিতীয় তলায় গিয়ে মিলিত হয়েছে। এই সিঁড়ি দুটোর দু' পার্শ্বে দু' একজন লোক থাকার মত জায়গা রয়েছে। এ দুটো সিঁড়ির প্রথম ধাপের মাথায় দু'টো আয়তকার কক্ষ রয়েছে।

বিভিন্ন কক্ষ সম্বলিত তোরণ পথ কমপ্লেক্স তথা সিঁড়ি দুটোর পূর্ব ও পশ্চিম পার্শ্বে তিনটি করে আয়তকার কক্ষ রয়েছে। পশ্চিম দিককার কক্ষত্রয় সরল কিন্তু পূর্ব দিককার কক্ষত্রয় ভল্টযুক্ত। পূর্ব দিককার শেষ কক্ষটির পূর্বে আরও ক্ষুদ্রতর কক্ষ নির্মান করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

এরা আয়তকারে ক্ষুদ্র, এই জন্য যে এদের উত্তর দিকে কিছু অংশ কেটে নিয়ে ২৪'-১" X ১০'-৭" বিশিষ্ট একটি তৃতীয় কক্ষ বের করা হয়েছে । পশ্চিম দিকেও অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে ।

বড় কাটরার পশ্চিম সারিতে ১৪টি ভল্টযুক্ত কুঠরী নির্মিত হয়েছিল । আকারে এরা ছিল আয়তক্ষেত্র কিন্তু প্রতিটি কক্ষের মধ্যে আড়াআড়িভাবে একটি খিলান টেনে প্রতিটি আয়তক্ষেত্রকে সমআয়তনের দুটো বর্গাকার কক্ষের রূপ দেয়া হয়েছে । এদিকে ছয়টি কক্ষ এখনও বিদ্যমান রয়েছে ; বাকী ৮ টির কোন চিহ্ন মাত্র নেই । পূর্ব দিকের সারিতেও একই ধরণের শ্রেণী কক্ষ বিন্যাস ছিল বলে আমাদের ধারণা । এখানে বর্তমানে ছয়টি ভল্টযুক্ত কক্ষ বিদ্যমান রয়েছে । এদেরকেও মধ্যস্থলে আড়াআড়িভাবে খিলান নির্মান করে দ্বিবর্গের রূপ দেয়া হয়েছে । উত্তর দিকের শ্রেণী বিন্যাস সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণা নেই । তবে মনে হয় এখানকার ইমারতী কাঠামোটি দক্ষিণ দিককার ইমারতী কাঠামোর মত অনুরূপ ব্যবস্থা পায়নি ।

বড় কাটরার পরিকল্পনা দেখে মনে হয় পূর্ব, উত্তর, পশ্চিম অংশগুলো ছিল একতলা বিশিষ্ট ইমারতের সমষ্টি । কেবলমাত্র দক্ষিণ দিকের কাঠরাংশটি দ্বিতল রূপ পেয়েছিল । পূর্বে উল্লেখিত দুটো ঘুরানো সিঁড়ির মাধ্যমে দ্বিতলে পৌঁছা যায় । ১ম তলার অষ্টভুজটির গম্বুজ দ্বিতীয় তলায় গিয়ে শেষ হয়েছে । এই গম্বুজের চারিদিক দিয়ে রয়েছে সিঁড়ি এবং সিঁড়ির কোন কোন স্থলে কতিপয় ক্ষুদ্রাকৃতি কক্ষের মধ্য দিয়ে উপরে উঠে ১২'-০" X ৭'-৯" আয়তন বিশিষ্ট একটি কক্ষে প্রবেশ করা যায় । এই কক্ষটির উভয় পার্শ্বে আরো কক্ষ রয়েছে । মধ্যস্থ কক্ষটি হতে সিঁড়ি পথে এ সব কক্ষে প্রবেশ করা যায় । দোতালাতে অষ্টভুজের উত্তর বাহুর দুই পার্শ্বস্থিত বাহু হতে দুটি অদ্ভুত আকৃতির কক্ষ নির্মিত হয়েছে । এই দুটো কক্ষ হতে আবার উত্তর দিকস্থ দুটো আয়তাকার কক্ষে প্রবেশ করা যায় । এখানে সিঁড়ির দুই দিকে দুইটি ক্ষুদ্র ভল্টযুক্ত কক্ষ লক্ষ্য করা যায় । দক্ষিণ দিকের সিঁড়ি দুয়ের পার্শ্বস্থ মধ্যস্থ দুটি কক্ষ হতে আবার দুই দিকে কয়েকটি কক্ষে আসা যায় । এখানকার তিনটি কক্ষের দুইটি ভল্টযুক্ত ও একটি সরল । অষ্টভুজের নিকটস্থ সিঁড়ির পূর্ব ও পশ্চিমে কাটরার দুইটি কক্ষ

Dhaka University Institutional Repository

রয়েছে । প্রতিটি কক্ষে ১'-৩" X ১০'-১০" আয়তন বিশিষ্ট কতগুলি কক্ষ রয়েছে, এরা দুটি সারিতে বিভক্ত । প্রতিটি সারি চারিটি কক্ষ সহযোগে গঠিত । এই কক্ষগুলির পশ্চিমে আবার একটি বৃহৎ কক্ষ রয়েছে।আয়তনে এই আয়তকার কক্ষটি পার্শ্ববর্তী দুইটি বর্গাকার কক্ষের সমান । ২৪'-৭" X ১১'-০" আয়তন বিশিষ্ট এই বৃহত্তর কক্ষ হতে উত্তর দিকে আরও একটি বর্গাকার কক্ষে পৌছা যায় । প্রায় বর্গাকার কক্ষটি ১১'-০" X ১০'-৭" আয়তন বিশিষ্ট । কক্ষের বিন্যাসে পূর্ব ও পশ্চিম দিকের কক্ষগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য রয়েছে । (ভূমি নকশা ১৩)

কাটরার তৃতীয় তলাটি সরল পরিকল্পনা বিশিষ্ট । এখানের তিনটি সারিতে সর্বমুদ্ধ ছয়টি কক্ষ রয়েছে । পূর্ব দিকের সারির উত্তরের কক্ষটি ১০-০" X ৬'-৬" আয়তন বিশিষ্ট । আর দক্ষিণ দিকস্থ কক্ষটি ৮'-০" X ৬'-৬" আয়তন বিশিষ্ট । এই দুইটি কক্ষের পশ্চিম দিকের কক্ষ দুটো আকারে বেশ বড় । সম্ভবতঃ এই কক্ষগুলি বাসগৃহ রূপে চিহ্নিত ছিল । উত্তর দিকের কক্ষটির পরিমাপ হলো ১১'-৬" X ১০'-০" এবং দক্ষিণ দিকের কক্ষটি ১১'-৬" X ৮'-০" বিশিষ্ট । পশ্চিম দিকের কক্ষ ২টি সর্ব পূর্ব দিকের দুইটির মত একই আয়তন বিশিষ্ট । কাটরার তৃতীয় তলার এই অংশের ডানে ও বামে কতিপয় কক্ষ বিন্যাসিত হয়েছে, পূর্ব দিকের প্রথম কক্ষটি ১০'-০" X ৬'-৬" আয়তন বিশিষ্ট । (ভূমি নকশা ১৩)

অন্যান্য কাটরার দৃশ্য দেখে অনুমান করা যায় যে, বড় কাটরার চারিদিকে চারটি বুরুজ নির্মিত হয়েছিল ।[২৪] কিন্তু অধুনা দক্ষিণ ব্লকের দুই কোনার দুইটি বুরুজ ছাড়া উত্তর দিকের দুই কোনার দুইটি বুরুজ নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে । এই বুরুজগুলো আকৃতিতে অষ্ট কোনাকার ।এদের অভ্যন্তর ফাঁকা । এদের ব্যাস ১০'-১" । এই বুরুজগুলোর প্রতিটি বাহু প্যানেল আকারে সুশোভিত । এই প্যানেল গুলো আয়তাকার । এরা খিলানাকারে অলংকৃত । এই বুরুজগুলো সরাসরি তিনতলার উপরে উঠে কিউপলা বা ক্ষুদ্র গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত হয়েছে । এই গম্বুজ দুটি অষ্টস্তম্ভের উপর নির্মিত । এই অষ্ট স্তম্ভের চারিটি স্তম্ভে নির্মিত জানালা এর অভ্যন্তর ভাগকে পর্যাপ্ত পরিমানে আলোকিত করেছে ।

এই ধরণের কাটরার একটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক মূল্যবোধ রয়েছে । দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল হতে আগত জনসাধারণ এখানে একটি আশ্রয়স্থল খুজে পেয়েছিল । অনেক সময় সুদূর দূরান্ত থেকে আগত ব্যবসায়ীরা মালামালসহ এখানে এসে উঠতো এবং এখান হতে এসব

Dhaka University Institutional Repository

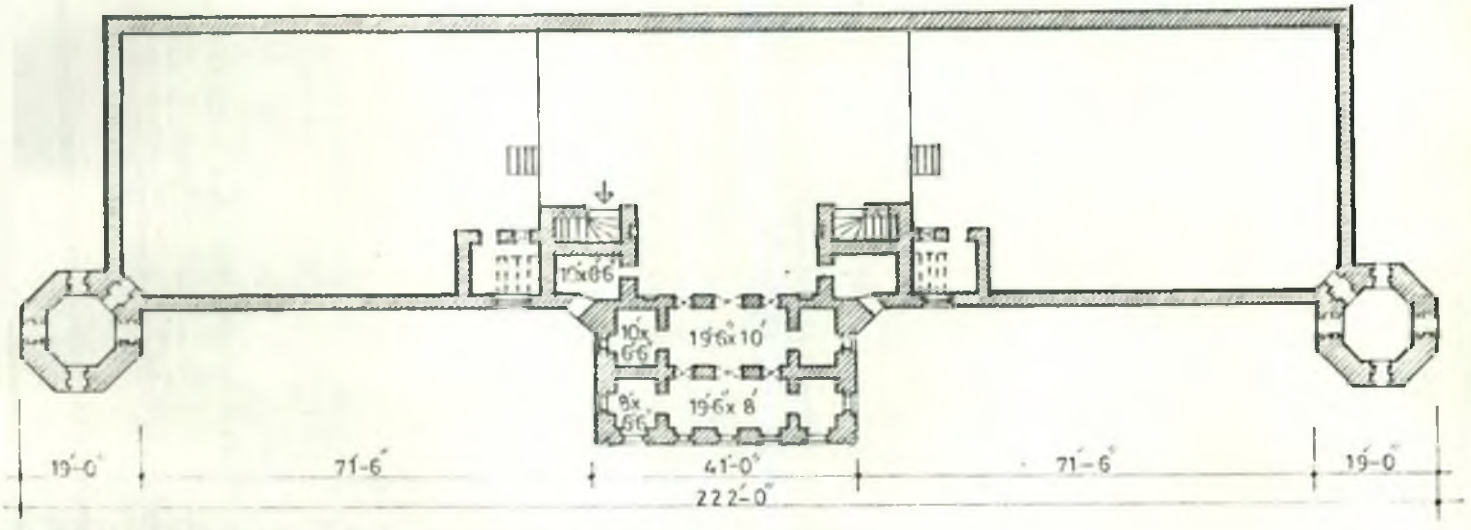

SECOND FLOOR PLAN, BARA KATRA, DHAKA.

30 20 10 0 30 60 Feet

SCALE OF FEET

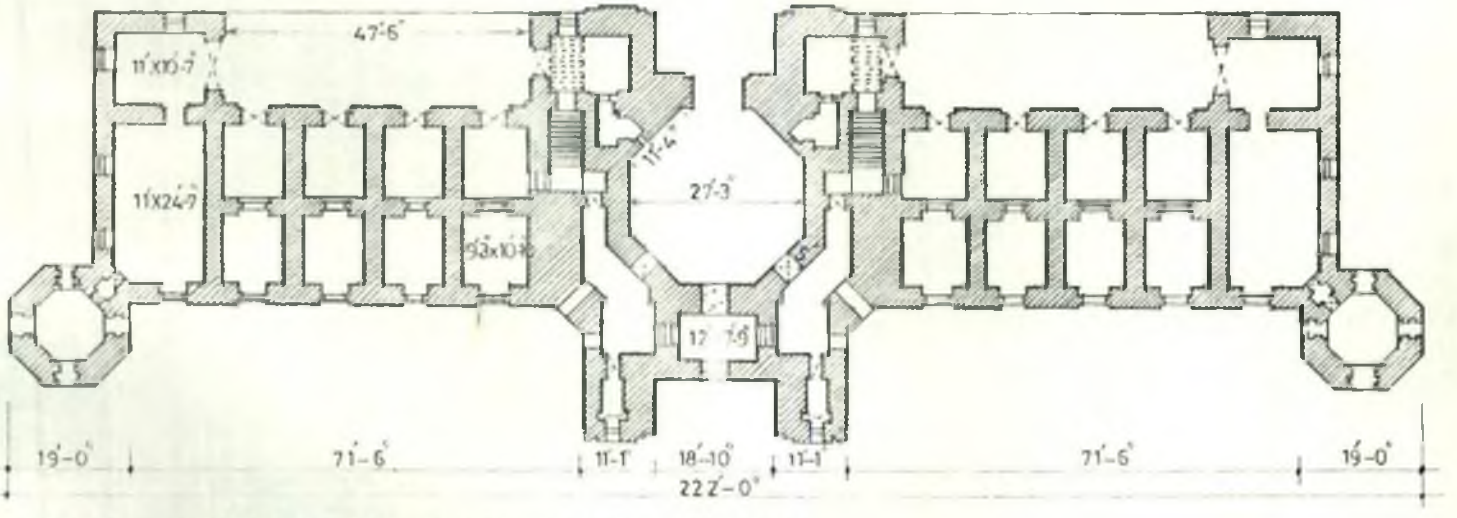

FIRST FLOOR PLAN, BARA KATRA, DHAKA

30 20 10 0 30 60 Feet

SCALE OF FEET

ভূমি নকশা ১৩

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবসাজাত পণ্য অন্যত্র চালান দিত। কাটরার বুরুজ নির্মান পরিকল্পনা হতে এটাও অনুমান করা যায় যে সুফী সাধকগণও এই সব বুরুজে অবস্থান গ্রহণ করে আধ্যাত্মিক সাধনায় নিমগ্ন থাকতেন।

বাংলাদেশের স্থাপত্যে বড় কাটরা একটি অতুলনীয় ইমারত। এ দেশের কথা বাদ দিলেও সমগ্র ভারত বর্ষের স্থাপত্যে এর নজীর খুব বেশী নহে। বড় কাটরাকে অনুসরণ করে মুর্শিদকুলী খান মুর্শিদাবাদে একটি কাটরা নির্মান করেছিলেন যা জাফর খানের কাটরা নামে পরিচিত। কিন্তু বড় কাটরার মত এটা এত গুরুত্ব পায়নি। কালের কুটিল চক্রে এই কাটরা অবশ্য ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। ফলে এর স্থাপত্য ও অলংকরণে যে অঙ্গ সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য ছিল তার অনেক কিছুই আজ বিলীন হয়ে গিয়েছে। তবুও যা কিছু এখনও অবশিষ্ট রয়েছে তা' বাংলাদেশের স্থাপত্য কীর্তির একটি অনবদ্য দৃষ্টান্ত হিসেবে বিদ্যমান।—

তথ্য নির্দেশ

১. Syed Muhammed Taifoor, Glimpses Of Old Dhaka, (The Pioneer Printing Press Ltd. 1956), p. 123.
Ahmad Hasan Dani, Muslim Architecture in Bengal, (Dacca Museum, 1961) p. 219.
Ahmad Hasan Dani, 'Dacca A Record of Its Changing Fortunes, (The Saogat Press. Dacca, 1956), p. 105.
Dr. Syed Hasan, Ancient Monuments of East Pakistan, (Pakistan Academy, 1970), p. 117
আঃ কঃ মঃ যাকারিয়া, বাংলাদেশের প্রত্ন সম্পদ, (বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৮৪) পৃ. ৪৫১।

২. Syed Muhammed Taifoor, op.cit., p. 124.

৩. মুহাম্মদ মুসলিম ফতেপুরী, ঢাকা বাণী, জুন, ১৯৮৯, বড় কাটরার ইতিহাস, পৃঃ ৪।

৪. F.B. Bradley Birt, The Romance Of An Eastern Capital. (Metropolitan Book Co. Pvt. Ltd. 1975), p. 268.

Dhaka University Institutional Repository

৫. Syed Muhammed Taifoor, op.cit., p. 123.

৬. Dr. Ahmad Hasan Dani, Muslim, op.cit., p. 219.

৭. Dr. Abdul Karim, Dacca The Mughal Capital, (Asiatic Society of Pakistan, Publication, No-15, 1964), p. 35.

৮. A City and Its Civic Body, Edited by Azimusshan Haider. p.7

৯. Azimusshan Haider , Dhaka History & Romance in Place names
আঃ কঃ মঃ যাকারিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫১। Dhaka Municipality, p.33

১০. ডঃ রফিকুল ইসলাম, 'ঢাকার কথা, (১৬১০-১৯১০) (আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা-১৯৮২), পৃ. ২৮।

১১. শ্রী যতীন্দ্র মোহন রায়, ঢাকার ইতিহাস, প্রথম খণ্ড (দি কমলা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১৩১৯ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৩৪০।

১২. মুহাম্মদ নুরুদ্দিন ভূতেপুরী, ঢাকা বাণী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪।

১৩. Ahmad Hasan Dani, Dacca A Record. op.cit. p.p. 35.36.

১৪. K.A.C. Creswell, Early Muslim Architecture, Part Two, (Oxford. At the Clarendon Press), p. 91.

১৫. K.A.C. Kreswell, A Short Account of Early Muslim Architecture, (Penguin Book, 1958), p. 230.

১৬. Syed Muhammed Taifoor, op.cit., p. 123.

১৭. Dr. Ahmad Hasan Dani, Dacca A Record, op.cit. p. 53.

১৮. মুহাম্মদ নুরুদ্দিন ভূতেপুরী, 'ঢাকা বাণী', প্রাগুক্ত, পৃ. ৪।

১৯. Syed Muhammed Taifoor, op.cit., p. 123.

২০. মুহাম্মদ নুরুদ্দিন ভূতেপুরী, ঢাকা বাণী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪।

২১. Sir Charles 'D' Oyly, Antiquities of Dacca, (Published by John Landseer, London), p. 8. আরও দেখুন Syed Muhammed Taifoor, op.cit., p. 123.

Dhaka University Institutional Repository

২২. Syed Muhammed Taifoor, op. cit., p. 124.
দেখুন, বাংলা বিশ্বকোষ, দ্বিতীয় খণ্ড, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৭৫, পৃঃ ৫৬ ।

২৩. Ahmad Hasan Dani, Dacca A Record, op.cit., p. 105.

২৪. দেখুন, বাংলা বিশ্বকোষ, দ্বিতীয় খণ্ড, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৭৫, পৃ. ৫৬ ।

Dhaka University Institutional Repository

১. বড় কাটরার দক্ষিণ তোরণ পথের দৃশ্য (১৬৪৪ খ্রীঃ)

Dhaka University Institutional Repository

ছোট কাটরা

ছোট কাটরা বড় কাটরার প্রায় ২০০ গজ পূর্ব দিকে বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত।[১] A.Claud Campbell এর মতে বড় কাটরার পূর্ব দিকে প্রায় এক চতুর্থাংশ মাইল দূরে ছোট কাটরা নির্মিত হয়েছে।[২] স্পষ্টতঃ ছোট কাটরা ও বড় কাটরার মধ্যকার দূরত্ব নিরূপনে তিনি তাঁর চক্ষুকে বিশ্বাস করতে পারেন নি। যাহোক এই কাটরাটি আমীর-উল-উমারা নওয়াব শায়েস্তা খান কর্তৃক নির্মিত হয়েছে, তবে এর নির্মানকাল সম্পর্কে ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদগণ একমত হতে পারেন নি। ডঃ আহমদ হাসান দানী,[৩] সৈয়দ আওলাদ হাসান,[৪] ডঃ সৈয়দ মাহমুদুল হাসান,[৫] A.Claud Compbell[৬] এবং ডঃ নাজিমউদ্দিন আহমেদ,[৭] এর মতে ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে এই কাটরাটি নির্মিত হয়। কিন্তু সৈয়দ মুহাম্মদ তৈফুর তাঁর 'Glimpses of Old Dhaka' গ্রন্থে ১৬৭১ খ্রীষ্টাব্দকে এর নির্মানকাল বলে বর্ণনা করেছেন।[৮] শিহাব উদ্দিন তালিশের ফাত-ইয়া-ইব্রাহিয়া[৯] গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে আমীর-উল-উমারা নওয়াব শায়েস্তা খান ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই মার্চ এর পরে দাক্ষিণাত্য হতে বাংলার কার্যভার গ্রহণ করে তিনি রাজমহলের দিকে যাত্রা করেন এবং ঐ সনের ১৩ই ডিসেম্বর রাজমহল হতে ঢাকায় প্রথম পদার্পন করেন। অন্যত্র F.B.Bradley Birt[১০] ও James Taylor[১১] বাংলার প্রশাসক হিসেবে শায়েস্তা খানের কার্যকাল প্রথম দফায় ১৬৬৩ খ্রীঃ হতে ১৬৭৭ সন এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। সুতাবতই ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে কার্যভার গ্রহণ করে তিনি ঐ বৎসরই এত জাকাঁলো পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন বলে বিশ্বাস হয় না। শ্রী যতীন্দ্র মোহন রায়[১২] বলেন যে, ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে শায়েস্তা খান ঢাকায় এসে এই কাটরাটির নির্মান কার্য আরম্ভ করেন এবং প্রায় ১ বৎসর পর ১৬৭১ খ্রীষ্টাব্দে এর নির্মান কার্য শেষ করেন। সুভাবতই কাটরা নির্মান করতে বেশ কয়েক বৎসর সময় লাগে।

পরিকল্পনায় এই কাটরাটি একটি আয়তাকার ইমারত (ভূমি নকশা- ১৪)
ইহা উত্তর ও দক্ষিণ

Dhaka University Institutional Repository

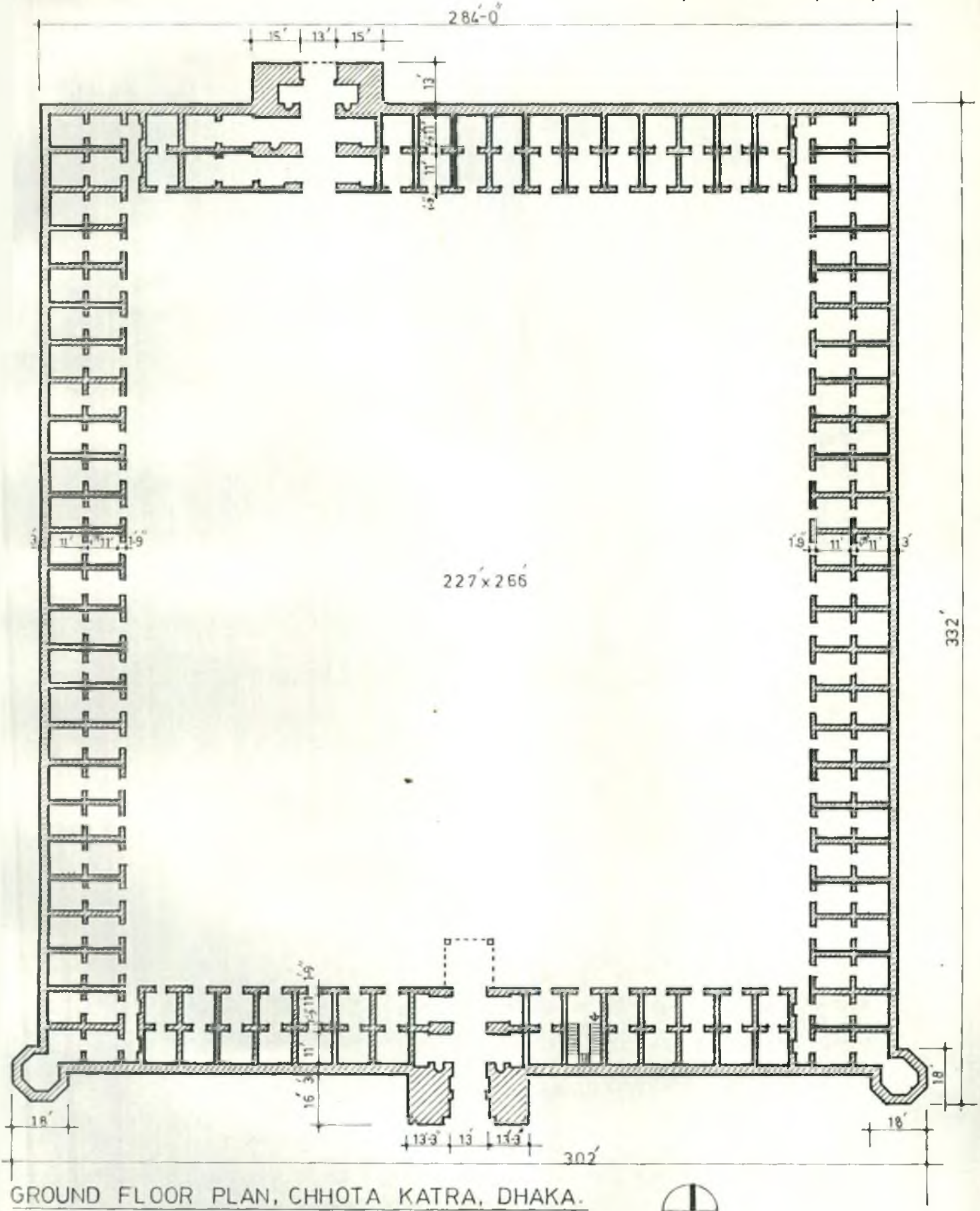

GROUND FLOOR PLAN, CHHOTA KATRA, DHAKA.

40 30 20 10 0 40 80 Feet

SCALE OF FEET

N

ভূমি নকশা ১৪

Dhaka University Institutional Repository

পার্শ্বে ২৮৪ ফুট, পূর্ব ও পশ্চিম পার্শ্বে ৩৩২' ফুট । ইহার ভিতরে একটি সুবৃহৎ অঙ্গন রয়েছে । এই অঙ্গন দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ২২৭'-০"X২৬৬'-০" ফুট । এই অঙ্গনের চারি দিকে প্রায় একই আয়তনের কক্ষ রয়েছে । উত্তর দিকে এই কক্ষের সংখ্যা বারটি । এরা প্রায় একই পরিকল্পনায় নির্মিত । কিন্তু উত্তর পশ্চিম দিকে প্রথম কক্ষটির পরে দুটো সুবৃহৎ কক্ষ পূর্ব পশ্চিমে অবস্থিত । এ দুটোর পরে দ্বার পথ অতিক্রম করে আরও দুটো ক্ষুদ্র কক্ষ পূর্ব পশ্চিমে অবস্থিত রয়েছে । এই চারটি কক্ষই রাস্তার দিকে খোলা । দক্ষিণ দিকে কক্ষের সংখ্যা হলো ১৪টি । দক্ষিণ দিকের ৭টি কক্ষ প্রায় একই পরিকল্পনায় নির্মিত । এর পরে রয়েছে দরজা পথের দিকে উন্মুক্ত দুটো কক্ষ । দরজা পথ অতিক্রম করে আরো দুটো কক্ষ প্রায় একই পদ্ধতিতে দরজার দিকে উন্মুক্ত অবস্থায় নির্মিত । এর পরে রয়েছে ৭টি কক্ষ । পশ্চিম দিক হতে একটি কক্ষের পরে যে কক্ষটি রয়েছে তাতে উপরে উঠার সিঁড়ি নির্মিত হয়েছে । পূর্ব পশ্চিমে প্রতিটি দিকেই ২৫টি করে মোট ২৫ X ২ = ৫০ টি কক্ষ রয়েছে । ছোট কাটরার কক্ষগুলির একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানকার প্রতিটি কক্ষ দুটি অংশে বিভক্ত । প্রতিটি অংশই একই আয়তনের, ১১'X১১' বিশিষ্ট একটি বর্গ । ছোট কাটরার অন্য একটি বৈশিষ্ট্য এই যে এর দক্ষিণ দেয়ালের দুইটি প্রান্তেই অষ্টকোণাকার বুরুজ রয়েছে । অন্য কোন কোনাতে এই রকম বুরুজ দেখা যায় না । বড় কাটরার সাথে ছোট কাটরার গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য এখানেই ।

ছোট কাটরায় প্রবেশ করার জন্য উত্তর ও দক্ষিণ দিকে দুটো দরজা পথ রয়েছে । এই দরজা দুটোর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে এরা একই অক্ষ পথে নির্মিত হয় নি। দক্ষিণ দিকের দরজা পথটি এই দিককার ইমারতের ঠিক মধ্যখানে অবস্থিত । কিন্তু উত্তর দিকের দরজাটি পূর্ব দিক হতে পশ্চিম দিকে প্রায় ১২টি কক্ষ অর্থাৎ ৪৪ গজ দূরে নির্মিত হয়েছে । এভাবে এ-কাটরার ভূমি পরিকল্পনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি লক্ষ্য করা যাচ্ছে । ছোট কাটরার আরও একটি বৈশিষ্ট্য এই যে উত্তর-পূর্ব, উত্তর পশ্চিম, দক্ষিণ-পূর্ব, দক্ষিণ-পশ্চিম কক্ষ সমূহ পৃথককারী ৪'-৬" প্রশস্ত একটি করে ৪টি গলি পথ রয়েছে ।

Dhaka University Institutional Repository

ছোট কাটরার দুটি বিশালাকার তোরণ পথের মধ্যে নদীর দিকস্থ তোরণ পথটি তিন তলা বিশিষ্ট এবং এর সামনের খিলানটি দ্বিতীয় তলা পর্যন্ত চলে গেছে।[১৩]

। নদীর তীরস্থ সামনের অংশটির তিন তলা বিশিষ্ট তোরণ পথটি এখনও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু ইউরোপীয় শিল্পরীতিতে নতুনভাবে নির্মিত তিনটি গবাক্ষপথ এবং শীর্ষ স্থানীয় মিনারগুলো মোঘল স্থাপত্য শিল্পের আত্মাকে হরণ করে নিয়েছে।[১৪] বিংশ শতাব্দীতে এই তোরণ পথের অভ্যন্তরে একটি নতুন দেউরী নির্মান করা হয়েছে। দক্ষিণ দিকের দ্বিতীয় তোরণ পথটি দ্বিতল বিশিষ্ট এবং উত্তর দিকের তোরণ পথের মত একই বৈশিষ্ট্যে খচিত। এই তোরণটি বর্তমানে অত্যন্ত জীর্ণাবস্থায় রয়েছে। উত্তর তোরণের পূর্ব দিকের অংশ ও পূর্ব বাহুর সম্পূর্ণ অংশ এবং দক্ষিণ বাহুর পূর্বাংশ অত্যন্ত জীর্ণ অবস্থায় এখনও টিকে আছে। উত্তর ও পূর্ব দিকের কক্ষ সমূহ সম্ভবত একতলা বিশিষ্ট ছিল, সেখানে একতলার ছাদের উপর দ্বিতল ইমারত নির্মিত হয়েছিল কিনা তা' বলার উপায় নেই। এই কাটরার পশ্চিমাংশের হদিস পাওয়া মুশকিল। এর কারণ এই এখানে নতুন করে যে সকল দোকানপাট ও গৃহাদী নির্মিত হয়েছে তার মধ্যে পুরাতন ইমারতের ছায়া-কায়া দুর্বোধ্য বিষয়বস্তু হিসেবে রয়ে গেছে।

ছোট কাটরার অভ্যন্তরে উন্মুক্ত চত্বরে ছিল একটি চমৎকার মসজিদ ও বিবি চম্পার সমাধি। বিবি চম্পার সমাধি এখনও বিদ্যমান রয়েছে। মসজিদের কোন চিহ্নমাত্র নেই। Charles'D' Oyly তাঁর "Antiqmities of Dacca " নামক গ্রন্থে[১৫] এই ক্ষুদ্র মসজিদটির একটি হৃদয়গ্রাহী, বিবরণ দিয়েছেন। এতে তিনি বলেছেন, এর মিনার সমূহ কমনীয় অষ্টভুজাকার স্তম্ভের দন্ডের মত উপরে উঠে গেছে। আর এদের প্রান্তে রয়েছে প্রাচ্য দেশীয় ফুল, ফল পরিশোভিত সুস্তশীর। প্রবেশ পথের দুই দিকে রয়েছে বৃহৎ গোলাকার স্তম্ভ। এর ভিত্তিমূলে রয়েছে হালকা বর্তুলনীয় কাল্পনিক অলংকরণ। মনে হয় এরা ফুল-দানীর উপর দণ্ডায়মান রয়েছে। এর গম্বুজ চমৎকারভাবে গড়তোলা। বিবি চম্পার সমাধি সৌধটিও ছোট কাটরার একটি তাৎপর্যপূর্ণ ইমারত।

Dhaka University Institutional Repository

বস্তুতপক্ষে ছোট কাটরার এ মহৎ পরিকল্পনার মধ্যে ছিল একটি প্রাসাদ, একটি মসজিদ, একটি সমাধি সৌধ এবং পোস্তা নামে একটি সুবৃহৎ বাঁধ। পোস্তা বুড়িগঙ্গা নদীর তীর বেয়ে মিট ফোর্ড হাসপাতাল থেকে লালবাগ পর্যন্ত সম্প্রসারিত। ছোট কাটরার পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বড় কাটরার অনুরূপ। কিন্তু গঠন প্রকৃতিতে ইহা বড় কাটরার চেয়ে ক্ষুদ্রতর। পরবর্তীকালে অমনোযোগিতা ও অবহেলার জন্য পড়ে এটা যথেষ্ট পরিমানে ক্ষতি গ্রস্ত হয়েছে। পরবর্তীকালে অবশ্য এটাতে কিছু কিছু সংস্কারকার্য চললেও এর আদিরূপ অংশের কবল হতে সর্বাংশে উদ্ধার করা আর সম্ভব হয় নি। বড় কাটরার মত এখানে বাংলার সুবাদার শায়েস্তা খানের জন্য একটি রাজপ্রাসাদ নির্মিত হয়েছিল, কিন্তু সম্রাট তনয় শাহ সুজার মত আমীর-উল-উমারাও এই প্রাসাদে বাস করেন নি। তবে তাঁর মৃত্যুর পরে বিবি চম্পা নামে তাঁর এক স্ত্রী বা উপ-পত্নী মতান্তরে তাঁর কন্যা এখানে বাস করতেন। তবে অধিকাংশ ঐতিহাসিকদের মতে বিবি চম্পা ছিলেন আমীর-উল-উমারার স্ত্রী। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র খোদা বন্দ খান ওরফে মীর্জা বাঙালীর বাসস্থান ছিল এটা। তাঁর বংশধররা বেশ কিছুকাল এখানে ছিলেন বলে আমাদের বিশ্বাস। তবে পরবর্তীকালে বড় কাটরার মত এই ছোট কাটরাটিও সরাই খানা ও পান্থশালা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। শ্রী যতীন্দ্র মোহন রায়ের মতে সোয়ারী ঘাটের উভয় পার্শ্বে এই দুটি কাটরা নির্মিত হওয়ায়/ঢাকায় নবাগত লোকদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বহুগুনে বর্ধিত হয়েছিল। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জুলাই এর একটি তালিকা দৃষ্টে অবগত হওয়া যায় যে, উভয় কাটরার ব্যয় নির্বাহের জন্য ১২৬০/- টাকা নির্ধারিত ছিল।

বাংলাদেশের স্থাপত্য শিল্পের ইতিহাসে কাটরার একটা বিশেষ স্থান ও মর্যাদা রয়েছে। কিন্তু দূর্ভাগ্য বশত কাটরা এদেশে সবচেয়ে বেশী অবহেলিত ইমারত। ঢাকার বিদ্যমান প্রাচীন স্থাপত্যের মধ্যে এই ছোট কাটরাটি বেশী পরিমানে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। অথচ এর সংরক্ষণ ও সংস্কারের জন্য সরকার ও দেশবাসীর যথার্থ উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত ছিল। একে বাংলাদেশ সরকারের পুরাকীর্তি সংরক্ষন আইনের অন্তর্ভূক্ত করা হলেও বাস্তবে তা প্রয়োগ করা হচ্ছে না। এভাবে আর কিছু দিন চললে এই প্রাচীন স্থাপত্য কীর্তিটির অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১. Dr. Ahmad Hasan Dani, Muslim Architecture in Bengal, (Dacca Museum, 1961), p. 220 এই লেখকের Dacca A Record of Its Changing Fortunes, (The Saogat Press, 1956), p. 107.

২. A Claude Campbell, Glimpses of Bengal, Vol-1, (Calcutta Campbell and Medland, 1907), p. 205.

৩. Dr. Ahmad Hasan Dani, Dacca A Record, op.cit. p. 107 Muslim Arechitecture in Bengal. op.cit. p. 220.

৪. Syed Aulad Hasan, Notes on the Antiquities of Dacca. (1904), p. 16.

৫. Dr. Syed Mahmudul Hasan, Ancient Monuments of East Pakistan, (Pakistan Academy 1970), p. 118 এই লেখকের A Guide to Ancient Monuments of East Pakistan, op.cit. p. 86.

৬. A Claude Campbell, op.cit., p. 205.

৭. Dr. Nazim Uddin Ahmed, Discover the Monuments of Bangladesh (The University Press, Dhaka, 1984), p. 159.

৮. Syed Muhammed Taifoor, Glimpses of Old Dhaka, (The Pioneer Printing Press Ltd. 1956), p. 149.

৯. দ্রষ্টব্য : শ্রী যতীন্দ্র মোহন রায়, ঢাকার ইতিহাস, প্রথম খন্ড (দি কমলা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, কলিকাতা, ১৩১৯ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৩৩৬ ।

১০. F.B. Bradley Birt, The Romance of An Eastern Capital (Metropolitan Book Co. Pvt. Ltd., Delhi , 1975), p. 132.

১১. James Taylor, Topography and Statistics of Dacca (Mann Military Orphan Press, 1840), p.77.

Dhaka University Institutional Repository

১২. শ্রী যতীন্দ্র মোহন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৬ ।

১৩. Mr. Ahmad Hasan Dani, Dacca A Record, op.cit., p. 107.

১৪. Dr. Ahmad Hasan Dani, Muslim, op.cit., p. 221.

১৫. Charles 'D' Oyly, Antiquities of Dacca, (Published by John Landseer, London, 1824-30), p. II.

Dhaka University Institutional Repository

১. ছোট কাটরা / দক্ষিণ তোরণ পথ (১৬৭১ খ্রীষ্টাব্দ)

Dhaka University Institutional Repository

ইমামবাড়া

Dhaka University Institutional Repository

হোসাইনী দালান

হোসাইনী দালান নামক ইমাম বাড়াটি পুরাতন বাজার-ই-মীর মুরাদ নামক এলাকায় নির্মিত হয়েছে। অধুনা এটা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের পিছনে বক্শী বাজার নামক অঞ্চলে অবস্থিত। ইহার নির্মাতা ও নির্মান তারিখ সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে ভয়ংকর মতবিরোধ রয়েছে। সৈয়দ আওলাদ হাসান,[১] সৈয়দ মুহাম্মদ তৈফুর[২], মুন্সী রহমান আলী তায়েশ[৩], আজিমুশ্শান হায়দার[৪], মিঃ আশরাফ হোসেন[৫] একমত যে, শাহজাদা শাহ্ সুজার আমলে আমীর-ই-বহর মীর মুরাদ ১০৫২ হিজরী/<১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে হোসাইনী দালান নির্মান করেন। শ্রী যতীন্দ্র মোহন রায়[৬] এবং এফ.বি. ব্রাডলি বার্ট[৭] ও শাহজাদা সুলতান সুজার আমলে মীর মুরাদ এটাকে নির্মান করেছেন বলে ধরে নিয়েছেন, তবে তাঁরা নির্মান তারিখ উল্লেখ করেননি। ডঃ আহমদ হাসান দানী[৮] যথাক্রমে শাহ্সুজা এবং মীর মুরাদ উভয়ের নাম উল্লেখ করেই ক্ষান্ত রয়েছেন। তিনি এর কোন নির্মান তারিখ দেন নি। টেইলর[৯] ও এ. কুড ক্যাম্পবেল[১০] উল্লেখ করেছেন যে সুলতান মুহাম্মদ আজম এর সময়ে (১৬৭৮-৭৯ খ্রীঃ) মীর মুরাদ এই ইমাম বাড়াটি নির্মান করেন। মওদুদুর রশিদ ১৬৪২ খ্রীঃ[১১] ও চার্লস ডি ওলি[১২] ১৬৭৬ খ্রীষ্টাব্দকে নির্মান তারিখ উল্লেখ করে আর বেশী দূর অগ্রসর হন নি। হাকিম হাবিবুর রহমান নওয়াব নসরত জং[১৩] এবং আঃ কঃ ম. যাকারিয়া[১৪] ঢাকার নায়েবে নাজিম নওয়াব জসরত খানকে এর নির্মাতা বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁরা কোন তারিখ উল্লেখ করেন নি। ডঃ সৈয়দ মাহমুদুল হাসান,[১৫] ডঃ নাজিমউদ্দিন আহমেদ[১৬] সযত্নে তারিখটি এড়িয়ে গিয়েছেন। অনেক ভাবনা চিন্তার পরে ডঃ সৈয়দ মাহমুদুল হাসান <u>A Guide to Ancient Monuments of East Pakistan</u>[১৭] গ্রন্থে নসরত জং কে এর নির্মাতা বলে উল্লেখ করেছেন। ঐতিহাসিকদের বিতর্কমূলক আলোচনা থেকে সঠিকভাবে এর নির্মাতা ও নির্মানকাল সম্পর্কে স্পষ্ট করে কোন কিছু বলা প্রায় কঠিন।

এটা লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, সুলতান শাহসুজা ও মীর মুরাদ,

উপরোক্ত ঐতিহাসিকদের আলোচনায় প্রাধান্য পেয়েছে বলে সুলতান শাহসুজার আমলে মীর-ই-বহর মীর মুরাদ কর্তৃক এটা নির্মিত হয়েছিল বলে ধরে নেয়া যায়।

Dhaka University Institutional Repository

তবে ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে এটা নির্মিত হয়েছিল বলে এরা যে অভিমত দিয়েছেন তা সমালোচনার যোগ্য ।

১০৫২ হিজরী তথা ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে মীর মুরাদ হোসাইনী দালান নির্মান করেছিলেন বলে একটি লাল বেলে পাথর শিলালিপিতে যে উল্লেখ রয়েছে তা হাকিম হাবিবুর রহমান ভ্রান্ত বলে বর্ণনা করেছেন । ডঃ আহমদ হাসান দানী তাঁর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছেন । তবে হাকিম হাবিবুর রহমানের মতে মীর মুরাদ এই ইমামবাড়ার নির্মাতা ছিলেন না । তিনি বলেন, "একটি ক্ষুদ্র তাজিয়া খানা একটি অজানা তারিখ হতে এখানে বিদ্যমান ছিল । নবাব নসরত জং এই জাকালো ইমারতটি নির্মান করেন । সৈয়দ মাহমুদুল হাসান তাঁর এই মতের সমর্থক । কিন্তু ডঃ আহমদ হাসান দানী নসরত জংকে এর নির্মানকারী বলে স্বীকার করে নিতে রাজী নন । এর কারণ এই যে নসরত জং এর সমসাময়িক ছিলেন । তিনি নওয়াব নসরত জংকে এর নির্মাতা বলে তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেন নি । তাই ডঃ আহমদ হাসান দানী হাকিম হাবিবুর রহমানের এই অভিমত গ্রহণ করেন নি । এফ.বি. ব্রাতলি বার্ট, যতীন্দ্র মোহন রায়, সৈয়দ মোহাম্মদ তাইফুর, আ.ক.ম. যাকারিয়া মীর মুরাদকে এই ইমাম বাড়ার প্রতিষ্ঠাতা বলে মনে করেন । এ জন্যই ডঃ আহমদ হাসান দানীর সাথে একমত হয়ে বলা যায় যে মীর মুরাদ অবশ্যই এই ইমারতের ভিত্তি এবং এর কিছু অংশ নির্মান কাজ সমাধা করে গিয়েছিলেন । আদী ইমারত সম্বন্ধে কোন চিত্র বা বিবরণ লিপিবদ্ধ না থাকাতে আমাদের পক্ষে এখন এর গঠন প্রণালী ও স্থাপত্য সম্বন্ধে কোন কিছু স্পষ্ট করে বলা অত্যন্ত কঠিন । তবে নওয়াব নসরত জং নয়, বরং নওয়াব জসরত জং যে এই পুরানো ইমারতকে পুনঃ নির্মানের মাধ্যমে জাকালো রূপ দিয়েছিলেন তা সত্য বলে গ্রহণযোগ্য । কারণ হলো অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে হোসাইনী দালান পুনঃ নির্মানে যে সব বৈশিষ্ট্য প্রয়োগ করা হয়েছিল তার একটি বিবরণ হাকিম হাবিবুর রহমান লিপিবদ্ধ করেছেন । এই বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নবাব জসরত খানকে এই জাকালো ইমারতের নির্মাতা হিসাবে গ্রহণ করা যায় । ডঃ আহমদ হাসান দানী, আ.ক.ম. যাকারিয়া এই মত সমর্থন করেন । ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ভূমিকম্পে এই ইমারতটির যথেষ্ট পরিমানে ক্ষতিগ্রস্থ হয়, তখন নওয়াব আহাসান উল্যা খান বাহাদুর প্রায় লক্ষ টাকা ব্যয় করে এই ইমামবাড়ার সংস্কার সাধন করেন ।

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকার ইমাম বাড়া অথবা হোসাইনী দালানটি দেয়াল দ্বারা পরিবেষ্টিত একটি বিরাট এলাকা নিয়ে বিদ্যমান। দু'টি তোরণ পথের মাধ্যমে এতে প্রবেশ করা যায়। দক্ষিণ দিকের তোরণ পথটি সাদা সিদা। দুটি বিশালাকার পিলপার মাধ্যমে এই দরজা পথ চিহ্নিত হয়েছে। এই চার-কোনাকার পিলপায় চারটি প্যাডিমেন্টের আকৃতি বিশিষ্ট খিলান রয়েছে। এই খিলান নাক বন্ধনীর উপর স্থাপিত হয়েছে। এর নিয়ে কলস ফিনিয়াল শোভা পাচ্ছে। প্যাডিমেন্টের আকৃতি বিশিষ্ট খিলান ও ফিনিয়ালের মধ্যে অগভীর আয়তাকার প্যানেল নির্মিত হয়েছে।

কিন্তু উত্তর দিকের তোরণ পথটি বিশালাকার। ইহা দ্বিতল বিশিষ্ট। এই তোরণ পথের ইমারতটি ৫১'-০" দৈর্ঘ্য ও ৩২'-৯" প্রশস্ত, এর উচ্চতা ২৬'-৮"। এর ফাসাদে ৫টি খিলান রয়েছে, কেন্দ্রের খিলানটি যথার্থ খিলান বিশিষ্ট প্রবেশ পথ। এটা ৯'-০" প্রশস্ত এবং ১৩'-৬" উঁচু বলে এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এর দু' পার্শ্বে আরও দু'টো খিলান নির্মান করা হয়েছে, এরা আকারে কেন্দ্রীয় খিলান হতে ক্ষুদ্রতর। এ দুটো খিলানের দু' পার্শ্বে সর্ব পূর্বে ও সর্ব পশ্চিমে আরও দু'টো ক্ষুদ্রতম খিলান রয়েছে। এই তোরণ পথের দক্ষিণ দিকটি ফাসাদের অনুরূপ। উপর তলার ফাসাদে নিচের তলার মত করে পাঁচটি খিলান নির্মান করা হয়েছে। মধ্যবর্তী তিনটি খিলান Keel এর পর্যায়ভুক্ত। সর্ব পূর্ব ও সর্ব পশ্চিম খিলান দুটো ঈষৎ চুচাঁলো। ছাদের উপরকার আয়তাকার স্থানটি বপ্রবিশিষ্ট (Parapet) দেয়াল দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়েছে। এই পরিবেষ্টিত স্থানটির আয়তন ছাদের আয়তন হতে ক্ষুদ্রতর। এর বপ্র অন্ধ মার্লন দ্বারা সজ্জিত। এর চারকোনায় চারটি বর্গাকার মিনার রয়েছে। এদের শীর্ষভাগে সুন্দর শিরেল বিশিষ্ট ক্ষুদ্র গম্বুজ নির্মান করা হয়েছে।

এই সদর দেউড়ী পার হয়ে একটি বিরাট অঙ্গনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হলে বিশালাকার হোসাইনী দালানটি চোখের সামনে ভেসে উঠে। কেন্দ্রস্থলে প্রতিষ্ঠিত এই দালানটি একটি কারিগরী জলাশয়ের উত্তর কিনারে প্রতিষ্ঠিত। এই ইমারতটি ৯'-৫" উঁচু উত্তোলিত মঞ্চের

Dhaka University Institutional Repository

উপর নির্মিত হয়েছে । মঞ্চকে একটি তলা হিসেবে ধরে নিলে এটা একটি ত্রিতল ইমারত । নীচের তলায় কক্ষগুলিতে কয়েকটি কবর লক্ষ করা যাচ্ছে । পূর্ব দিকে পনর ধাঁপ বিশিষ্ট একটি সিড়ির মাধ্যমে এই দালানের দ্বিতলের মেঝে পৌঁছা যায় । শ্রী যতীন্দ্রমোহন রায়,[১৮] স্যার যদুনাথ সরকার[১৯] ও হৃদয় নাথ মজুমদার[২০] ভুল করে হোসাইনী দালানকে একটি মসজিদ বলে অভিহিত করেছেন । অষ্টাদশ শতাব্দীর অনেক মসজিদের মত এটা একটি উচু মঞ্চের উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও এটা কোন মসজিদ নয় । এটা হলো ইসলামের শীয়া সম্প্রদায়ের ইমাম বাড়া বা ইমামদের বাড়ী নামে একটি ধর্মীয় ইমারত । মূলতঃ শিয়া সম্প্রদায়ের ইমাম হাসান (রাঃ) ও ইমাম হোসাইন (রাঃ) এর আত্ম ত্যাগকে স্মরণ করার উদ্দেশ্যে এই ইমারতটি নির্মিত হয়েছে । যুদ্ধ ও এতে শাহাদৎ বরণ এই ঘটনাকে উপলক্ষ করে ইমাম বাড়াটি নির্মিত হয়েছে বলে যুদ্ধ সরঞ্জাম, অস্ত্র শস্ত্র বিশেষতঃ ঢাল তলোয়ার এখানে সংরক্ষিত হয়েছে । মহা নবী (সাঃ) এর পৌত্রদ্বয়ের শাহাদাৎ উদযাপন করার জন্য প্রতি বৎসর মহরম মাসে এখানে একটি বিশেষ উৎসব পালিত হয় । শাহাদাৎ বরণ স্মরণ করাকে কেন্দ্র করে এই ইমাম বাড়াটি নির্মিত হয়েছে বলে তাজিয়া এবং উৎসবটিকে আড়ম্বর পূর্ণ করার জন্য অন্যান্য উপকরণও এখানে লক্ষ করা যায় ।

হোসাইনী দালান একটি জটিল প্রক্রিয়া । ইহা দৈর্ঘ্যে ১০৭'-০" এবং প্রস্থে ৭৪'-৯" । ইহার উচ্চতা ৩৩'-৪$\frac{১}{২}$" । সিঁড়ির সম্মুখে ২৭'-০" দৈর্ঘ্য এবং ২০'-০" প্রশস্থ যে কক্ষটি লক্ষ্য করা যায় তাকে বলা হয় দর বারান্দা বা শির্শি কক্ষ[২১] বা ১ নং কক্ষ । এর উত্তর দিকে যে কক্ষটি নির্মিত হয়েছে তা ২০'-০" দৈর্ঘ্য এবং ১৭'-০" প্রশস্থ, একে ২ নং কক্ষ হিসেবে ধরা যায় । ১ নং কক্ষের দক্ষিণ দিকের কক্ষটি ২০'-০" দৈর্ঘ্য ও ১৭'-০" প্রশস্থ । এটা হবে ৩ নং কক্ষ । ১ নং কক্ষের পশ্চিম দিকে যে বিরাট আকার কক্ষটি রয়েছে তা' দৈর্ঘ্যে ৫৪'-৬" ও প্রস্থে ২৫'-৬" এটাই হলো খোৎবা কক্ষ বা কেন্দ্রীয় কক্ষ ।[২২] এটা হবে ৪ নং কক্ষ । কেন্দ্রীয় কক্ষ বা ৪ নং কক্ষের উত্তর দিকে যে কক্ষটি রয়েছে তা দৈর্ঘ্যে ৫৪'-৬" এবং প্রস্থে ১৭'-০" । এটা হলো ৫ নং কক্ষ, জেনানার উদ্দেশ্যে এটা নির্মিত[২৩]। এর বা ৫ নং কক্ষের উত্তর পার্শ্বে রয়েছে একটি বারান্দা যা ৫৭'-০" দৈর্ঘ্য এবং ১৪'-৯" প্রশস্থ । এটা ৬ নং কক্ষ । কেন্দ্রীয় কক্ষ বা খোৎবা কক্ষের দক্ষিণে ৫৭'-০" দৈর্ঘ্য ও ১৭'-৯" প্রশস্থ আরেকটি কক্ষ রয়েছে, এটাও জেনানা কক্ষ নামে অভিহিত ।[২৪] এটা হবে ৭ নং কক্ষ । জেনানা কক্ষ দুটো ঢাকার ইমাম বাড়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য । ঢাকাতে অনেক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নির্মান করা হয়েছে, কিন্তু এদের কোনটাতেই অন্তঃপুরিকার মহিলাদের প্রার্থনার জন্য কোন ব্যবস্থা করা হয় নি । একমাত্র হোসাইনী দালানেই জেনানার উদ্দেশ্যে দুটো কক্ষ নির্মিত হয়েছে, যেখানে মহিলারা নির্জন প্রার্থনায় আত্ম নিবেদন করতে পারে । শিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে মহিলাদের যে একটা স্বতন্ত্র মর্যাদা রয়েছে ঢাকার হোসাইনী দালান তার উৎকৃষ্ট পরিচয় বহন করে ।

Dhaka University Institutional Repository

কেন্দ্রীয় কক্ষ বা খোৎবা কক্ষ বা ৪ নং কক্ষের পশ্চিমে ২৭'-০" দৈর্ঘ্য ও ১৬'-৮" প্রশস্ত যে কক্ষটি রয়েছে তা মিহরাব কক্ষ[২৫] নামে পরিচিত। মিহরাব কক্ষকে ৮ নং কক্ষ হিসেবে বিবেচনা করা যায়। ৮ নং কক্ষের উত্তরে ১৬'-৯" পার্শ্ব বিশিষ্ট একটি বর্গাকার কক্ষ রয়েছে। এটা নৈবেদ্য কক্ষ[২৬] এবং আমাদের ভাষায় এটা ৯ নং কক্ষ। এর উপরে প্রায় একই পরিমাপ বিশিষ্ট আরেকটি কক্ষ রয়েছে সেটা তৈজসপত্র রাখার কক্ষ। এটা ১০ নং কক্ষ। ৮ নং কক্ষের দক্ষিণ দিকে ২০'-০" দৈর্ঘ্য এবং ১৭'-০" প্রশস্ত কক্ষটি হবে ১১ নং কক্ষ যা তত্ত্বাবধায়কের দফতর হিসেবে কাজ করছে। ৮ নং কক্ষের পশ্চিম দিকে যে লম্বা সরু কক্ষ রয়েছে তা যথার্থ অর্থে মিহরাব কক্ষ নামে বিশ্লেষিত হবে। ব্যবস্থাপনায় এটা তিনটি ছোট কুঠুরীর সমন্বয়ে গঠিত, একে আমরা ১২ নং কক্ষ ধরে নিব। নকশায় ১২ নং কক্ষের অনুরূপ কিন্তু নির্মাণ কৌশলে প্রায় সম্পূর্ণ ভিন্নতর[২৭] আরও একটি কক্ষ এর উপরে নির্মাণ করা হয়েছে, এটাকেও তিনটি কক্ষের সমন্বয় হিসেবে ধরে নেয়া যায়। আমাদের বর্ণনা মোতাবেক এটা হবে ১৩ নং কক্ষ। কক্ষগুলির সংস্থাপনা বিবেচনা করে এই ইমাম বাড়াটিকে আমরা চারটি ব্লক হিসেবে ধরে নিয়ে আলোচনা করতে পারি।
(ভূমি নকশা ১৫)

<u>কক্ষ</u> : সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলে প্রথমে যে সরু বারান্দা পড়ে তাতে তিনটি সুবৃহৎ সূক্ষ্মাগ্র কলা বিশিষ্ট খিলানী প্রবেশ পথের মাধ্যমে প্রবেশ করতে হয়। প্রতিটি খিলান ৬'-৩" প্রশস্ত এবং ১২'-৯" উঁচু। এই তিনটি খিলানের উপরে তিনটি বৃহৎ আয়তাকার প্যানেল রয়েছে। এখানকার খিলানগুলি স্বাধীনভাবে দণ্ডায়মান। ৩৩'-১" x ২'-৩" পরিমিত দুটো পিলপার উপরে স্থাপিত। প্রান্তের দুটো পিলপা দেয়ালের সাথে সংলগ্ন। এই কক্ষের উত্তর ও দক্ষিণ দিকের ফাসাদ দ্বিতল বিশিষ্ট। নীচের তলাটিতে তিনটি সূক্ষ্মাগ্র কলা বিশিষ্ট খিলান রয়েছে। খিলানগুলি ৪'-৬" প্রশস্ত এবং ৭'-০" উঁচু। খিলানগুলি সুবৃহৎ ২'-১০" x ২'-২" বিশিষ্ট পিলপার উপরে নির্মিত। মধ্যের দুটো পিলপা সরল ও স্বাধীনভাবে দণ্ডায়মান, কিন্তু কিনারের পিলপা দুটো আগের মতই দেয়ালের সাথে সংযুক্ত দ্বিতীয় তলাটিতে রয়েছে প্রায় একই পরিমাণ প্রশস্ত ও উচুঁ তিনটি সূক্ষ্মাগ্র কলা বিশিষ্ট খিলান, কিন্তু এখানকার পিলপাতে উত্তর ও দক্ষিণ পার্শ্বে খিলানের পার্শ্ববহনকারী পলতোলা

Dhaka University Institutional Repository

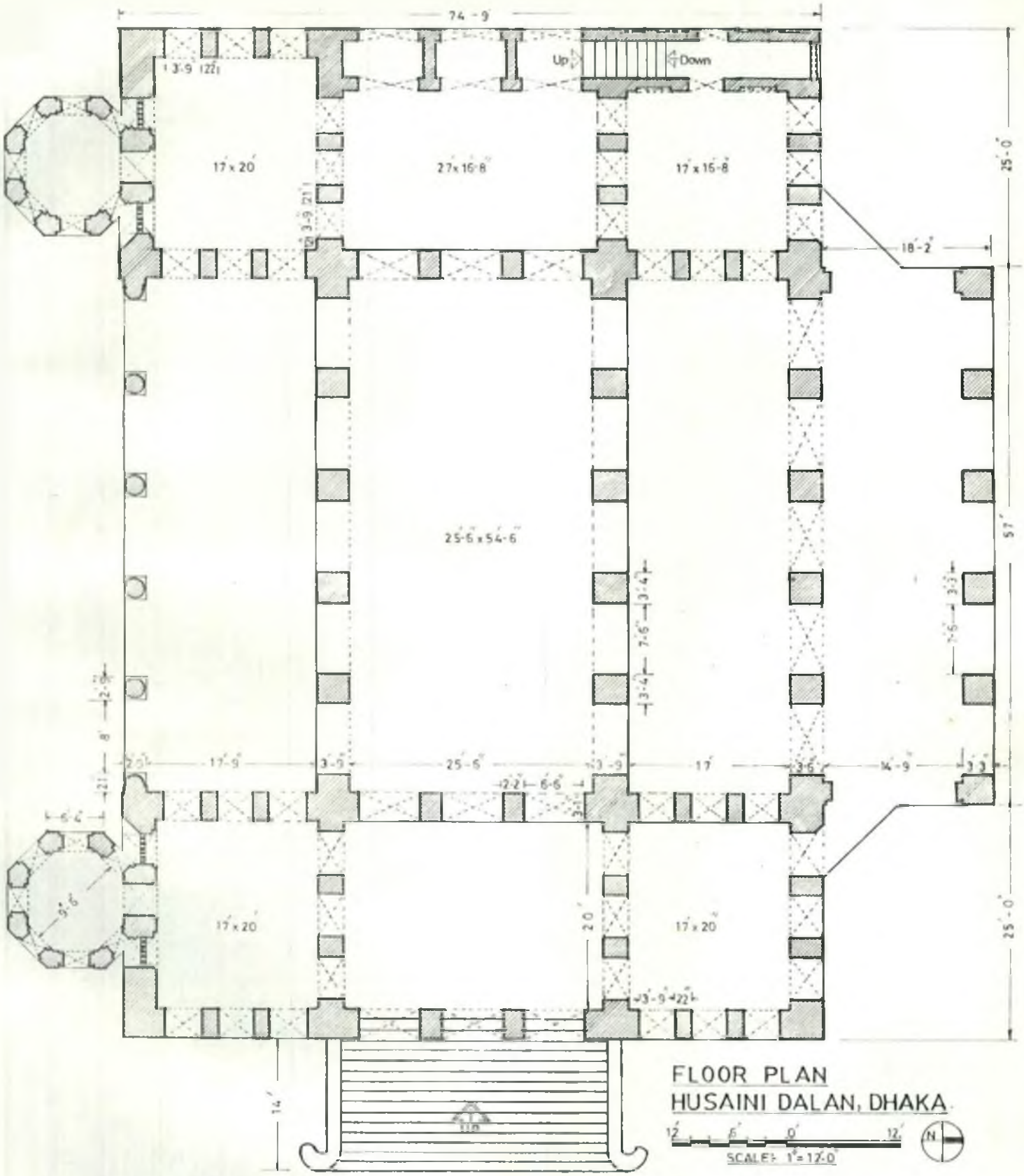

ভূমি নকশা ১৫

Dhaka University Institutional Repository

স্তম্ভ রয়েছে। এখানকার দুটো পিলপা নিম্ন তলার পিলপা হতে আয়তনে ক্ষুদ্রতর; তাই উপরের খিলানগুলি নিচের তলার খিলানগুলি হতে আয়তনে বৃহত্তর।

আলোচ্য তিনটি খিলান পথের মাধ্যমে ডান দিকে অপর একটি কক্ষে প্রবেশ করা যায়। এই কক্ষটিকে বারান্দা হিসেবে গন্য করা যেতে পারে। পরিকল্পনায় ইহা দ্বিতল বিশিষ্ট। এর পূর্ব দিকের ফাসাদে তিনটি সূচ্যাগ্র কলা বিশিষ্ট ৩'-৯" প্রশস্ত এবং ৭'-১" উচুঁ খিলান রয়েছে। পূর্ব দিকের খিলানবাহী দু'টি পিলপার পরিমান ৩'-০" x ২'-১"। উত্তর দিকের খিলানবাহী পিলপা দুটি ৩'-৫" x ২'-৩"; ।

এই তিনটি খিলানের উপরে দর বারান্দার উত্তর ও দক্ষিণ দিকস্থ ব্যবস্থাপনার মত প্রায় একই পরিমাপের তিনটি সূচ্যাগ্র কলা বিশিষ্ট খিলান রয়েছে এবং এখানকার চারটি স্তম্ভের মধ্যে দুটো স্তম্ভ দেয়ালের সাথে সংযুক্ত। মধ্যবর্তী দুটো স্তম্ভ স্বাধীনভাবে দণ্ডায়মান এবং এদের উত্তর ও দক্ষিণ দিকের গায়ে পলতোলা স্তম্ভ রয়েছে। এই বারান্দার দক্ষিণ দিকের ফাসাদের শিল্প কৌশল দরবারান্দার উত্তর দিকের শিল্প কৌশলের মত প্রায় একই রূপ। এর পশ্চিম দিকের ফাসাদে পূর্ব দিকের ফাসাদের অনুরূপ তিনটি সূচ্যাগ্র কলা বিশিষ্ট খিলান পথ লক্ষ্য করা যায়। বর্তমানে এগুলো বন্ধ কিন্তু এই খিলান পথের উপরে দ্বিতীয় তলাতে একটি ফ্যাডি-এক্স লক্ষ্য করা যায়। এখানে যে তিনটি সূচ্যাগ্র কলা বিশিষ্ট খিলান রয়েছে তাদের মধ্যে ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র খিলান ও ছোট ছোট প্যানেলের মাধ্যমে ঝাঁজরী সৃষ্টি করা হয়েছে; এগুলিকে সাধারণতঃ বাতায়ন পথ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

দরদালান হতে তিনটি খিলান পথের মাধ্যমে বাম দিকে অন্য একটি কক্ষে পৌঁছা যায়। এই কক্ষটিও ডান দিকের কক্ষের মত দ্বিতল বিশিষ্ট এবং এর নিচের তলাটির পূর্ব দিককার ফাসাদ অন্যান্য ফাসাদের মতই তিনটি সূচ্যাগ্র কলা বিশিষ্ট খিলান সহযোগে গঠিত, তবে মধ্যকার খিলান পথটি এখন জলাধার রূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। এদের উপরের ব্যবস্থাপনা দরদালানের দক্ষিণ ফাসাদ বা বাম পার্শ্বের বারান্দার ব্যবস্থাপনার অনুরূপ, কিন্তু এই কক্ষটির দক্ষিণ দিকে অনেকটা ব্যতিক্রমধর্মী বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এখানকার নীচতলায় তিনটি

Dhaka University Institutional Repository

প্রবেশ পথ সর্দল পদ্ধতিতে নির্মিত। কিন্তু এই উপরের প্রবেশ পথগুলিতে সূক্ষ্মাগ্র কলা বিশিষ্ট খিলানী কাঠামো রয়েছে। এই তিনটি পথের মধ্যবর্তী পথটি যথার্থ প্রবেশ পথ। এই পথের মাধ্যমে বাইরের অষ্টকোনাকার বুরুজের কক্ষে প্রবেশ করা যায়। এই প্রবেশ পথের ডান ও বাম পার্শ্বে যে দুটি আয়তাকার প্রবেশ পথ রয়েছে তা জ্যামিতিক জালি দিয়ে আবদ্ধ বলে এরা বাতায়ন পথ হিসেবে কাজ করছে। এখানকার ৩'-৫" দৈর্ঘ্য ও ২'-৩" প্রশস্ত দুটো আয়তাকার পিলপা সহজ ও সরল। এই দিকটার উপরের তলাটিতেও তিনটি প্রবেশ পথ রয়েছে। কেন্দ্রীয় প্রবেশ পথটি লিন্টেলের সহায়তায় নির্মিত আয়তাকার প্রবেশ পথ, তবে এর আয়তাকার কাঠামোর উপরে সূক্ষ্মাগ্র কলা বিশিষ্ট খিলানী অবয়ব রয়েছে। এই কেন্দ্রীয় প্রবেশ পথের মাধ্যমে অষ্টকোনাকার বুরুজের অভ্যন্তরে পৌঁছা যায়। এই কেন্দ্রীয় পথের ডান ও বাম দিকে এমন দুটো সূক্ষ্মাগ্র কলা বিশিষ্ট খিলান রয়েছে যা অন্যান্য কক্ষের উপরের তলার খিলানের অনুরূপ, তবে অন্যান্য খিলান সবগুলির উভয় কিনারাতে সূক্ষ্মাগ্র কলা রয়েছে। এখানকার পূর্ব দিকের খিলানের বাইরের দিকটার বাঁকে কোন সূক্ষ্মাগ্র কলা নেই।

গ ব্লক : বারদালান হতে তিনটি ৯'-৫" প্রশস্ত ও ১২'-২" উচুঁ সূক্ষ্মাগ্র কলা বিশিষ্ট খিলান পথের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় কক্ষটিতে প্রবেশ করা যায়। এখানকার মধ্যবর্তী দুটো পিলপা ৩৩'-০১" x ২'-০২" পরিসর বিশিষ্ট। প্রান্তস্থিত পিলপা দুটো দেয়ালের সাথে নিমগ্ন। এই কেন্দ্রীয় কক্ষের মেঝ পার্শ্ববর্তী অন্যান্য কক্ষের মেঝ হতে ০'-৮" উচুঁ। এই কেন্দ্রীয় কক্ষটির উত্তর সীমায় পাঁচটি বিরাট আকার সূক্ষ্মাগ্র কলা বিশিষ্ট খিলান পথ রয়েছে। প্রতিটি খিলান পথ ৭'-৬" প্রশস্ত এবং ১২'-২" উচুঁ। এখানকার খিলানবাহী পিলপা সমূহ ৩'-৯" x ৩'-৪" পরিমিত বিশিষ্ট। এই পিলপাগুলির মধ্যে ৪টি পিলপা স্বাধীন ভাবে দণ্ডায়মান, কিন্তু প্রান্তস্থিত পিলপা দুটো দেয়ালের সাথে সংযুক্ত। খিলানের ছকিত (soffit) পরস্পর বিপরিত দিকে হতে আগত দুটো খিলা কাঠামো দ্বারা বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত। প্রতিটি ছকিত (soffit) কাল রং এ রঞ্জিত। প্রতিটি খিলানী প্রবেশ পথের উপরে তিনটি অগভীর ইনগ্রেইণ্ড খিলান বিশিষ্ট নস্থা রয়েছে। এ সবগুলি দরজার উপর নির্মিত। এ সব খিলানের

Dhaka University Institutional Repository

সংখ্যা হলো পনরটি । এ-ছাড়া স্তম্ভের উপরে দুইটি ইনগ্রেইণ্ড খিলানী নক্সার মধ্যে একটি ক্ষুদ্রতর সাধারণ খিলানী নক্শা রয়েছে । এদের সংখ্যা হলো চারটি । এভাবে এদের সর্ব মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ১৯টিতে । এ ছাড়াও পিলপার পূর্ব ও পশ্চিম পিঠে আয়তাকার প্যানেল রয়েছে । আর পিলপার উত্তর ও দক্ষিণ পিঠ আয়তাকার দু'ফলা ও বহু ফলা বিশিষ্ট খিলান ও ছুঁচালো চারিকেন্দ্রীক খিলান দ্বারা সজ্জিত করা হয়েছে । এই দুই পিঠের অলংকরণের মধ্যে পার্থক্য এই যে দক্ষিণ পিঠের নক্শাগুলো কৃষ্ণ বর্ণে রঞ্জিত । আর উত্তর দিকের নক্শাগুলো প্লাস্টার শুভ্র । কেন্দ্রীয় কক্ষটির কিবলার দিকে তিনটি সু বৃহৎ সূক্ষ্মাগ্র ফলা বিশিষ্ট খিলান রয়েছে । আয়তন, উচ্চতা ও অলংকরণে এরা পূর্ব দিকের ফাসাদের খিলানের অনুরূপ । দক্ষিণ দিকের ফাসাদটিও উত্তর দিকের ফাসাদের সাথে সাদৃশ্য রক্ষা করেছে । উত্তর দিকে পাঁচটি খিলান পথের মাধ্যমে প্রশস্ততর একটি সু বৃহৎ কক্ষে প্রবেশ করা যায় । এই কক্ষটি ৫৪'-৬" দৈর্ঘ্য এবং ১৭'-০" প্রশস্ত । এই কক্ষটির উত্তর দিকে পাঁচটি সু প্রশস্ত খিলান পথ।এরা উত্তর দিকের দরজার দিকে উন্মুক্ত । প্রতিটি খিলান ৭'-৬" প্রশস্ত এবং ১২'-১০" উঁচু । স্বভাবতই এই খিলান সমূহ উচ্চতায় কেন্দ্রীয় খিলান সমূহের উচ্চতা হতে ১৮" কম । এই কক্ষটির পশ্চিম দেয়ালের ব্যবস্থাপনা পূর্ব দেয়ালের অনুরূপ । অথবা দরবারাক্কার ডান পার্শ্বের কক্ষের পশ্চিম পার্শ্বের দেয়ালের মতই । এই কক্ষ হতে পাঁচটি খিলান পথের মাধ্যমে উত্তর দিকের বারান্দায় পৌঁছতে হয় । এই বারান্দার ছয়টি বিরাট আকার পিলপা হোসেনী দালানের উত্তর সীমা চিহ্নিত করেছে । পিলপাগুলি আকারে বিরাট, এদের চারটি পিলপার প্রতিটি দিক ৩'-৩" প্রশস্ত কিন্তু কোনাতে যে দুটো পিলপা রয়েছে অদের একটি পার্শ্ব ০৪" কমিয়ে অন্য পার্শ্বটি ০৮" বর্ধিত করা হয়েছে, অর্থাৎ এরা ৩'-১১" x ২'-১১" পরিমিত বিশিষ্ট ।

কেন্দ্রীয় কক্ষটি হতে পাঁচটি খিলান পথের মাধ্যমে দক্ষিণ দিকে একটি বারান্দা বা ৭ নং কক্ষে পৌঁছা যায় । চারটি স্বাধীনভাবে দণ্ডায়মান স্তম্ভ এবং দুটি প্রান্ত দেয়াল সংলগ্ন নিমগ্ন স্তম্ভ এর সীমানা চিহ্নিত করেছে । স্তম্ভগুলির পরিসীমা ৮'-০" । এরা ২'-৯" পার্শ্ব বিশিষ্ট বর্গাকার পাদানীর উপর দণ্ডায়মান । প্রতি দুটো স্তম্ভের মধ্যে ৭'-১১"ব্যবধান

Dhaka University Institutional Repository

রেখে এগুলি নির্মান করা হয়েছে । বর্গাকার পাদানীর উচ্চতার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে এখানে একটি দেয়াল রূপ অবকাঠামো নির্মান করা হয়েছে । এ দুটি স্তম্ভের মধ্যবর্তী অবকাঠামোগত দেয়ালে ০'-১১" ব্যাস বিশিষ্ট দুটো বৃত্তাকার ফোকর নির্মান করা হয়েছে । নীচের দিকে ইট-চুন-সুরকি নির্মিত পাড় বিশিষ্ট জলাশয় এর মধ্যস্থ পানি বা মাছের সৌন্দর্য অবলোকন করার উদ্দেশ্যে এগুলো নির্মান করা হয়েছিল কিনা বলার উপায় নেই ।

হোসেনী দালানের কিবলা দেয়ালের বহিঃ গাত্র কম বেশী অভ্যন্তরীন গাত্রের অলংকরণের অনুরূপ । পশ্চিম ব্লকের ত্রিতলে অবস্থিত সর্বশেষ উত্তরের কক্ষটি নিম্নস্থ দ্বিতলের কক্ষটির মত দেখতে, তবে এর উত্তর দিককার চারিটি সূক্ষাগ্র কলা বিশিষ্ট খিলানকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র খিলান ও ফোকর বিশিষ্ট ক্ষুদ্র প্যানেলের ঝাঁকরী দ্বারা পূর্ণ করে দেয়া হয়েছে । এই কক্ষটির পিলপার বহিঃ ভাগ এই সীমার সর্ব পূর্ব কক্ষটির বাহিঃ দেশীয় পিল্‌পার মতই পলতোলা । নিম্নস্থ স্তম্ভ দ্বারা খিলানের কাঠামোকে ধরে রাখা হয়েছে । হোসাইনী দালানকে মার্বেল দ্বারা সজ্জিত করা হয়েছে ।

গ ব্লক : কেন্দ্রীয় কক্ষটির পূর্ব দিকস্থ তিনটি সূক্ষাগ্র কলা বিশিষ্ট খিলান পথের অনুরূপ পশ্চিম দিকেও তিনটি খিলান পথ রয়েছে । এই তিনটি খিলান পথের মাধ্যমে সর্ব পশ্চিমের কক্ষটিতে প্রবেশ করা যায় । এই কক্ষটি ২৭'-০" দৈর্ঘ্য এবং ১৬'-৮" প্রশস্ত । এর উত্তর দিকে একটি আয়তাকার প্রবেশ পথ রয়েছে । এই প্রবেশ পথটির উপরে সূক্ষাগ্র কলা বিশিষ্ট খিলানী কাঠামো লক্ষ্য করা যাচ্ছে । এই প্রবেশ পথটির ডান ও বাম পার্শ্বে দু'টি সূক্ষাগ্র কলার অগভীর খিলান বিশিষ্ট কুলুঙ্গি লক্ষ্য করা যাচ্ছে । এদের উপরে রয়েছে তিনটি সূক্ষাগ্র কলার খিলান বিশিষ্ট অগভীর কুলুঙ্গি । এরা দরজা বা জানালা কোনটিই নহে, তবে এদের বাঁকের মধ্যে আয়তাকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোকর রয়েছে । এদের সবগুলি পিল্‌পাই দেয়ালের সাথে সংযুক্ত তবে পিল্‌পা সমূহের পিঠে পলতোলা স্তম্ভ রয়েছে । এই কক্ষটির দক্ষিণ দিকেও তিনটি সূক্ষাগ্র কলা বিশিষ্ট খিলান পথ লক্ষ্য করা যায় । উত্তর দিকের দেয়ালের মত এরাও দ্বিতলে বিভক্ত । এর উপরের তলাটিতেও তিনটি সূক্ষাগ্র কলা বিশিষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

খিলানী প্রবেশ পথ রয়েছে । উত্তর দিকের দেয়াল আর দক্ষিণ দিকের দেয়াল কাঠামোগত বৈশিষ্ট্যে এক ; তবে পার্থক্য এই যে, উত্তর দিকের দেয়ালের নীচের সারিতে একটি মাত্র আয়তাকার প্রবেশ পথ আর দক্ষিণ দিকের দুটো সারি ছয়টি খিলান বিশিষ্ট প্রবেশ পথের সমষ্টি ।

ঘ ব্লক :

১/ এই কক্ষটির পশ্চিম দিকে তিনটি সূক্ষ্মাগ্র কলা বিশিষ্ট সু বৃহৎ খিলান পশ্চিম দিকে তিনটি কুলজির অনুরূপ কক্ষের দিকে উম্মুক্ত । এই সূক্ষ্মাগ্র কলা বিশিষ্ট খিলানের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এদের শীর্ষ দেশে কোন কলা নেই । এই তিনটি খিলানই কম-বেশী ৬'- ৭" দৈর্ঘ্য এবং ৫'-৩" প্রশস্ত তিনটি ক্ষুদ্রতর কক্ষ গঠন করেছে । নিম্নস্থ তিনটি ক্ষুদ্রতর কক্ষ ও তিনটি সু প্রশস্ত খিলান পথের সাথে সংগতি রেখে এদের উপরে একটি দ্বিতীয় তলা নির্মান করা হয়েছে । বস্তুতপক্ষে ইমারতের কাঠামোগত রূপের বিশ্লেষনে এই অংশটি যথার্থই তৃতীয় তলা গঠন করেছে । ইমারতের এই তলাটি নির্মান কৌশলগত বৈশিষ্ট্যে এবং অলংকরণে একান্তই অভিনব[২৮] বলে ইহা সার্বিক ইমারতের সবচেয়ে গুরুত্ব-পূর্ণ অংশ । নীচের তলার সাথে সংগতি রেখে এই উপরের তলাটিও তিনটি ভাগে বিভক্ত করে নির্মান করা হয়েছে । প্রতিটি সু প্রশস্ত খিলানের উপরে তিনটি ত্রি- সূক্ষ্মাগ্র কলা বিশিষ্ট খিলান নির্মান করা হয়েছে । এই খিলান গুলো অষ্ট কোনাকার জোড়/- করিন্থিয়ান Corinthian স্তম্ভের উপর স্থাপিত । এ সকল খিলানের সফিত(soffit) কৃষ্ণ বর্ণে রঞ্জিত । এবং এদের spandrel লতা গুল্ম ও পুষ্প অলংকরণে সজ্জিত । এই খিলান সারি বা স্তম্ভ শ্রেণী একটি দোচালা অট্টালিকাকে সমর্থন দিচ্ছে । এই দোচালা ঘরের ছাদ বপ্র ছাইচ হিসেবে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে । বপ্র ছাইচ ও খিলানী কাঠামোর মধ্যবর্তী অংশ-টি কৃষ্ণ বর্ণ ফুল, পদ্ম পাপড়ি ও বেলুন সদৃশ অলংকরণে বৈশিষ্ট্য মন্ডিত । এই খিলান সারিতে যে নয়টি খিলান রয়েছে তাদের প্রতি তিনটির পর একটি করে পিল্‌পা রয়েছে । মধ্যবর্তী দুটি পিল্‌পা স্বাধীনভাবে দণ্ডায়মান আর পার্শ্ববর্তী দুটি পিল্‌পা দেয়ালের সাথে সংযুক্ত । এই পিল্‌পার দুই দিকে এক জোড়া করে অর্ধ অষ্ট কোনাকার করিন থিয়ান স্তম্ভ নির্মান করা হয়েছে, আর এদের পূর্ব পৃষ্টদেশ তিনটি করে আয়তাকার প্যানেলে বিভক্ত । এই প্যানেলের মধ্যে রয়েছে ক্যান্ডেল আকৃতির অলংকরণ । এই তলার চারটি স্তম্ভ দোচালা

Dhaka University Institutional Repository

ছাদের সংগম স্থলভেদ করে উপরে কড়িকাঠ পর্যন্ত পৌঁছেছে । আর তিনটি স্তম্ভ তিনটি বাকাঁনো ছাদ এর শীর্ষ বিন্দুর উপর নির্মিত হয়ে ছাদ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে । ইমারতের এই বিশেষ অংশের কাঠামোর সাথে সংগতি রেখে পশ্চিম দেয়ালে সূচ্যাগ্র কলাবিশিষ্ট বন্ধ খিলান নির্মান করা হয়েছে । কিন্তু এসব খিলানের স্প্যানড্রিল ও ছাদিতে কোন অলংকরণ নেই । এই বন্ধ খিলানগুলোর চাপ বহন করছে আয়তাকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংযুক্ত পিলপা ।

২৭'-০" X ১৬'-৮" পরিমাপ বিশিষ্ট কক্ষটি হতে একটি আয়তাকার দরজা পথের মাধ্যমে উত্তরের শেষ কক্ষটিতে পৌঁছা যায় । এই কক্ষটি ১৬'-৯" পার্শ্ব বিশিষ্ট একটি বর্গ । এই বর্গাকার কক্ষের পূর্ব দিকে তিনটি সূচ্যাগ্র কলা বিশিষ্ট খিলান পথই প্রবেশ পথ হিসেবে কাজ করছে, কিন্তু পশ্চিম দিকে রয়েছে শুধুমাত্র সূচ্যাগ্র কলা বিশিষ্ট একটি খিলান পথ । এর দু' পার্শ্বে দুটো সূচ্যাগ্র কলাবিশিষ্ট খিলান বিশিষ্ট অগভীর কুলঙ্গি রয়েছে । এর উত্তর দিকে পূর্ব দিকস্থ সূচ্যাগ্র কলা বিশিষ্ট খিলান পথই হলো যথার্থ দরজা, কিন্তু এই দরজাটির বহিঃভাগ লিন্টেল পদ্ধতিতে নির্মিত । এই দরজার পশ্চিম দিকে দুটো গভীর আয়তাকার কুলঙ্গি রয়েছে এরা আলমারী হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে । এই আলমারীর উপরিভাগও সূচ্যাগ্র কলা বিশিষ্ট খিলান পথ । এর দক্ষিণ দেয়ালের আয়তাকার প্রবেশ পথটির দু' পার্শ্বে সূচ্যাগ্র কলা বিশিষ্ট গভীর কুলঙ্গি রয়েছে । এই কক্ষটির একটি বৈশিষ্ট্য এই যে নীচের তলা হতে একটি সিঁড়ি এখানে এসে শেষ হয়েছে । এই সিঁড়ির শেষাংশে উত্তর দিকে প্রায় চৌ-চালা ছাদের অবয়ব রয়েছে যার নীচে নির্মিত হয়েছে জলাধার ।

এই কক্ষটির উপরে একই আয়তন বিশিষ্ট আরেকটি কুঠরী রয়েছে । এই কুঠরীটি এই অংশের ত্রিতল বা সার্বিক ইমারতের ত্রিতল । এই কক্ষের দক্ষিণ দিক তিনটি বন্ধ খিলান কুলঙ্গি । এর পূর্ব দিকের জানালার ঝাঁকরী পূর্বেই আলোচিত হয়েছে । এর পশ্চিম দিকস্থ ক্ষুদ্রতর কুলঙ্গি সর্বশেষ কুলঙ্গি হতে একটি সিঁড়ির মাধ্যমে উপরে উঠে প-শ্চিম দিকের একটি দরজা পথের সাথে মিলিত হয়েছে । সূচ্যাগ্র কলা বিশিষ্ট খিলান পথের মাধ্যমে এই কক্ষটিতে প্রবেশ করা যায় । নীচের তলার অনুরূপ প্রায় উত্তর ভারতীয় চৌচালার নীচে দিয়ে সিঁড়িটি শেষ হয়েছে ।

Dhaka University Institutional Repository

শেষ হয়েছে । এই কক্ষটির উত্তর দিক চারটি সূচ্যাগ্র খিলান সমন্বয়ে গঠিত, তবে এগুলি দরজা নয়, কুদ্রাতি কুদ্র খিলান ও প্যানেল সহযোগে গঠিত বাতায়ন পথ । এই তিনটি বাতায়ন পথের পশ্চিমে যে চতুর্থ বাতায়ন পথটি রয়েছে তা সিঁড়ি পথের প্রান্তসীমা সূচিত করেছে ।

হোসেনী দালানের দক্ষিণ পূর্ব ও দক্ষিণ পশ্চিম কোনে দু'টি বুরুজ ইট-চুন-সুড়কি গাড় বিশিষ্ট নির্মিত/জলাশয়ের মধ্য হতে উপরে উঠে গিয়েছে । এই বুরুজ দুটি তিনটি তলায় বিভক্ত। আকৃতিতে এরা অষ্টভুজ । নীচের তলাটি নরল, দ্বিতীয় তলাটিতে উত্তর দিক হতে একটি লিন্টেল বিশিষ্ট আয়তাকার দরজা পথের মাধ্যমে প্রবেশ করা যায় । উপরের অষ্টভুজ চারি কেন্দ্রীক চূচাঁলো খিলানের মাধ্যমে নির্মিত । তৃতীয় তলাটিতে একটি আয়তাকার দরজার মাধ্যমে প্রবেশ করা যায় । অন্য সাতটি বাহু আয়তাকার গবাক্ষ পথ হিসেবে কাজ করছে । এতে রয়েছে জ্যামিতিক জানালা গ্রীল । উপরে গম্বুজ নির্মান করতে আর কোন অসুবিধা হয়নি, কেননা অষ্টভুজের উপরেই বিনা বাধায় গম্বুজ নির্মিত হয়েছে ।

ইমাম বাড়ার ছাদ আধুনিক, এই ছাদ কাঠের কড়ি কাঠের উপর নির্মিত । কিন্তু এর ছাদ সর্বাংশে সমতল বিশিষ্ট নয় । কেন্দ্রীয় কক্ষের ছাদের উচ্চতা উত্তর, পশ্চিম, দক্ষিণ ও পূর্ব দিকের কক্ষের ছাদের উচ্চতার চেয়ে ৩'-৮" বেশী । উত্তর দিকস্থ বারান্দার ছাদের উচ্চতা পার্শ্ববর্তী কক্ষের ছাদের উচ্চতার চেয়ে ২'-১০" কম । ছাদের উপরে চার কোনায় চারটি বর্গাকার ট্যারেট রয়েছে, যার দক্ষিণ দিকে পূর্ব ও পশ্চিম কোনাতে যে দুটো অষ্টকোনাকার বুরুজ রয়েছে তাদের শিশা ১'-৬" উঁচু । আর অষ্টকোনাকার বুরুজের গম্বুজ পার্শ্ববর্তী কক্ষের ছাদের চেয়ে ১'-৮" বেশী উঁচু । প্রকৃত পক্ষে হোসাইনী দালানের ছাদের বিন্যাসে ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি । যদি এই দুটো গম্বুজ পার্শ্ববর্তী কক্ষের ছাদের চেয়ে আরো বেশী উঁচু করে নির্মান করা হতো তাহলে ইমাম বাড়ার সৌন্দর্য বহুগুনে বর্ধিত হতো [২৮] ।

Dhaka University Institutional Repository

উপরিউক্ত আলোচনা অনুসরণ করে হোসাইনী দালান নির্মান পরিকল্পনাকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যেতে পারে। এর প্রথম পরিকল্পনা করেন আমীর-ই-বহর মীর মুরাদ কিন্তু তাঁর নির্মিত ইমামবাড়াটি সম্পর্কে কোন কিছু স্পষ্ট করে বলা সম্ভব নয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে এটা পুনঃ নির্মান ও সংস্কার করেন নওয়াব জসরৎ খান। তিনি এই ইমারতের প্রকৃত রূপদাতা। পরে ভূমিকম্পে এই ইমারতটি ক্ষতিগ্রস্থ হলে নওয়াব আহসানউল্লাহ এর পুণঃ সংস্কার করেন। তাঁর সংস্কারের ফলে এই ইমারতটি আধুনিক রূপ পেয়েছে। এতদসত্ত্বেও প্রাচীন কীর্তি হিসেবে এটাতে যে সব স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় তা স্থাপত্য বিশারদদের মনোযোগ আকর্ষণ করার পক্ষে যথেষ্ট। বাংলায় ঢাকার ইমামবাড়া ছাড়াও হুগলী, মুর্শিদাবাদে ইমামবাড়া নির্মিত হয়েছে, কিন্তু এদের কোনটিই ঢাকার ইমামবাড়াটির মত এত অধিক গুরুত্ব পায়নি। বস্তুতপক্ষে এই ইমারতের নির্মান পরিকল্পনা, স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য, অলংকরণ ইত্যাদি বিবেচনা করে এটাকে ঢাকার স্থাপত্য শিল্পে উঁচাকালোত্তম ইমারত সমূহের একটি হিসেবে গন্য করা যেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১. K.B. Syed Aulad Hasan, Notes on the Antiquities of Dacca (1904), p. 18.

২. Syed Muhammed Taifoor, Glimpses of Old Dhaka, (The Pioneer Printing Press Ltd. 1956), p. 125.

৩. মুনশী রহমান আলী তায়েশ, তাওয়ারিখ-ই-ঢাকা, অনূদিত ডঃ আঃ মঃ মঃ শরফুদ্দীন (ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ - ১৯৮৫), পৃ. ২০০ ।

৪. Azimusshan Haidar, Dacca History and Romance in Place Names (Dacca Municipal Publication, 1967), p. 34.

৫. মিঃ আশরাফ হোসেন, সাপ্তাহিক কমল, ২৯,৩০, বিশেষ সংখ্যা ১৯৮৯, পৃ. ৪১ ।

৬. শ্রী যতীন্দ্র মোহন রায়, 'ঢাকার ইতিহাস' (দি কমলা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, কলিকাতা ১৩২২ বাং.) পৃ. ৪১৬ ।

৭. F.B. Bradley Birt, The Romance of An Eastern Capital, (Metropolitan Book Co. Ltd. Delhi, 1975), p. 269.

৮. Ahmad Hasan Dani, Muslim Architecture in Bengal, (Dacca Museum, 1961), p.205 এবং তাঁর Dacca A Record of Its Changing Fortunes. (Asiatic Press, Dhaka, 1962), p. 196.

৯. James Taylor, Topography and Statistic of Dacca, (Calcutta Malitary Orphan Press, 1849), p.p. 90.91.

১০. A Claude Campbell, Glimpses of Bengal, Vol-I (Culcatta Campbell and Medland, 1907), p. 207.

১১. মউদুদ-উর-রশীদ, 'মোঘল আমলে ঢাকার স্থাপত্য', সচিত্র বাংলাদেশ (১৫ই মার্চ, ১৯৮৯ সংখ্যা), পৃ. ২৩ ।

১২. Sir Charles 'D' Oyly Antiquities of Dacca, (John Landseer London, 1824-30), p. 13.

১৩. Hakim Habibur Rahman, Asudgan-i-Dacca, p.p. 142-145.

Dhaka University Institutional Repository

১৪. আঃ কঃ মুঃ যাকারিয়া, বাংলাদেশের প্রত্ন সম্পদ, (বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৮৪), পৃ. ৪৫৫ ।

১৫. Dr. Syed Mahmudul Hasan, Ancient Monuments of East Pakistan (The Pakistan Academy, 1970), p. 119.

১৬. Dr. Nazem Uddin Ahmed, Discover the Monuments of Bangladesh, (The University Press Ltd. Dhaka 1984), p. 180.
এবং একই লেখকের Islamic Heritage of Bangladesh, (Department of Films and Publications,1980), p.p. 54.55.

১৭. Dr. Syed Mahmudul Hasan, A Guide to Ancient Monuments of East Pakistan (Society for Pakistan Studies, 1970),p.87.

১৮. শ্রী যতীন্দ্র মোহন রায়, প্রাগুক্ত - পৃ. ৪১৬ ।

১৯. Sir J.N. Sarkar, The History of Bengal, Vol-II. (Muslim Period 1200-1757), (Dacca University Publication, 1948), p. 390.

২০. Hridaya Nath Majumbar, The Reminiscences of Dacca, (Calcutta 1926), p. 37.

Dhaka University Institutional Repository

১. হোসাইনী দালান (১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দ) দক্ষিণ দিকের দৃশ্য

২. হোসাইনী দালান, দোচালার নিম্নস্থ মিহরাব

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

ভারতবর্ষে মুঘল স্থাপত্য এক অভিনব সৃষ্টি । এই জন্যই এই উপ-মহাদেশে এই স্থাপত্যের প্রভাব ব্যাপক ও সুদূর-প্রসারী হয়েছিল । ফলে এমন একটি ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল যে মুঘলদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশ তথা ঢাকায় যে স্থাপত্য গড়ে উঠলো তা সাধারণতঃ মুঘল স্থাপত্যরীতি ও শৈল্পিক ঐতিহ্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল । তাই ঢাকার স্থাপত্য ভারতবর্ষের মুঘল স্থাপত্যের একটি শাখা বই আর কিছু নয় । কিন্তু এরূপ ধারণার যথেষ্ট সীমাবদ্ধতা রয়েছে । ইসলামী স্থাপত্যের কথা বলতে গেলে এর দুটো বিশেষ রূপ রয়েছে একটি ইসলামিক অপরটি স্থানীয় । পশ্চিম এশীয়, প্রাক-মুঘল যুগের ভারতীয় এবং মুঘলপূর্ব যুগের বাংলাদেশী স্থাপত্যরীতি, কারিগরী কৌশল থেকে সম্পূর্ণ সতন্ত্র কোন স্থাপত্য-রীতি ও শিল্প কৌশল গড়ে উঠতে পারেনা । বাংলার, বিশেষতঃ ঢাকার মুঘল স্থাপত্য এ দেশের আবহাওয়া, জলবায়ু এবং স্বদেশজাত শৈল্পিক ঐতিহ্য দ্বারা অনেক ক্ষেত্রেই নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল । এসব দিক বিবেচনা করে বলা যায় যে, ঢাকা তথা চক বাজার স্থাপত্য মূলত মুঘল হলেও স্থানীয় প্রভাব সক্রিয় রয়েছে ।

চক বাজারের উৎপত্তি ও এর গুরুত্ব সম্পর্কে ও ঐতিহাসিকগণ একমত হতে পারেননি। বস্তুতপক্ষে ঢাকার চক বাজার এলাকাকে এই নগরীর প্রাচীনতম স্থান সমূহের একটি বলে উল্লেখ করা যেতে পারে । এই এলাকায় নির্মিত স্থাপত্যকীর্তি সমূহই এর প্রকৃষ্ট প্রমান । চক বাজার এলাকায় যে সমস্ত প্রাচীন মসজিদ, ইমামবাড়া, সমাধিসৌধ ও কাটরা গড়ে উঠেছিল ঢাকার অন্য কোন এলাকায় এত সংখ্যায় এবং এই প্রকৃতির স্থাপত্য কীর্তি গড়ে উঠেনি । এখানে রয়েছে ইসলাম খানের মসজিদ, শায়েস্তা খানের মসজিদ, চক মসজিদ, কারতালাব খান মসজিদ, আরমানিটোলা ছোট মসজিদ, মীর্জা গোলাম পীরের মসজিদ ও আমীর উদ্দীনের মসজিদ । এদের পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা এই অভিসন্দর্ভে তুলে ধরা হয়েছে, তবে চুঁড়িহাট্টা মসজিদ, ও নবরায় গলির মসজিদ পূর্ণ অবয়বে বিদ্যমান না থাকাতে এদের

Dhaka University Institutional Repository

বর্ণনায় প্রাচীন ঐতিহাসিক তত্ত্বের উপর নির্ভর করতে হয়েছে। চক মসজিদ ও আদি কাঠামোতে বিদ্যমান নেই। এতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনয়ন করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও এই ইমারত বিশেষভাবে লক্ষ্য করে আমার ধারণার ভিত্তিতে এই মসজিদের একটি আদিরূপ তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। মসজিদ সমূহের আলোচনায় সবচেয়ে গুরুত্ব পেয়েছে ইসলাম খানের মসজিদ, শায়েস্তা খানের মসজিদ, কারতালাব খানের মসজিদ, মীর্জা গোলাম পীরের মসজিদ ও আমীর উদ্দীনের মসজিদ। এ সব মসজিদের স্থাপত্য শৈলী ও তাৎপর্য বিশ্লেষনের প্রয়াস পেয়েছি।

চক বাজার এলাকায় কয়েকটি সমাধি সৌধ লক্ষ্য করা যায়। এদের মধ্যে বিবি চাম্পার সমাধি, আমীর উদ্দীনের সমাধি, দুদু মিঞার সমাধি ও শাহ মোহাম্মদ জামালের সমাধির নাম করা যেতে পারে। কিন্তু এসব সমাধি আঙ্গিক সংস্থাপনা, কারিগরী উৎকর্ষ, ও শিল্প সুষমায় লালবাগের পরীবিবির সমাধি সৌধের মত এত গুরুত্ব পায়নি বলে এরা চক বাজারের স্থাপত্য শিল্পের বিকাশে কোন মূল্যবান অবদান রাখতে পারেনি। এ সব সমাধি এখন ধ্বংসের মুখে, তবুও স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য যথাসাধ্য আলোচনা করেছি। চক বাজারের অন্যতম বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ইমারত হলো ইমামবাড়া বা হোসাইনী দালান। বাংলাদেশের স্থাপত্যে মুর্শিদাবাদ ও হুগলীতে ইমামবাড়া নির্মিত হয়েছিল বটে, কিন্তু এদের কোনটিকে চক বাজারের ইমামবাড়ার সাথে তুলনা করা যায় না। এই জন্যই এই ইমারতের বর্ণনা আলোচ্য অভিসন্দর্ভে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছে। আমাদের মতে ঢাকা তথা চক বাজারের সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ইমারত হলো কাটরা। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে পুরাকীর্তি সংরক্ষণে এদেশবাসীর আলস্য ও অমনোযোগিতা, প্রত্নতত্ত্ববিদদের অজ্ঞানতা, লুন্ঠনকারীদের অশুভ তৎপরতা, ব্যবসায়ীদের ধনলিপ্সা আর প্রকৃতির বৈরীশক্তি সমূহের বিধ্বংসী কর্মকান্ডের ফলে এই দুটো ইমারত বেশী পরিমানে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। বড় কাটরা ও ছোট কাটরার স্থাপত্য বিবরণে আমরা মূলতঃ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক সংরক্ষিত ভূমি পরিকল্পনার উপর বিশেষভাবে নির্ভর করেছি। তবে বড় কাটরার ক্ষেত্রে আমাদের বিবরণ অনেকটা বিদ্যমান স্থাপত্য উপকরণের উপর নির্ভরশীল। কেননা এতে এখনও এমন সব স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা দর্শন ও পর্যবেক্ষণ করার মত।

Dhaka University Institutional Repository

এ অভিসন্দর্ভে আমি চক বাজার এলাকার স্থাপত্যের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টা করেছি । কোন দেশের স্থাপত্যের সাথে সে দেশের রাজনীতি ও অর্থনীতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত । এই জন্যই মুঘল আমলের বাংলাদেশের রাজনৈতিক পটভূমি সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত অথচ তথ্য বহুল অধ্যায় এখানে সংযোজিত হয়েছে । অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও সম্পদের প্রাচুর্য ছাড়া কোন স্থানে এত অল্প সময়ের মধ্যে এত অধিক সংখ্যক ইমারত গড়ে উঠতে পারেনা । আমাদের বর্ণনায় হয়তো এদেশের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক দিকটাই বেশী করে ফুটে উঠেছে। সামাজিক দিকটা যথেষ্ট ভাবে প্রতিফলিত হয়নি । কারণ মস-জিদগুলি আগের মত সামাজিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু নেই ।

ঢাকা তথা চক বাজার স্থাপত্যের বিশ্লেষনে যে বিষয়টি আমাদের মর্ম পীড়ার কারণ হয়েছে সেটা হলো প্রাচীন সংস্কৃতি ও আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে অহেতুক সংঘাত। একথা অবশ্য সত্য যে জনসংখ্যার এক্স বর্ধমান বৃদ্ধির হার দুটো সমস্যার সৃষ্টি করেছে । (১) বাড়তি জনসংখ্যার বাসস্থান সমস্যা । এর ফলে প্রাচীন কীর্তি সমূহের উদ্দেশ্যে ওয়াকফকৃত জমি জমা বে-দখল হয়ে গেছে এবং স্থাপত্যের অবস্থানের সীমা-রেখা হচ্ছে সংকীর্ণ হতে সংকীর্ণতর । (২) প্রাচীন মসজিদ সমূহ এক্সবর্ধমান প্রার্থনা কারীদের স্থান করে দিতে পারছেনা । ওয়াকফকৃত সম্পত্তি বে-হাত হওয়াতে মসজিদ আর সম্প্রসারিত হতে পারছেনা, এই জন্যই মসজিদ সমূহ অনুভূমিকভাবে সম্প্রসারিত না হয়ে এরা উল্লম্বভাবে সংযোজিত হয়েছে । নানা কারণে এখানকার স্থাপত্যের অঙ্গ হানি ঘটছে । এখানে প্রাচীন কীর্তি সংরক্ষণের আকাংখা দেখা দিয়েছে সেখানে এদের মৌলিক অবয়বটা কোন রকমে ঠিক রেখে এদের উপর বহুতলা বিশিষ্ট ইমারত নির্মান করা হয়েছে । আর যেখানে প্রাচীন কীর্তির উপর শ্রদ্ধাবোধের অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে সেখানে এই স্থাপত্যকীর্তিগুলো ধরা পৃষ্ঠ হতে মুছে দেয়া হয়েছে । কারণে অকারণে অনেক স্থাপত্যই নিশ্চিহ্ন হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে । সাধারণতঃ সংস্কৃতিমনা বাংলার জনসাধারণ বিশেষতঃ বাংলাদেশ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ প্রাচীন স্থাপত্যকীর্তি সংরক্ষণে যথাযোগ্য মনোযোগ দিলে ঢাকার এই বিশেষ সংস্কৃতিটি অপূরণীয় ক্ষতির হাত হতে রক্ষা পেতো । এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য যে এখানকার স্থাপত্য আমাদের সাংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ বিশেষ ।

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এলাকা চক বাজারের প্রাচীন স্থাপত্য কীর্তির যে পরিসংখ্যান ও অধ্যয়ন এখানে সম্পন্ন করা হয়েছে তা হয়তো পরে আর করা সম্ভব হবে না । কারণ প্রাচীন নিদর্শন সমূহ দ্রুত বিলীন হয়ে যাচ্ছে । শহরে ভাংগা গড়ায় প্রাচীন স্থাপত্য কীর্তি চিহ্ন হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে না । দুঃখের বিষয় হলেও স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে ঢাকার সাধারণ মানুষ, বিত্তবান এবং দরিদ্র উভয় শ্রেণী ঐতিহ্য ও ই ইতিহাস সম্পর্কে একেবারে উদাসীন ।

আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা, ত্রুটিমুক্ত না হলেও, যদি চক বাজারের প্রাচীন স্মৃতিকে ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য ধরে রাখতে সাহায্য করে তাহলেই আমার এ শ্রম সার্থক মনে করবো ।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থ পঞ্জী

মৌলিক উৎস - (ফার্সী ও উর্দু)

Nathan, Mirza, Baharistan-i-Ghaybi, An English Translation, by M.I. Borah, 1936.

Ali, Munshi Rahman, Tawarikh-i-Dacca, 1910.

Rahman, Habibur, Asudgan-i-Dacca, 1946.

Ahmed, Shams Uddin, ed. and Translated, Inscriptions of Bengal, Rajshahi Varendra Research Museum, 1969.

A'llami, Shaikh Abul Fazl, Akbarnamah, Edited by Prof. John Dowson, Susil Gupta India Ltd., Second Edition, 1953.

(গৌণ উৎস - ইংরেজী)

Ahmed, Nazim Uddin, Discover the Monuments of Bangladesh, The University Press Ltd., 1984.

Ahmed, Nazim Uddin, Islamic Heritage of Bangladesh, Department of Films and Publications, 1980.

Birt, P.B. Bradley, The Romance of an Eastern Capital, London, Smith Elder and Co., 1906.

Brown, Percy , Indian Architecture (Islamic Period) Bombay B.B. Taraporevala Son's & Co., Pvt. Ltd.,1975.

Cunningham, Sir, Alexander, Archaeological Report of Tour in Bengal and Bihar, 1879, A.S.

Cunningham, Sir Alexandar, Archaeological Survey of India Report, Vol.-XV, Delhi, Indological Book House , 1969.

Creswell. K.A.C. Early Muslim Architecture, Part Two Oxford University Press. 1969.

Campbell, A. Claud, Glimpses of Bengal , Vol.-I. Calcutta, Campbell and Medland, 1907.

Creswell, K.A.C. A Short Account of Earl y Muslim Architecture, Penguin Books, 1958.

D'Oyly, Sir Charles, Antiquities of Dacca, Published by John Landseer, London, 1824-30.

Dani, Ahmad Hasan, Muslim Architecture in Bengal, Dacca, Paramount Press, 1961.

Dani, Ahmad Hasan, Dacca. A Record of Its Changing Fortunes, The Saogat Press, 1962.

Dani, Ahmad Hasan, Dacca(Dacca Museum), 1956.

Dhaka University Institutional Repository

Deneck, Marguerite Marie Pakistan, Encyclopaedia of World Art, Vol. XI, London Mc-graw Hill Book Company, 1966.

Fergusson, James, History of Indian and Eastern Architecture, Vol. II, New Delhi, Munshiram Monoharlal, 1972.

Grover, Satish, The Architecture of India Islamic (727-1707 A.D) New Delhi, Vikas Publishing House, 1981.

Haig, Sir Wolseley, The Cambridge History of India, Vol. iii, Turks and Afghans; Monuments of Muslim India by Sir John Marshall, Delhi, S.Chand & Co., 1965.
Havell, E.B, Indian Architecture, Its Psychology, Structure and History etc., New Delhi, S. Chan & Co., 1914.

Hasan, K.B. Sayed Aulad, Notes on the Antiquities of Dacca, The Bangla-Jantra, Dacca, 1904.

Husain, A.B.M., The Manara in Indo-Muslim Architecture, Asiatic Society of Pakistan , Dacca, 1970.

Hunter, W.W., A Statistical Account of Bengal, Vol-V, (District of Dacca, Bakarganj, Faridpur and Mainansingh), Trubner and Co., London, 1875.

Haider, Azimusshan, A City and Its Civic Body, Dacca Municipality, 1966.

Haider, Azimusshan, Dacca History and Romance in Place Names, A Dacca Municipality Publication, 1967.

Hasan, S.M. Mosque Architecture of Pre-Mughal Bengal, University Press Ltd. Bangladesh, 1979.

Hasan, S.M. Muslim Monuments of Bangladesh, Dacca, Islamic Foundation, Bangladesh, 1980.

Hasan, S.M. Ancient Monuments of East Pakistan, The Pakistan Academy-, 1971.

Hasan, S.M. Dacca the City of Mosques, Islamic Foundation, Bangladesh , 1981.

Haque, Enamul, Islamic Art Heritage of Bangladesh, Dhaka, Bangladesh National Museum, 1983.

Dhaka University Institutional Repository

Hossain, Syud, Echoes From Old Dacca, Calcutta, The Edinburgh Press, 1909.

Jairazbhoy. R.A., An Outline of Islamic Architecture, New Delhi, Asia Publishing House, 1972.

Karim, Abdul, Dacca the Mughal Capital, Asiatic Society Press Publication, No. 15, 1964.

Majumdar, Hridayanath, The Reminescenees of Dacca, Calcutta, 1926.

Majumdar, R.C. The History and Culture of the Indian People, The Delhi Sultanate, General Editor, R.C.Majumdar, Chapter XIX; Art by Sarasi Kumar Saraswati, Bombay, Bharatiya Vidya Bhavan, 1980.

Mc Cutchion, David J., Late Mediaeval Temples of Bengal, Calcutta, The Asiatic Society, 1971.

Mehta, Ruston J., Masterpiecs of Indo-Islamic Architecture, D.B. Taraporevala Son's and Co., Pvt. Ltd., 1976.

Nath, R. History of the Sultanate Architecture, New Delhi, Abhinav Publications, 1978.

Nath, R., Monuments of Delhi, New Delhi, Ambika Publications, 1979.

Pope, A.U. A Survey of Persian Art, Oxford University Press, London and New York, 1938.

Rajput, A.B., Architecture in Pakistan, Karachi, 1966.

Rajan, K.V. Soundara, Islam Builds in India, Cultural Study of Islamic Architecture, Delhi, Agam Kala Parkashan, 1983.

Ravenshaw, John Henry, Gour, Its Ruins and Inscriptions, London, Keganpaul, 1978.

Rankin, J.T., The Study of Antiquities in Dacca, Sreenath Press, Dacca, 1920.

Sarkar, Jadu Nath, The History of Bengal, Volume II, Muslim Period (1200-1757), Published by the University of Dacca, 1948.

Dhaka University Institutional Repository

Sewall, John Ives, A. History of Western Art. New York, 1958.

Stewart, Charles, History of Bengal, Bangabasi Press, Calcutta, 1903.

Taifoor, S.M., Glimpses of Old Dacca, The Saogat Press, 1952.

Taifoor, S.M. Glimpses of Old Dhaka, A Short Historical Narration of East Bengal and Assam with Special Treatment of Dhaka, The Pioneer Printing Press, 1956.

Tarafdar, M.R., Husain Shahi Bengal (1494-1538 A.D.) A Socio-Political Study, Dacca, Asiatic Society of Pakistan, 1965.

Taylor, James, Topography and Statistics of Dacca, Calcutta Munu Military Orphan Press, 1840.

(গৌন উৎস - বাংলা)

আ.ক.ম. যাকারিয়া, বাংলাদেশের প্রত্ন সম্পদ, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৮৪ ।

ডঃ ওয়াকিল আহমেদ, মুসলিম বাংলায় বিদেশী পর্যটক, নওরোজ কিতাবিস্তান, বাংলা বাজার, ঢাকা, ১৯৬৮ ।

এ.কে.এম. শামসুল আলম, লালবাগ দুর্গ ও যাদুঘর, প্রত্নতত্ত্ব ও যাদুঘর বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২য় সংস্করণ, ১৯৭৬ ।

কেদার নাথ মজুমদার, ঢাকার বিবরণ, আসুতোষ প্রেস, ঢাকা, ১৩১৬ বঙ্গাব্দ ।

খান সাহেব আবিদ আলী খান, গৌড় পাণ্ডুয়ার স্মৃতি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা- ১৯৮৫ ।

নাজির হোসেন, কিংবদন্তির ঢাকা, দি স্টার প্রেস, ঢাকা, ১৯৭৬ ।

ডঃ নিহার রঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, আদি পর্ব, কলিকাতা, ১৩৫৬ বাংলা সন ।

নির্মল গুপ্ত, ঢাকার কথা, কলিকাতা, শ্রী গৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ১৩৬৬ ।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, সম্পাদিত ডঃ আনিসুজ্জামান, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭, 'বাংলার শিল্পকলা' ডঃ নমতাজুর রহমান তরফদার,

মুন্সী রহমান আলী তায়েশ, তাওয়ারিখ-ই- ঢাকা, ডঃ আঃ মঃ মঃ শরফুদ্দিন অনুদিত ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ১৯৮৫ ।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রী যতীন্দ্রমোহন রায়, ঢাকার ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, ১৩১৯ বাংলা সন।
শ্রী সুখময় মুখোপাধ্যায়, বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর, স্বাধীন সুলতানদের আমল (১৩৩৮-১৫৩৮ খ্রীঃ) ভারতীয় বুক ষ্টল, কলিকাতা ৯, ১৯৮০।

ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, কলিকাতা, জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাবলিশার্স, ১৯৭৫।

রাখাল দাস ব্যানার্জি, বাংলার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, কলিকাতা, ইমারেল্ড প্রিন্টিং ওয়ার্কস, বাংলা সন, ১৩২৪।

রফিকুল ইসলাম, ঢাকার কথা (১৬১০-১৯১০), ঢাকা, আহমেদ পাবলিশিং হাউজ, ১৯৮২।

মোহাম্মদ এনামুল হক, পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম, ঢাকা, আদিল ব্রাদার্স এণ্ড কোম্পানী, ১৯৪৮।

মোহাম্মদ আবদুর রশিদ, ঢাকা নগরীর মসজিদ নির্দেশিকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ১৯৮৭।

(পত্রিকা - ইংরেজী)

Bhattasali, N.K. The English Factory at Dacca, Bengal Past and Present Vol. XXXIII, Serial No. 65-66, (Jan.-June-1927).

Bysack, Babu Gourdass, On the Antiquities of Bagerhat, Vol.XXXVI Part-I,No.2,(1867) (Journal of the Asiatic Society of Bengal)

Bhattasali, N.K., An Enquiry into the Origin of the City of Dacca, Journal of the Royal Asiatic Society of Bengal Letters, Vol. No. 5, 1939.

Chakravarti, Monmohan, Pre-Mughal Mosques of Bengal, Journal of the Asiatic Society of Bengal, New Series Vol. VI, 1910.

Imam, Abu, Origin of the Name Dhaka (Dacca), Journal of the Asiatic Society of Pakistan, Vol.III, 1958.

Stapleton, H.E. Contributions to the History and Ethnology of North Eastern India, The Antiquity of Dacca , Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, New Series Vol. VI, (1910)

Tafafdar, M.R. Reviews, The Journal of the Asiatic Society of Pakistan, Vol. VI, (1961).

Tafardar, M.R. Some Aspects of the Mamluk Buildings and Their Influence on the Architucture of the Succeeding Periods" Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. XI, no. I, (1966)

Wali, Maulavi Abdul, On the Antiquity and Tradition of the Jami Masjid and Rauja of Hazrat Maulana Muhammad Arab at Sailkupa, Subdivision, Jhenaidah, Jossore, Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol.LX, Part. I,(1901).

Dhaka University Institutional Repository

Wali, Maulavi Abdul, On Some Architectural Remains in the District of Rajshahi, Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol.LXXIII, Part. I, (1904).

Qadir, M.A. TheNewly Discovered Madrasha Ruins at Gaur and Its Inscription, Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol.XXIV-VI, 1979-81.

Begum, Ayesha, The Earliest dated Mughal Monuments at Dhaka, Dhaka University Studies. Vol. XXXVII, Part-'A' Dec.,1982.

Bhattacharyya, Surendra Nath, On the Transfer of the Capital of Mughal Bengal from Raj Mohal to Dacca (Jahangirnar) by Islam Khan Chishti", The Dacca University Studies, Vol.I,(April, 1936).

Huq, Muhammad Shamsul, The Mosque and the Tomb of Haji Khwaja Shahbaz, The Dhaka University Studies, Part A. Volume 44, No.I (June 1987).

< পত্রিকা - ও সংবাদপত্র - বাংলা >

মোহাম্মদ শামসুল হক " প্রাক-মুঘল যুগের ঢাকা " একটি পর্যালোচনা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, উনত্রিংশ সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৮৭ ।

মোহাম্মদ শামসুল হক, বাংলাদেশে মুঘল স্থাপত্য শিল্প , ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, অষ্টবিংশ সংখ্যা, জুন ১৯৮৭ ।

মোহাম্মদ শামসুল হক, কায়তালাব খান মসজিদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, অষ্টম সংখ্যা, ১৯৭৮ ।

মিসেস আয়শা বেগম, তারা মসজিদ অতীত ও বর্তমান , ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, দ্বাত্রিংশ সংখ্যা, ১৯৮৮ ।

মুনতাসির মামুন, ঢাকা শহরের বিকাশ ধারা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, আগষ্ট সংখ্যা-১৩৮৫ ।

মোঃ আলমগীর, মধ্যযুগীয় বাংলার মুসলিম স্থাপত্যে অলংকরণ, সচিত্র বাংলাদেশ, ১৩ ফেব্রুয়ারী - ১৯৮৯ ।

মোঃ আলমগীর, বাংলার সুলতানী ও মোঘল স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য, সচিত্র বাংলাদেশ, ১৬ সেপ্টেম্বর - ১৯৮৮ ।

মওদুদউর রশিদ, মোঘল আমলের ঢাকার স্থাপত্য, সচিত্র বাংলাদেশ, মার্চ, ১৯৮৯ ।

Dhaka University Institutional Repository

নাজির হোসেন, ঢাকার ইতিহাসের পাতা থেকে, দৈনিক আজাদ- ২৬শে জুলাই, ১৯৮৯।

মওদুদুর রশিদ, মোঘল আমলে ঢাকার স্থাপত্য, ঢাকা বাণী, ঈদ সংখ্যা, ১৯৮৯।

মোহাম্মদ নুরুদ্দিন কতেপুরী, ঢাকা নামের ইতিহাস, ঢাকা বাণী, ২৯শে জানুয়ারী, ১৯৮৯।

সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, লালবাগ কেল্লা, দৈনিক ইনকিলাব, বার্ষিক সংখ্যা, ১৯৮৭।

মোহাম্মদ আবু মুসা, লালবাগ দুর্গ, অগ্রপথিক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ৩৬ সংখ্যা, ১৯৮৯।

মোহাম্মদ আবু মুসা, পরীবিবির মাযার, অগ্রপথিক, ৩০ সংখ্যা ১৯৮৯।